প্রগতি

২০১৪

ঢাকা কমার্স কলেজ
DHAKA COMMERCE COLLEGE

(স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত)

ঢাকা কমার্স কলেজ রোড, মিরপুর, ঢাকা - ১২১৬।
ফোন: ৯০০৪৯৪২, ৯০০৭৯৪৫, ৯০২৩৩৩৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯০৩৭৭২২

প্রগতি-২০১৪

PROGATI 2014

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী-২০১৪

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ
অধ্যক্ষ

পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল
উপাধ্যক্ষ

উপদেষ্টা পরিষদ

১. প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
২. প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
৩. প্রফেসর মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
৪. প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
৫. প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
৬. জনাব মোঃ ইউনুছ হাওলাদার, সহযোগী অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি

জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ

জনাব এস. এম. আলী আজম, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
জনাব শনজিত সাহা, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, মার্কেটিং বিভাগ
বেগম শামা আহমাদ, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বেগম শবনম নাহিদ স্বাতী, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান
জনাব মোঃ মনসুর আলম, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
জনাব আহমেদ আহসান হাবিব, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
জনাব মোঃ সাহজাহান আলী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জনাব খায়রুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
জনাব এস.এম. মেহেদী হাসান এম.ফিল, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জনাব রেজাউল আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জনাব অনুপম দেবনাথ, সহকারী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ
জনাব মোঃ শফিকুর রহমান, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
বেগম রেহানা আখতার রিংকু, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
জনাব মুহাম্মদ আশরাফুল করিম, গ্রন্থাগারিক

সম্পাদক

জেনিফার ইয়াসমিন
সম্মান ১ম বর্ষ, মার্কেটিং, রোলঃ MKT-১০৬৩

সম্পাদনা সহকারী

সানভী রশীদ, রোলঃ M-৯৪৬
শরীফ মিয়া, রোল : ৩০৯৫১
স্বর্ণা আক্তার সাদিয়া, রোল : ৩০৩৮৭
আনিসা ইফরিদ আঁখি, রোলঃ ৩০১৯৯
মোঃ গোলাম রাব্বানী রাফতী, রোল : ২৯২৪১

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কলেজ পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সভাপতি ও
সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

Printed by : **Jyotee Process & Trade International**
217/3 Fakirapool, 1st Lane, Motijheel, Dhaka-1000.
Cell : 01819222876, E-mail : jyotee.printers@gmail.com

কলেজ সঙ্গীত

ঢাকা কমার্স কলেজ
আমরা একটি জাগ্রত পরিবার,
শিক্ষাঙ্গনে জ্বালবো প্রদীপ
এই আমাদের অঙ্গীকার ॥

শিক্ষাঙ্গনে ভরে আছে পশ্চাদপদ বিশ্বাস
মুক্ত করে হব একদিন প্রদীপ্ত ইতিহাস
দেশের জন্যে
জাতির জন্যে
গড়বো নতুন অহংকার ॥

শিক্ষার মাঝে ছাত্র-ছাত্রী জীবন গড়তে পারে
জ্বলতে পারে সূর্যের মত নিগূঢ় অন্ধকারে
এই বিশ্বাসে
এই উচ্ছ্বাসে
চলবো সামনে দুর্নিবার ॥

গীতিকার : *মোঃ হাসানুর রশীদ*
সুরকার : *সাইদ হোসেন সেন্টু*

শপথ

আমি সৃষ্টিকর্তার নামে অঙ্গীকার করছি যে, কলেজ ও দেশের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি ঐকান্তিক থাকবো এবং আন্তরিকভাবে মেনে চলবো। উত্তম ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলবো। উন্নত চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হবো। কলেজের সুনাম বৃদ্ধির জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাব। আমি এ সব কিছুই করব - আমার নিজের জন্য, আমার পরিবারের জন্য, আমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য-সর্বোপরি সমগ্র মানব জাতির জন্য। মহান স্রষ্টা আমার সহায় হোন। আমিন।

সূচি

এক নজরে ঢাকা কমার্স কলেজ	০৫
পরিচালনা পরিষদ	৬-৭
শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক	৮-১০
বাণী	১১-২২
বর্তমান ও সাবেক অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষবৃন্দ	২৩
শিক্ষক পরিচিতি	২৪-৩২
কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিচিতি	৩৩-৩৬
ফলাফল বিশ্লেষণ	৩৭-৪০
বার্ষিক প্রতিবেদন	৪১-৫৪
প্রবন্ধ, অনুবাদ ও ভ্রমণ কাহিনী	৫৫-১২৮
কবিতা	১২৯-১৩৮
তথ্য বিচিত্রা	১৩৯-১৫০
কৌতুক ও রম্য রচনা	১৫১-১৬৮
শিক্ষার্থী পরিচিতি :	
একাদশ শ্রেণি	১৬৯-২২৬
অনার্স ও মাস্টার্স	২২৭-২৬৪
অ্যালবাম	২৬৫-৩০৪

এক নজরে ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রতিষ্ঠাকাল	১ জুলাই, ১৯৮৯।
উদ্দেশ্য	বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা।
আদর্শ	রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং স্ব-অর্থায়ন।
শিক্ষক সংখ্যা	১২১ জন।
কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা	১০২ জন।

কোর্সসমূহ

উচ্চ মাধ্যমিক	ব্যবসায় শিক্ষা
স্নাতক (সম্মান)	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি, অর্থনীতি ও বিবিএ।
স্নাতকোত্তর	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি, অর্থনীতি।

বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা

কোর্সসমূহ	শ্রেণি	সংখ্যা
উচ্চ মাধ্যমিক	একাদশ	২৭১০
	দ্বাদশ	২১২৭
স্নাতক (সম্মান)	প্রথম বর্ষ (নতুন)	২৪৫
	প্রথম বর্ষ (পুরাতন)	২০২
	দ্বিতীয় বর্ষ	২৫৩
	তৃতীয় বর্ষ	১৭১
	চতুর্থ বর্ষ	১৭৫
বিবিএ প্রোগ্রাম	প্রথম সেমিস্টার	৬৮
স্নাতকোত্তর	শেষ পর্ব	১৪০
সর্বমোট		৬,০৯১ জন

শিক্ষা কার্যক্রম :

(ক) পরীক্ষা : সাপ্তাহিক, মাসিক এবং তিন মাস পরপর পর্ব পরীক্ষা।
(খ) উপস্থিতি : কমপক্ষে ৯০% (বাধ্যতামূলক)।
(গ) আসন বিন্যাস : নির্ধারিত।
(ঘ) সেকশন/গ্রেড পরিবর্তন : টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে।
(ঙ) ফলাফল : উচ্চ মাধ্যমিক ১৯৯১-২০০২ মেধাতালিকায় স্থান লাভ-৭৮ জন, স্টার-৪৫৩, ১ম বিভাগ ৪,১৯১ জন
২০০৩ সালে জিপিএ ৪.৬ পেয়েছে ৭ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ২২২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৪১%।
২০০৪ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫৩ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ৭১৩ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৭৮%।
২০০৫ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৭১ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ৭৪৫ জন, গড় পাসের হার ১০০%।
২০০৬ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ২২৭ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১১০৪ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৯৩%।
২০০৭ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ২২৪ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১০৭২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৬৭%।
২০০৮ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫১৮ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১৩১৬ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৯৫%।
২০০৯ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪০৯ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১৩৪৫ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৯৫%।
২০১০ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪২৩ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১৪৪২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৮০%।
২০১১ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮৩১ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১১৭৩ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৯৫%।
২০১২ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ১১৫৬ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১২৪২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৮৮%।
২০১৩ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮৭১ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ৯৯৪ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৪৯%।
২০১৪ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮১৯ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১২৮১ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৭৩%।
স্নাতক সম্মান/স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত চমৎকার। উল্লেখ্য, প্রায় বছরই পাসের হার শতভাগ থাকে।
(চ) কলেজ ইউনিফরম : নির্ধারিত।

শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম :

শিক্ষা ও শিক্ষা সফর, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, ক্লাব কার্যক্রম, মাসিক পত্রিকা ও বার্ষিকী প্রকাশ, মিলাদ, বার্ষিক ভোজ ইত্যাদি।

পরিচালনা পরিষদ :

১৬ সদস্য বিশিষ্ট।

পরিচালনা পরিষদ

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
চেয়ারম্যান
অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সদস্য
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রফেসর মোঃ আলী আজম
সদস্য
উপ-উপাচার্য, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)

প্রফেসর আবু সালেহ
সদস্য
উপাচার্য, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)

প্রফেসর মোঃ শামছুল হুদা এফ সি এ
সদস্য
ট্রেজারার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)

জনাব আহমেদ হোসেন
সদস্য
এম, ডি, নবাব আব্দুল মালেক জুট মিলস্ লিঃ

প্রফেসর ডাঃ এম.এ. রশীদ
সদস্য
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সিনিয়ন কনসালটেন্ট
ইব্রাহীম কার্ডিয়াক হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
সদস্য
উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও অনারারি প্রফেসর
ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
সদস্য
সাবেক পরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

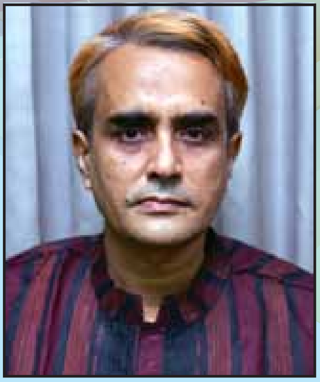
জনাব শহীদুল হক খান
অভিভাবক প্রতিনিধি

বেগম মোসাঃ হাফিজুন নাহার
অভিভাবক প্রতিনিধি

জনাব আবু ইয়াহিয়া দুলাল
অভিভাবক প্রতিনিধি

প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম
শিক্ষক প্রতিনিধি
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

জনাব মোহাম্মদ আক্‌তার হোসেন
শিক্ষক প্রতিনিধি
সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

বেগম ফারহানা আরজুমান
শিক্ষক প্রতিনিধি
সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ
সদস্য সচিব/ অধ্যক্ষ

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

১৯৯৬-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে সনদ ও ক্রেস্ট নিচ্ছেন অনারারি প্রফেসর, প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে বিবেচিত

ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা-কে

এই সনদপত্র প্রদান করা হল।

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

মাননীয় সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক-এর নিকট থেকে ২০০২-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে দ্বিতীয়বার ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট নিচ্ছেন অনারারি প্রফেসর, প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেচিত হওয়ায়

ঢাকা কমার্স কলেজ

চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা-কে

এ সনদপত্র প্রদান করা হল।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(মোহাম্মদ শহীদুল আলম)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক : প্রফেসর কাজী ফারুকী

ঢাকা কমার্স কলেজের অনারারি প্রফেসর, প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী ১৯৯৩-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট থেকে শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষকের স্বর্ণপদক ও সনদ নিচ্ছেন।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিক্ষা মানুষকে পূর্ণতা দেয়। তাই জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। পাশাপাশি একটি জাতিকে স্বনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়ী ও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য যুগোপযোগী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বর্তমান বিশ্বের মূল চালিকাশক্তি। একটি জাতির উন্নয়নের জন্য সমৃদ্ধি অর্জন অপরিহার্য শর্ত। সেক্ষেত্রে বাণিজ্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ সময়ের দাবি পূরণ করে প্রায় আড়াই দশক ধরে জাতিকে যোগ্য নাগরিক উপহার দিয়ে আসছে।

বাণিজ্য শিক্ষার এ বটবৃক্ষের ছায়াতলে শুধু গতানুগতিক শিক্ষা দিয়ে জীবনকে যান্ত্রিক করে তোলা হয় না। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বাস করে সুকুমার বৃত্তির চর্চা ছাড়া ‘সভ্যতা’ ও ‘মানুষ’ শব্দ দুটি বিপন্ন হয়ে উঠবে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছরের ন্যায় এবারও প্রকাশিত হচ্ছে কলেজ বার্ষিকী ‘প্রগতি’।

আমি প্রগতির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

(নুরুল ইসলাম নাহিদ এম. পি)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাণী

সংসদ সদস্য
১৮৭, ঢাকা-১৪
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন
মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বৈশ্বিক অর্থনীতি ও বাণিজ্যের প্রসারে প্রয়োজন হয়ে পড়ে প্রায়োগিক শিক্ষার। সেই লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা কমার্স কলেজ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি অভূতপূর্ব ফল অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে ইতোমধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। অব্যাহত সাফল্যের ধারায় প্রতিষ্ঠানটি জাতিকে উপহার দিয়েছে অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী, যারা জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা ছাড়া সুস্থ নাগরিক গড়ে তোলা অসম্ভব। ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি সাহিত্যনুরাগীও বটে। 'প্রগতি'-র ধারাবাহিক প্রকাশনা তারই প্রমাণ বহন করে। এজন্য আমি শিক্ষার্থীবৃন্দ ও শিক্ষকম-লীর প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি 'প্রগতি'র দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং সেই সাথে প্রগতি-সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

31.10.13

(মোঃ আসলামুল হক)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে ঢাকা কমার্স কলেজ একটি অনন্য নাম। সুদীর্ঘ ২৫ ধরে এ প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায় শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখে চলেছে। এ কলেজের বহু প্রাক্তন ছাত্র আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজগুণ ও যোগ্যতা বলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও প্রশংসিত। এ কলেজের নিয়মানুবর্তিতা ও কঠোর অনুশীলন শিক্ষার্থীদের মধ্যে তৈরি করে নেতৃত্বের গুণ। এ কলেজের নিয়মিত সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা শিক্ষার্থীদের করে তোলে মননশীল। ক্রীড়া ক্ষেত্রেও রয়েছে এর বিশেষ অবদান। এক কথায় একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ কলেজের সুনাম সুবিদিত। তারই স্বীকৃতি স্বরূপ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে দুবার শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচিত হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী ‘প্রগতি-২০১৪’ প্রকাশিত হওয়ায় আমি খুবই আনন্দিত। উক্ত প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

(মোঃ নজরুল ইসলাম খান)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাণী

উপাচার্য
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর

ঢাকা কমার্স কলেজ বেসরকারী পর্যায়ে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ কলেজের নিয়মিত বার্ষিকী ‘প্রগতি’ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। ‘প্রগতি’ নামের মাঝেই এর আদর্শ-উদ্দেশ্য নিহিত। একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা অতীব আবশ্যক। কলেজের এই বার্ষিকী হবে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও মননের পরিচয়বাহী। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই। একই সঙ্গে আমি এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আরো সমৃদ্ধি কামনা করি।

(প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
ঢাকা, বাংলাদেশ।

বাণী

প্রতিষ্ঠা থেকে ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষা, সাহিত্য ও ক্রীড়াঙ্গনে একটি অনন্য নাম। জাতি গঠনে ও জাতিকে সুশিক্ষিত রুচিশীল করতে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ভূমিকা থাকে। সৎ ও দায়িত্বশীল নাগরিক গঠনের মাধ্যমে মেধা ও মননের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ঢাকা কমার্স কলেজ দেশ ও বিদেশে যথেষ্ট সামাদৃত। যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা ও সুশৃঙ্খল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মডেল স্থাপন করার জন্যও অত্র কলেজটি অন্যতম।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী ‘প্রগতি’ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সৃষ্টিশীল লেখা তাঁদের সৃজনশীলতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি ঢাকা কমার্স কলেজের ধারাবাহিক সাফল্য কামনা করছি।

(প্রফেসর ফাহিমা খাতুন)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাণী

প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
ঢাকা, বাংলাদেশ

একটি দেশের চালিকাশক্তি তার গতিময় ও সুদৃঢ় অর্থনীতি। দেশকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যেতে হলে অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখতেই হয়। আর মানসম্পন্ন ব্যবসায় শিক্ষাই সে গতিশীলতার নেপথ্য শক্তি। এদেশের যে কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় শিক্ষাকে জনপ্রিয় করেছে তাদের শীর্ষে রয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ। এ কলেজটি ব্যবসায় শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে খেলাধুলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা করে থাকে। সহশিক্ষা কার্যক্রমে এ অনুশীলন শিক্ষার্থীদের মেধাবী, যোগ্য ও মানবিক করে তোলে।

কলেজে সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ অব্যাহত রাখার জন্যে এ বছরও বার্ষিক প্রকাশনা প্রগতি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আমি প্রগতি-র সাফল্য কামনা করি। এর প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

(প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

চেয়ারম্যান
ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদ

বাণী

স্বনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়ী সমৃদ্ধ জাতি গঠনে যুগোপযোগী শিক্ষার বিকল্প নেই। বাণিজ্য শিক্ষা এমনি একটি গতিশীল ও বাস্তবমুখী শিক্ষাব্যবস্থা। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্যে এর চাহিদা বেড়েই চলেছে। আবার একটি জাতির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনেও বাণিজ্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এই লক্ষ্য সামনে নিয়েই পরিচালিত হচ্ছে ঢাকা কমার্স কলেজ যা পঁচিশ বছর ধরে বাণিজ্য শিক্ষা প্রসারে বাংলাদেশে এক অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যুগের চাহিদা মেটানোর উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের বাণিজ্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলছে। ইতোমধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ ভালো ফলাফল ও নিয়ম কানুনের বাস্তব প্রয়োগে একটি অনুকরণীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে।

তবে শিক্ষার্থীর সুকুমার মনোবৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশে সহশিক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কলেজ প্রকাশনা এমনি একটি সহশিক্ষা কার্যক্রম। ঢাকা কমার্স কলেজের নিয়মিত প্রকাশনা ‘প্রগতি’ এক ঝাঁক তরুণ শিক্ষার্থীর চিন্তা, চেতনা ও মননের ফসল। শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে ‘প্রগতি’ বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও শিক্ষার্থীরা খুঁজে পাচ্ছে তাদের মুক্তচিন্তা বিকাশের ক্ষেত্র। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই নিয়মিত প্রকাশের ধারাবাহিকতায় সংযোজিত হলো ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক প্রকাশনা ‘প্রগতি’র আরো এক সংখ্যা।

‘প্রগতি’র প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

(প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাণী

উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিনের। তিনি আমাদেরকে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা ও নির্মাণের যে বিশাল দায়িত্ব দিয়েছেন, তার সাথে দিয়েছেন তা পালনের সামর্থ্যও। আমরা কয়েকজন বন্ধু প্রায় শূন্য হাতে ঢাকা কমার্স কলেজের কার্যক্রম শুরু করি। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, আত্মবিশ্বাস ও সুদৃঢ় মনোবল লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়েছে।

আমরা নিজেদের অর্থে বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। ঢাকা কমার্স কলেজের পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে শিক্ষার্থীদের পাঠদান, সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা ভীতি দূর করে উত্তম ফলাফল অর্জনে সহায়তা করেছে। স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত এ আদর্শ এখন সমগ্র দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। ফলে এক সময়কার অবহেলিত বাণিজ্য শিক্ষা আজ সমগ্র দেশের অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

আমাদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯৬ সালে এবং ২০০২ সালে দু'দুবার এ প্রতিষ্ঠান জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্মাননা পেয়েছে। ২০০১ সালে আমরা পালন করেছি যুগপূর্তি অনুষ্ঠান এবং ২০১০ সালে দু'দশক পূর্তি অনুষ্ঠান। এবার সাড়ম্বরে পালন করতে যাচ্ছি কলেজের পঁচিশ বছর পূর্তি তথা রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে নুতন আঙ্গিকে কলেজ বার্ষিকী প্রগতি। প্রগতির এ সংখ্যায় থাকছে ঢাকা কমার্স কলেজের ২৫ বছরের কর্মকাণ্ডের সাফল্যগাঁথা।

এ প্রকাশনার সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের সকলকে আমি জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

(প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাণী

অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাণিজ্য শিক্ষায় বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী কলেজ ‘ঢাকা কমার্স কলেজ’। এটি একটি ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কেননা, এখানে শিক্ষা ও শিক্ষা সম্পূরক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে কলেজ কার্যক্রম। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ অবধি ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলে অসাধারণ সাফল্য অর্জনের সাথে সাথে দেশকে ব্যবসায় শিক্ষায় সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে অনন্য গৌরব অর্জন করেছে কলেজটি।

কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মেধা ও মননের উৎকৃষ্ট নিদর্শন নিয়মিত বার্ষিক প্রকাশনা ‘প্রগতি’ শীঘ্র প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আশা করি এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা ও শিক্ষা সম্পূরক কর্মকাণ্ডের অনুশীলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সাথে কলেজের সুনামও অটুট থাকবে।

‘প্রগতি’ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

(প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

উপাধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাণী

শিক্ষা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষাকে যদি জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়, তাহলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি হলো জাতির দর্পণ। যে দর্পণে জাতির মানব প্রবণতা, তার হৃদয়ের মর্মধ্বনি, তার কর্মকৃতীর মূল ছন্দ- এক কথায় তার স্বরূপ ধরা পড়ে। তাই সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা ব্যতিরেকে সুস্থ নাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আর এই দায়বোধ থেকেই 'প্রগতি' এর পথচলা।

'প্রগতি' ২০১৪ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার শুভ কামনা।
'প্রগতি' অব্যহত ধারায় এগিয়ে চলুক।

(প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

আহ্বায়ক
প্রগতি সম্পাদনা পরিষদ
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাণী

১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জনেই কেবল নয়, ইতোমধ্যে কলেজটি সহশিক্ষা কার্যক্রমেও ব্যতিক্রমী অবস্থান নিশ্চিত করেছে।

একের পর এক রেখে চলেছে উজ্জ্বল স্বাক্ষর। অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া, ক্লাব কার্যক্রম, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, লেখালেখি সব মিলিয়ে এখানকার শিক্ষার্থীরা এক কথায় অনুকরণীয়। বার্ষিক 'প্রগতি' এ সবকিছু প্রকাশের এক অনন্য মাধ্যম। ঢাকা কমার্স কলেজ ও 'প্রগতি' এক ও অভিন্ন। কলেজের জন্মলগ্ন থেকে একসাথে পথচলার সঙ্গী 'প্রগতি'র বয়সও আজ ২৫ এ উপনীত হয়েছে। এটিকে রজত জয়ন্তী প্রকাশনাও বলা যায়। বিগত পঁচিশ বছর ধরে উন্নতি, সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষায় কিংবদন্তি ঢাকা কমার্স কলেজ। একই সাথে তৈরি গৌরবময় উজ্জ্বল ইতিহাস। 'প্রগতি' কেবল একটি প্রকাশনাই নয়, বিগত পঁচিশ বছরের ঐতিহ্যের স্বাক্ষর, কালের দলিল। 'প্রগতি' ধারণ করেছে ঢাকা কমার্স কলেজের এ যাবৎ কালের সকল তথ্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তালিকা, আলোকচিত্র, সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন বিকাশের মাধ্যম কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনি, রম্য কৌতুক, বিচিত্র সব ধরনের লেখা। ঢাকা কমার্স কলেজ তথা 'প্রগতির' আজকের এ পূর্ণতা ও উৎকর্ষ সাধনের সাথে জড়িয়ে আছে সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারি। যাদের অনুপ্রেরণা আমাদেরকে আজকের এই পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছে তারা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ কলেজ পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ। এককথায় যারা আমাদের এ পথচলায় নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে চেয়ারম্যান মহোদয় ও অধ্যক্ষ মহোদয়সহ বার্ষিকীর রজতজয়ন্তী সংখ্যায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। যেসব শিক্ষার্থীর লেখা ও কার্যক্রম 'প্রগতি'কে সমৃদ্ধ করেছে তাদের জন্য রইল শুভ কামনা।

প্রকাশনা কমিটির সকল সদস্যের জন্যও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ধন্যবাদ সবাইকে।

(মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সম্পাদকীয়

বাণী

মানব মনের সুপ্ত চিন্তাগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে আত্ম প্রকাশের মাধ্যমেই বেরিয়ে আসে কালোত্তীর্ণ কোন শিল্পকর্ম। মানুষ মননশীল প্রাণী। এর সাথে যুক্ত হয় তার স্বপ্ন ও সৃষ্টিশীল আবেগ। এই আবেগ তাকে চালিত করেছে সাহিত্য ও শিল্পসাধনার পথে। বাঙালির সমৃদ্ধ সাহিত্য ও শিল্পভাণ্ডার জাতি হিসেবে আমাদের প্রগাঢ় ও সৃজনী আবেগ ও বহু রং অনুভূতিশীলতার প্রণোজ্জ্বল স্বাক্ষর। এই সাহিত্যিই যুগ চেতনার ধারক ও বাহক। যে কোনো মহৎ যাত্রা পথেই বাধা আসে। কখনো কখনো মনে হয় এ বাধা বুঝি অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাস বার বার প্রমাণ করেছে যে লক্ষ্য স্থির থাকলে ধৈর্য এবং সদিচ্ছা থাকলে জয় অবধারিত। তেমনি একটি বড় স্বপ্ন ও অল্প কিছু শিক্ষার্থী নিয়ে গঠিত হয়েছিল ঢাকা কর্মাস কলেজ। কিন্তু বর্তমানে ব্যতিক্রমধর্মী এই শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও উত্তম চরিত্র গঠনে মানবীয় মূল্যবোধ বিকাশ সাধনে এবং আদর্শ নাগরিক সৃষ্টিতে নিরলস কাজ করে চলছে। আমাদের সম্মানিত শিক্ষক-শিকিক্ষামণ্ডলী একাগ্রচিত্তে ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথ পাঠদান, দিক-নির্দেশনা এবং সুশৃঙ্খল ব্যবস্থপনা, সর্বোপরি মহান সৃষ্টিকর্তার রহমতে প্রতিষ্ঠানটি আজ বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ।

বলাবহুল্য, আমাদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ কেবল লেখা পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না, সেই সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা করেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজকের “প্রগতি”। প্রগতির প্রকাশিত লেখাগুলো সাহিত্যের মানদণ্ডে কালোত্তীর্ণ না হলেও ভাষা চর্চার ও সাহিত্য ভাবনার ক্ষেত্রে এসব সৃষ্টিশীল লেখা অমূল্য। এ কারণেই ঢাকা কর্মাস কলেজের বার্ষিক “প্রগতি” ২০১৪ এর সম্পাদক দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমি গর্বিত। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শিক্ষককে যিনি আমাকে “প্রগতি”সম্পাদনার সুযোগ দিয়েছেন, আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ ও সম্পাদনা পরিষদের সভাপতিসহ সকল শিক্ষার্থী যারা সঠিক নির্দেশনায় “প্রগতি” সম্পাদনার সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন।

বার্ষিকীর জন্য প্রচুর লেখা পেয়েছিলাম। বাছাই করতে গিয়ে হয়তো অনেক ভালো লেখা বাদ পড়ে গেছে। আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আগামীতে আরো মৌলিক লেখা পাব সকলের কাছে এটাই প্রত্যাশা।

সর্বশেষে ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী, কর্মকর্তা কর্মচারী, শিক্ষার্থী বন্ধুগণ এবং পাঠক সমাজের জন্য শুভেচ্ছা রইল। আশা করি আমাদের প্রচেষ্টা আপনাদের ভালো লাগবে। অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

জেনিফার ইয়াসমিন
মার্কেটিং বিভাগ
রোল : ১০৬৩

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ও সাবেক অধ্যক্ষবৃন্দ

প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ
০৫/০৩/২০১২-বর্তমান

প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম
(ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)
১৯/০৯/২০১০-০৪/০৩/২০১২

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
০১/০৮/১৯৯০ - ১২/০৪/১৯৯৮
২৭/১২/১৯৯৮ - ১৮/০৯/২০১০

প্রফেসর মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ
০১/০৮/১৯৮৯ - ৩১/০৭/১৯৯০
১২/০৪/১৯৯৮ - ২৬/১২/১৯৯৮

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ও সাবেক উপাধ্যক্ষবৃন্দ

প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল
০১/০১/২০০৭ - বর্তমান

প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম
০১/০৮/২০০৫-১৮/০৯/২০১০
০৫/০৩/২০১২-১৯/০৭/২০১৩

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
০১/০৬/১৯৯৯ - ৩১/১২/২০০৬

প্রফেসর আবু আহমেদ আব্দুল্লাহ
১৪/০৭/১৯৯৭ - ১৩/০৭/১৯৯৯

প্রফেসর মোঃ মুতিয়ূর রহমান
০১/০৯/১৯৯২ - ১৩/০৭/১৯৯৭
১৪/০৭/১৯৯৯ - ৩১/০৫/২০০২

বাংলা বিভাগ

মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী
অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

মোঃ হাসানুর রশীদ
সহযোগী অধ্যাপক

আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ সাহজাহান আলী
সহকারী অধ্যাপক

এস. এম. মেহেদী হাসান এম.ফিল
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ মশিউর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

রেজাউল আহমেদ
সহকারী অধ্যাপক

ইসরাত মেরিন
সহকারী অধ্যাপক

মীর মোঃ জহিরুল ইসলাম এম.ফিল
সহকারী অধ্যাপক

পার্থ বাড়ৈ
প্রভাষক

মুক্তি রায়
প্রভাষক

তাহমিনা তাহের
প্রভাষক

ইংরেজি বিভাগ

সাদিক মোঃ সেলিম
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম
অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

মোঃ মঈনউদ্দিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক

শামীম আহ্সান
সহযোগী অধ্যাপক

মাকসুদা শিরীন
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মনসুর আলম
সহকারী অধ্যাপক

উৎপল কুমার ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক

খোন্দকার মোঃ হাদিউজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক

খায়রুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ জাহিদুল কবির
প্রভাষক

মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
প্রভাষক

সমীরন পোদ্দার
প্রভাষক

মোঃ কায়সার আলী
প্রভাষক

মোঃ রেজাউল করিম
প্রভাষক

রেহানা আখতার রিংকু
প্রভাষক

মোঃ তারেকুর রহমান
প্রভাষক

মোঃ রাশেদুল ইসলাম
প্রভাষক

মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রভাষক

অনুপম বিশ্বাস
প্রভাষক

মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল
প্রভাষক

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

এস. এম. আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম
অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

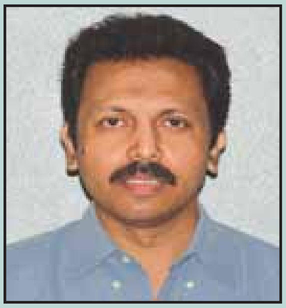

বদিউল আলম
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়া
সহযোগী অধ্যাপক

সৈয়দ আবদুর রব
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ শরিফুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী
সহযোগী অধ্যাপক

শামসাদ শাহ্‌জাহান
সহযোগী অধ্যাপক

ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ
সহযোগী অধ্যাপক

ড. এ. এম. সওকত ওসমান
সহযোগী অধ্যাপক

শামা আহমাদ
সহযোগী অধ্যাপক

ফারহানা আরজুমান
সহকারী অধ্যাপক

তানবীর আহমদ
সহকারী অধ্যাপক

তন্ময় সরকার
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ হজরত আলী
সহকারী অধ্যাপক

সিগমা রহমান
প্রভাষক

ফারজানা রহমান
প্রভাষক

উম্মে সালমা
প্রভাষক

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

সাজনিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ
সহযোগী অধ্যাপক

মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

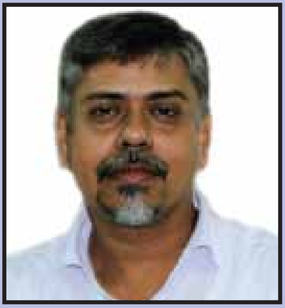

মোঃ মঈন উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মোশতাক আহমেদ
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ তৌহিদুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক

মাসুদা খানম
সহযোগী অধ্যাপক

কামরুন নাহার
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মোশারেফ হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক

মোহাম্মদ আবদুস সালাম
সহকারী অধ্যাপক

নূর মোহাম্মদ শিপন
সহকারী অধ্যাপক

আবু বকর সিদ্দিক
সহকারী অধ্যাপক

ফারহানা হাসমত
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ মাহমুদ হাসান
প্রভাষক

মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ
প্রভাষক

শিমুল চন্দ্র দেবনাথ
প্রভাষক

মার্কেটিং বিভাগ

শনজিত সাহা
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার
অধ্যাপক

দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মঞ্জুরুল আলম এম.ফিল
সহযোগী অধ্যাপক

ফারহানা আক্তার সাদিয়া
প্রভাষক

তাসমিনা নাহিদ
প্রভাষক

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

মোহাম্মদ আক্তার হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল
সহযোগী অধ্যাপক

ফারহানা সাত্তার
সহকারী অধ্যাপক

শারমীন সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম
সহকারী অধ্যাপক

ফাহমিদা ইসরাত জাহান
প্রভাষক

মোঃ হাসান আলী
প্রভাষক

মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান
প্রভাষক

ফরিদা ইয়াসমিন
প্রভাষক

মোঃ আহসান তারেক
প্রভাষক

শিরিন আক্তার
প্রভাষক

সালাহ্উদ্দিন কাদের চৌধুরী
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

মেহেরুন নাহার
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ
সহযোগী অধ্যাপক ও পরিচালক, বিবিএ প্রোগ্রাম

পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ

মোঃ আবদুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান (কম্পি.)

প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ
অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক (পরি.)

ড. মোঃ মিরাজ আলী
সহযোগী অধ্যাপক (গণিত)

মোঃ আব্দুল খালেক
সহযোগী অধ্যাপক (পরি.)

বিষ্ণুপদ বণিক
সহযোগী অধ্যাপক

এ. এইচ. এম. সাইদুল হাসান
সহযোগী অধ্যাপক (পরি.)

আলেয়া পারভীন
সহযোগী অধ্যাপক (গণিত)

মোহাম্মদ রাশিদুজ্জামান খান
সহকারী অধ্যাপক (পরি.)

অনুপম দেবনাথ
সহকারী অধ্যাপক (পরি.)

মোঃ তরিকুল ইসলাম
প্রভাষক (কম্পি., শিক্ষা ছুটি)

নার্গিস হায়দার
প্রভাষক (কম্পি.)

মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান
প্রভাষক (কম্পি.)

অর্থনীতি বিভাগ

সুরাইয়া পারভীন
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

মোঃ ওয়ালী উল্যাহ
সহযোগী অধ্যাপক

শবনম নাহিদ স্বাতী
সহযোগী অধ্যাপক (সমাজবিজ্ঞান)

হাফিজা শারমিন
সহকারী অধ্যাপক

সুরাইয়া খাতুন
সহকারী অধ্যাপক

আহমেদ আহসান হাবিব
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ
প্রভাষক

মারুফা সুলতানা
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ইতিহাস

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ

মাওসুফা ফেরদৌসী এম.ফিল
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া
অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

মোঃ নজরুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ আবু তালেব এম.ফিল
অধ্যাপক

মোঃ ইউনুছ হাওলাদার
সহযোগী অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

এ. বি. এম. মিজানুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ মাহফুজুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ শহীদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক

শরীরচর্চা শিক্ষক

ফয়েজ আহ্‌মদ
শরীরচর্চা শিক্ষক

লাইব্রেরিয়ান

মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
লাইব্রেরিয়ান

লাইব্রেরি শাখা

দিলওয়ারা বেগম
সিনিয়র ক্যাটালগার

মোহাম্মদ ছালাহ্ উদ্দিন
লাইব্রেরি সহকারী

শ্যামলী আক্তার
লাইব্রেরি সহকারী

আফরীনা আকবর
লাইব্রেরী সহকারী (মার্কেটিং)

রোকেয়া পারভীন
লাইব্রেরী সহকারী (ইংরেজি)

নাহিদ সুলতানা
লাইব্রেরী সহকারী (ফিন্যান্স)

আম্বিয়া খাতুন
লাইব্রেরী সহকারী (ব্যবস্থাপনা)

মোঃ আবু নোমান শাকিল
লাইব্রেরী সহকারী (হিবি)

মোঃ শহিদুল ইসলাম
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ আব্দুর রহমান
ক্লিনার

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা

মোঃ এনায়েত হোসেন
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

মোঃ দুলাল
পরীক্ষা সহকারী

মোঃ রাশেদুল কবির
পরীক্ষা সহকারী

তপন কান্তি দাশ
পরীক্ষা সহকারী

মোঃ বোরহান উদ্দিন
পিয়ন

মোঃ রাসেল আলী
পিয়ন

মেডিকেল শাখা

ডাঃ আজিজুর রহমান চৌধুরী
মেডিকেল অফিসার

কানিজ ফাতেমা
সিনিয়র স্টাফ নার্স

অফিস

মোঃ নূরুল আলম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

জাফরিয়া পারভীন
উপ- প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মোহাম্মদ ইউনুছ
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

আলী আহাম্মদ
অফিস সহকারী

মোঃ লুৎফর রহমান
অভ্যর্থনাকারী

মোঃ মনসুর রহমান সিদ্দিকী
অফিস সহকারী

মোঃ শাহ্ আলম
অফিস সহকারী

মোঃ ফরিদ
ড্রাইভার

মোঃ বিল্লাল হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

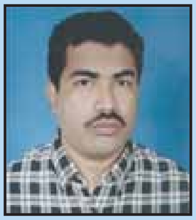
মোঃ বেল্লাল হোসেন ভূঁইয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ সিরাজ উল্লা
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ ইয়াছিন মিয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

লীনু বাড়ৈ
জ্যেষ্ঠ আয়া

মোঃ হারুন-অর-রশীদ
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ কামরুল ইসলাম
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোহাম্মদ মীর হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোছাঃ সেলিনা পারভীন
জ্যেষ্ঠ আয়া

ওমর আহম্মদ ভূঁইয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ মনির হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোছাঃ সেলিনা খাতুন
জ্যেষ্ঠ আয়া

মোঃ শাহীন হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

সোহেল হোসেন
পিয়ন

নিজাম উদ্দীন
পিয়ন

মোঃ জাকির হোসেন
পিয়ন

রাজু আহমেদ
পিয়ন

মোঃ আলমগীর হোসেন
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ আব্বাছ আলী
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ খোরশেদ আলম
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ সেলিম
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ সোলায়মান (বাবুল)
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ ছোলেমান (খোকন)
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ রুহুল আমীন
জ্যেষ্ঠ গার্ড

নান্টু বালা
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ আবু বকর শেখ
জ্যেষ্ঠ গার্ড

রিপন চাকমা
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন
জ্যেষ্ঠ গার্ড

রাসেল মাহমুদ
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মনির হোসেন
গার্ড

স্বপন মিয়া
গার্ড

মোঃ মোশারফ হোসেন
গার্ড

মোঃ দাউদ আলী
গার্ড

মোঃ আমিনুল ইসলাম
গার্ড

মোঃ মাসুদ ইমরান
গার্ড

মোঃ রমজান আলী
মালী

কুলসুম বিবি
ক্লিনার

মাহমুদা খাতুন
ক্লিনার

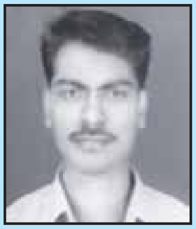
শ্রী লিটন চন্দ্র দাস
ক্লিনার

আবদুল আজিজ
ক্লিনার

মোঃ সবুজ হোসেন
ক্লিনার

মিঃ জেকুব
ক্লিনার

মোঃ আলমগীর হোসেন
ক্লিনার (মাস্টাররোল)

মোঃ কেফায়েতুল্লাহ
ক্লিনার (মাস্টাররোল)

হিসাব শাখা

মোঃ আশরাফ আলী
উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ আবুল কালাম
উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ ফারুক হোসেন
হিসাব সহকারী

মোঃ জাফর উল্যা চৌধুরী
হিসাব সহকারী

মোহাম্মদ শাহীনুল ইসলাম
হিসাব সহকারী

নুরুল আমিন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

প্রকৌশল শাখা

মোঃ সেলিম রেজা
সহকারী প্রকৌশলী

মোঃ লিয়াকত আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

মোঃ মজিবুর রহমান
বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার

আব্দুল মালেক
স্টোর কিপার

মোঃ ফখরুল আলম
সুপারভাইজার

অমল বাড়ৈ
টেকনিশিয়ান

মোঃ মুন্তাজ আলী
ইলেকট্রিশিয়ান

কবির হোসেন
ইলেকট্রিশিয়ান-কাম পিয়ন

রফিকুল ইসলাম
প্লাম্বার

মোঃ শহিদুল ইসলাম
লিফট অপারেটর

মোঃ নাসির উদ্দিন
লিফট অপারেটর

মোঃ জাকির হোসেন
লিফট অপারেটর

মোঃ নরুল হক
লিফট অপারেটর

বাবুল হাসান খলিফা
লিফট অপারেটর

মোনায়েম সিকদার
লিফট অপারেটর (মাস্টাররোল)

মোঃ রেজাউল করিম
লিফট অপারেটর (মাস্টাররোল)

বিভাগীয় কর্মচারী

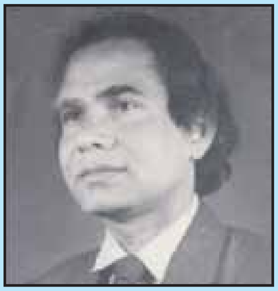
করম হোসেন
টেকনিশিয়ান কাম ডেমোনেস্ট্রেটর
সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা

মোঃ শরীফ উল্যাহ
পিয়ন (বাংলা)

মোঃ রফিকুল ইসলাম
জেষ্ঠ্য পিয়ন (ইংরেজি)

নূর মোহাম্মদ
জেষ্ঠ্য পিয়ন (ব্যবস্থাপনা)

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
জেষ্ঠ্য পিয়ন (হিসাববিজ্ঞান)

মোঃ ইসমাইল হোসেন
পিয়ন (ফিন্যান্স)

মোঃ গোলাম মোস্তফা
জেষ্ঠ্য পিয়ন (মার্কেটিং)

মোঃ ইমরান হোসেন
পিয়ন (অর্থনীতি)

মোঃ বিপ্লব হোসেন (সাইফুল)
পিয়ন (পরিসংখ্যান)

নুর হোসেন
পিয়ন (সাচিবিক বিদ্যা)

এক নজরে বিগত বছরের পরীক্ষার ফলাফল

HSC

পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মোট পাস	পাসের হার	মেধা তালিকায় স্থান	স্টার মার্কস
১৯৯১	৬১	৪৩	১৬	০২	৬১	১০০%	২য় ও ১৫তম = ২জন	০৪
১৯৯২	৫৬	৪০	১৩	০৩	৫৬	১০০%	১ম ও ১৬তম= ২জন	০২
১৯৯৩	২৪৭	১৬৯	৬২	০৭	২৩৮	৯৬%	২,৮,১১,১৪ ও ১৬তম= ৫জন	১৪
১৯৯৪	৫০৮	৩৬৬	১০৮	-	৪৭৪	৯৩%	১,৫,১৪ ও ১৬তম=৪ জন	২৭
১৯৯৫	৫০৮	৪৪৫	৫৭	-	৫০২	৯৯%	১,৩,১০(২),১২,১৩(২),১৪ ১৬,১৯ =১০জন	৪৭
১৯৯৬	৬৯৪	৪৭০	১৫১	-	৬২১	৯০%	১,৭,৮,১০,১১,১৪,১৫,১৭ ১৮ (২) ১৯তমএবং মেয়েদের মধ্যে ৯ম ও ১০ম= ১৩জন	২৮
১৯৯৭	৪৯০	৩৮৮	৬৮	-	৪৫৬	৯৩%	১০,১৩,১৫ ও ২০ তম =৪জন	২৫
১৯৯৮	৪৯২	২৬২	১৮১	০৩	৪৪৬	৯০.৬৫%	৫,৮,১৩,১৯ ও ২০তম এবং মেয়েদের মধ্যেঃ ৮ম ও ৯ম = ৭জন	১২
১৯৯৯	৬২৬	৪৩২	১৬৫	৯	৬০৬	৯৬.৮০%	৪,৫,১১,১৩,১৫,১৬,১৭,১০ম (মেয়েদের মধ্যে)=৮জন	২৯
২০০০	৬৬৮	৪৮০	১৪৫	০১	৬২৬	৯৩.৭২%	১,২,৩,৬,৮,১১,১২,১৩,১৪,১৫ ১৯ (যুগ্ন) ও ২০তম = ১৩ জন	৫৬
২০০১	৬৮৪	৫০৩	১৪৪	০২	৬৪৯	৯৬.২০%	১,১০,১৪,১৫,১৬,৯ম (মেয়েদের) মধ্যে=৬জন	৭১
২০০২	৭২৮	৫৯৩	১১২	-	৭০৫	৯৫.১৪%	১ম, ৩য়, ১৩ তম ও ১৯ তম = ৪জন	১৩৮

সন	মোট পরীক্ষার্থী	জিপিএ ৫	জিপিএ ৪ - ৫	জিপিএ ৩ - ৪	জিপিএ ২ - ৩	মোট পাস	পাসের হার	মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা
২০০৩	৮৪৭	-	২২২	৫৭৯	৪১	৮৪২	৯৯.৪১%	জিপিএ ৪.৬ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৭ জন (উল্লেখ্য এবছর কোন বোর্ড থেকে জিপিএ ৫ পায়নি)
২০০৪	৮৯৭	৫৩	৭১৩	১২৬	৩	৮৯৫	৯৯.৭৮%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৫৩ জন
২০০৫	৯০৪	৭১	৭৪৫	৮৭	১	৯০৪	১০০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৭১ জন
২০০৬	১৪৩৭	২২৭	১১০৪	১০৫	০	১৪৩৬	৯৯.৯৩%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ২২৭ জন
২০০৭	১৫০৫	২২৪	১০৭২	২০০	০৪	১৫০০	৯৯.৬৭%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ২২৪ জন
২০০৮	১৯২৪	৫১৮	১৩১৬	৮২	০৭	১৯২৩	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৫১৮ জন
২০০৯	১৮১৫	৪০৯	১৩৪৫	৬০	০	১৮১৪	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৪০৯ জন
২০১০	২০২৬	৪২৩	১৪৪২	১৫৫	০২	২০২২	৯৯.৮০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৪২৩ জন
২০১১	২০৪৩	৮৩১	১১৭৩	৩৮	০	২০৪২	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৮৩১ জন
২০১২	২৪৪৬	১১৫৬	১২৪২	৪৬	০	২৪৪৩	৯৯.৮৮%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ১১৫৬ জন
২০১৩	১৯৪০	৮৭১	৯৯৪	৬৫	০	১৯৩০	৯৯.৪৯%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৮৭১ জন
২০১৪	২১৮৫	৮১৯	১২৮১	৭৯	০	২১৭৯	৯৯.৭৩%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৮১৯ জন

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

অনার্স

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ব্যবস্থাপনা	১৯৯৭	৪৩	৩	৩৬	৩	-	৪২	৯৮%	১ম, ২য় ও ৩য়
	১৯৯৮	৪৩	২	৪১	-	-	৪৩	১০০%	২য় ও ৪র্থ
	১৯৯৯	৪২	১	৪০	১	-	৪২	১০০%	১ম
	২০০০	৪১	-	৩৫	২	-	৩৭	৯০.২৪%	-
	২০০১	৪৩	-	৩৯	২	-	৪১	৯৫.৩৪%	-
	২০০২	৩৮	-	২৯	৪	-	৩৩	৮৭%	-
	২০০৩	৪৯	১	৪৬	২	-	৪৯	১০০%	১ম
	২০০৫	৪২	১	৩৯	-	-	৪০	৯৫.২৩%	-
	২০০৬	৩৫	-	৩৫	-	-	৩৫	১০০%	-
	২০০৭	৪৪	১	৪১	২	-	৪৪	১০০%	-
	২০০৮	৪১	১১	২৯	১	-	৪১	১০০%	-
	২০০৯	৪১	৯	২৭	১	-	৩৭	৯০.২৫%	-
	২০১০	৪৫	৩	৩৯	-	১	৪৩	৯৫.৫৬%	-
	২০১১	৩৭	১২	২৪	-	১	৩৭	১০০%	-
	২০১২	৩৮	৭	২৯	-	১	৩৭	৯৮%	-
হিসাববিজ্ঞান	১৯৯৭	৩২	৩	২৯	-	-	৩২	১০০%	৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ১৫তম
	১৯৯৮	৪৭	৩	৪০	৩	-	৪৬	৯৭.৮৭%	২য়, ৪র্থ ও ১৪তম
	১৯৯৯	৪৫	১	৩৪	৪	-	৩৯	৮৬.৬৬%	২৬তম
	২০০০	৪৪	-	২৬	১১	-	৩৭	৮৪.০৯%	-
	২০০১	৪৯	-	৪৩	৩	১	৪৭	৯৬%	-
	২০০২	৪৬	-	৩৭	৮	-	৪৫	৯৮%	-
	২০০৩	৬৩	৭	৫৪	২	-	৬৩	১০০%	৪র্থ, ৫ম, ১০ম, ৩০তম, ৩২তম, ৩৩তম ও ৩৪তম
	২০০৫	৪৪	৭	৩৬	-	-	৪৩	৯৭.৭২%	-
	২০০৬	৪৬	১৭	২৯	-	-	৪৬	১০০%	-
	২০০৭	৫১	১৩	৩৮	-	-	৫১	১০০%	-
	২০০৮	৪৮	২১	২৬	-	-	৪৭	৯৮%	-
	২০০৯	৪০	১৫	২৫	-	-	৪০	১০০%	-
	২০১০	৫২	১৮	৩৪	-	-	৫২	১০০%	-
	২০১১	৪৬	২৬	১৮	-	১	৪৫	৯৮%	-
	২০১২	৪৮	৩৭	১০	-	-	৪৭	৯৮%	-
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১৯৯৮	৩৯	৫	৩৪	-	-	৩৯	১০০%	১ম থেকে ৫ম পর্যন্ত
	১৯৯৯	৫৬	৭	৪৬	১	-	৫৪	৯৬.৪২%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম
	২০০০	৫৩	৬	৪৪	-	-	৫০	৯৪.৩৩%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৫১	৯	৩৯	২	-	৫০	৯৮.০৩%	১ম থেকে ৯ম।
	২০০২	৪৯	১৪	৩৫	-	-	৪৯	১০০%	১ম থেকে ৭ম, ৮ম (২), ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম
	২০০৩	৫৩	১৮	৩৫	-	-	৫৩	১০০%	১ম থেকে ৫ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম,(২), ১৩তম, ১৫তম ১৬তম(৩) ও ১৮তম(২)
	২০০৫	৪৪	১৯	২৫	-	-	৪৪	১০০%	
	২০০৬	৪৫	৩১	১৩	-	-	৪৪	৯৭.৭৮%	
	২০০৭	৪৬	২৯	১৭	-	-	৪৬	১০০%	
	২০০৮	৫১	৪৩	৮	-	-	৫১	১০০%	
	২০০৯	৪৯	৩৯	১০	-	-	৪৯	১০০%	
	২০১০	৫৫	৪৩	১২	-	-	৫৫	১০০%	
	২০১১	৫৫	৪৮	৭	-	-	৫৫	১০০%	
	২০১২	৫২	৩৮	১৩	-	-	৫১	৯৮%	

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

অনার্স

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
মার্কেটিং	১৯৯৮	৩৩	৩	২৯	-	-	৩২	৯৬.৯৬%	১ম ও ২য়(যুগ্ম)
	১৯৯৯	৫৩	-	৪৬	২	-	৪৮	৯০.৫৬%	-
	২০০০	৪৭	২	৩৬	২	-	৪০	৯৮%	৩য় ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৪৮	-	৪২	২	-	৪৪	৯২%	-
	২০০২	৫০	-	৪৬	-	-	৪৬	৯২%	-
	২০০৩	৫১	-	৪৯	২	-	৫১	১০০%	-
	২০০৫	৫০	১৩	৩৭	-	-	৫০	১০০%	
	২০০৬	৪৫	১৭	২৮	-	-	৪৫	১০০%	
	২০০৭	৫৪	১৪	৪০	-	-	৫৪	১০০%	
	২০০৮	৫১	১৪	৩৭	-	-	৫১	১০০%	
	২০০৯	৪৫	১৪	২৯	১	-	৪৪	৯৮%	
	২০১০	৫০	২১	২৮	-	-	৪৯	৯৮%	
	২০১১	৪৫	১৭	২৭	-	-	৪৪	৯৮%	
	২০১২	৫২	৬	৪৫	-	-	৫১	৯৮%	
পরিসংখ্যান	১৯৯৯	৩০	১৭	১২	-	-	২৯	৯৬.৬৬%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৭ম, ৮ম, ১০ম(যুগ্ম),১২,১৩,১৪,১৭ ও ১৮তম
	২০০০	৮	৪	৩	-	-	৭	৮৮%	৩য়
	২০০১	৫	২	৩	-	-	৫	১০০%	১০ম ও ১৬তম।
	২০০২	৫	-	৫	-	-	৫	১০০%	-
	২০০৩	৯	৭	২	-	-	৯	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ১০ম, ১৭ ও ১৮তম।
	২০০৫	১৪	৩	১০	-	১	১৪	১০০%	
	২০০৬	৬	-	৬	-	-	৬	১০০%	
	২০০৭	৫	১	৪	-	-	৫	১০০%	
	২০০৯	২	-	২	-	-	২	১০০%	
ইংরেজি	২০০০	৩২	-	১২	১৭	-	২৯	৯০.৬২%	-
	২০০১	৩৮	-	৬	২১	৮	৩৫	৯২.১৮%	-
	২০০২	৪২	-	৯	২৮	-	৩৭	৮৮.০৯%	-
	২০০৩	৪৮	-	২৩	২০	-	৪৩	৮৯.৫৮%	-
	২০০৫	২৬	-	২৩	২	১	২৬	১০০%	
	২০০৬	১২	-	১০	২	-	১২	১০০%	
	২০০৭	৩১	-	২৬	৫	-	৩১	১০০%	
	২০০৮	১৮	-	১৪	৪	-	১৮	১০০%	
	২০০৯	১৮	-	১৩	৪	-	১৭	৯৪.৪৫%	
	২০১০	২২	-	১৪	৫	১	২০	৯১%	
	২০১১	২১	-	১৪	৩	১	১৮	৮৬%	
	২০১২	২০	-	১৬	২	১	১৯	৯৫%	
অর্থনীতি	২০০০	১৪	৪	১০	-	-	১৪	১০০%	১ম, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৩৩	১	২২	৫	২	৩০	৯১%	২য়।
	২০০২	৯	২	৫	১	১	৯	১০০%	২য় ও ৮ম
	২০০৩	১৬	-	১১	৪	-	১৫	৯৩.৭৫%	-
	২০০৫	১৯	-	১৬	৩	-	১৯	১০০%	
	২০০৬	২১	-	২০	১	-	২১	১০০%	
	২০০৭	১৬	১	১১	২	১	১৫	৯৩%	
	২০০৮	৮	-	৬	২	-	৮	১০০%	
	২০০৯	৭	২	৫	-	-	৭	১০০%	
	২০১০	৮	২	৬	-	-	৮	১০০%	
	২০১১	১১	২	৯	-	-	১১	১০০%	
	২০১২	৮	-	৭	-	১	৮	১০০%	

এক নজরে বিগত বছরের পরীক্ষার ফলাফল

মাস্টার্স

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ব্যবস্থাপনা	১৯৯৬	৩২	৪	২৮	-	৩২	১০০%	২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৯ম।
	১৯৯৭	২৩	-	২৩	-	২৩	১০০%	-
	১৯৯৮	১৪	১	১২	১	১৪	১০০%	৫ম।
	১৯৯৯	১৯	-	১৬	৩	১৯	১০০%	-
	২০০০	১১	-	১০	১	১১	১০০%	-
	২০০১	১২	-	১২	-	১২	১০০%	-
	২০০২	২১	১	২০	-	২১	১০০%	৩য়।
	২০০৩	১২	-	১২	-	১২	১০০%	-
	২০০৪	১৭	৩	১৪	-	১৭	১০০%	৪থ, ৮ম ও ১৩তম।
	২০০৭	৫	৪	১	-	৫	১০০%	-
	২০০৮	২৬	২৫	১	-	২৬	১০০%	-
	২০০৯	১৯	১১	৮	-	১৯	১০০%	-
	২০১০	২৮	২২	৬	-	২৮	১০০%	৯ম, ১৫তম ও ২০তম।
	২০১১	২৫	১৯	৬	-	২৫	১০০%	
হিসাববিজ্ঞান	১৯৯৬	২৩	১	২২	-	২৩	১০০%	৪র্থ।
	১৯৯৭	১৭	-	১৭	-	১৭	১০০%	-
	১৯৯৮	২	-	২	-	২	১০০%	-
	১৯৯৯	১৩	৩	৯	১	১৩	১০০%	২য়(২জন), ৮ম।
	২০০০	১৬	১	১৩	২	১৬	১০০%	-
	২০০১	১৪	১	১৩	-	১৪	১০০%	৬ষ্ঠ।
	২০০২	৭	-	৭	-	৭	১০০%	-
	২০০৩	২১	৪	১৭	-	২১	১০০%	১৪তম, ২৬তম(২জন) ও ৩৩তম
	২০০৪	২১	৭	১৪	-	২১	১০০%	১৩তম, ২৬তম, ২৮তম, ৩২তম, ৩৫তম, ৩৭তম ও ৪০তম
	২০০৬	২৫	১৫	১০	-	২৫	১০০%	৭ম, ১০ম, ১১তম, ১৭তম, ১৮তম, ২০তম, ২১তম, ২৩তম, ২৫তম, ২৭তম
	২০০৭	১৫	১৫	-	-	১৫	১০০%	-
	২০০৮	৩৪	২৭	৭	-	৩৪	১০০%	-
	২০০৯	৪০	৩৩	৭	-	৪০	১০০%	-
	২০১০	৩০	১৯	১০	-	২৯	৯৭%	-
	২০১১	৩০	২০	৯	-	২৯	৯৭%	
মার্কেটিং	১৯৯৭	৭	-	৬	১	৭	১০০%	-
	১৯৯৯	২০	৫	১৫	-	২০	১০০%	২য়, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম।
	২০০১	২১	৫	১৬	-	২১	১০০%	৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ(২জন)।
	২০০২	২২	৩	১৯	-	২২	১০০%	১ম, ২য়(২জন)।
	২০০৩	১৬	-	১৪	১	১৫	১০০%	-
	২০০৪	১৪	৫	৯	-	১৪	১০০%	১ম, ৪র্থ, ১৩তম(৩জন)
	২০০৬	২৮	২৩	৫	-	২৮	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়(৩), ৪র্থ, ৫ম(২), ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম, ১১তম, ১২তম, ১৪তম(২),
	২০০৭	২৬	২০	৬	-	২৬	১০০%	-
	২০০৮	২৬	১৪	১২	-	২৬	১০০%	-
	২০০৯	২৪	১৩	১১	-	২৪	১০০%	-
	২০১০	২৪	১৩	১১	-	২৪	১০০%	
	২০১১	৩৯	৩০	৯	-	৩৯	১০০%	
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১৯৯৯	১৩	৫	৮	-	১৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম।
	২০০০	৩৩	১২	২০	১	৩৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম(৩জন), ৮ম ও ৯ম(২জন)।
	২০০১	৩১	২	২৯	-	৩১	১০০%	১ম, ২য়।
	২০০২	১৩	৮	৪	১	১৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম(২জন), ১০ম।
	২০০৩	৩৪	৩	৩১	-	৩৪	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়
	২০০৪	৩৬	২৫	১১	-	৩৬	১০০%	১ম, ২য়(২জন), ৩য় থেকে ৭ম, ৮(২জন), ৯ম, ১০ম, ১২তম(২জন), ১৩তম থেকে
	২০০৬	২৫	২৪	১	-	২৫	১০০%	৩য়, ৪র্থ১ ৭ম(২), ৮ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম, ১৪তম(২জন) ১৫তম, ১৬তম(২)।
	২০০৭	২২	১৪	৬	-	২০	৯২%	-
	২০০৮	৫৩	৪২	১১	-	৫৩	১০০%	-
	২০০৯	৪৬	৩৫	৮	-	৪৩	৯৩.৪৭%	-
	২০১০	৪৩	৩৪	৯	-	৪৩	১০০%	১ম, ৩য়, ৯ম, ১৫তম, ১৬তম, ১৭তম।
	২০১১	৫০	৪৭	২	-	৪৯	৯৮%	
পরিসংখ্যান	২০০০	২৪	৩	১১	-	১৪	৫৮.৩৩%	১ম, ২য় ও ৩য়।
	২০০১	৯	-	৪	১	৫	৫৬%	-
	২০০২	২	-	২	-	২	১০০%	-
	২০০৩	২	-	২	-	২	১০০%	-
	২০০৪	৯	৭	-	-	৭	৭৭.৭৮%	৪র্থ, ১৫তম, ১৯তম(২জন), ২০তম, ৩০তম ও ৩৩তম।
	২০০৬	৮	৭	১	-	৮	১০০%	২য়, ৮ম, ১০ম, ১১তম, ১৮তম(২) ও ২১তম।
	২০০৭	৪	-	৩	-	৩	৭৫%	
	২০০৮	৬	৪	২	-	৬	১০০%	
অর্থনীতি	২০০২	১১	১	৮	১	১০	৯১%	৪র্থ।
	২০০৩	৩	২	-	-	২	৬৬.৬৭%	১০ম ও ১২তম
	২০০৮	৯	১	৮	-	৯	১০০%	-
	২০০৯	৪	২	২	-	৪	১০০%	-
	২০১১	১	১	-	-	১	১০০%	
ইংরেজি	২০০৮	১১	-	১১	-	১১	১০০%	-
	২০১০	৯	-	৭	-	৭	৭৮%	-
	২০১১	৫	-	২	-	২	৪০%	

বার্ষিক প্রতিবেদন 2014

ঢাকা কমার্স কলেজ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪

সময় আর নদীর স্রোত কখনও অপেক্ষা করে না। দেখতে দেখতে ঢাকা কমার্স কলেজ ২৫ বছরে পা রাখল। দীর্ঘ সাফল্যের পথ চলায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে এই কলেজ। তবুও এখন সামনে রয়েছে দীর্ঘ পথচলা। বিগত ২০১৪ সালের কার্যক্রম নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪'। ২০১৪ সালের ঢাকা কমার্স কলেজের সকল কর্মকাণ্ড এই প্রতিবেদনে বিধৃত হয়েছে। এই প্রতিবেদনে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করার জন্য আমরা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো: আবু সাইদ ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল স্যারের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রগতিতে 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪' প্রকাশের সুযোগ দেয়ার জন্য আমরা পরিচালনা পরিষদের নিকট ঋণী। এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য প্রগতি কমিটির আহবায়ক, কমিটির সকল সদস্য, শিক্ষক, কর্মকর্তাবৃন্দ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমরা ভুলত্রুটিমুক্ত প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুলত্রুটি যদি থাকে সে কারণে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করতে সহায়তা প্রদান করেছিলেন জনাব সনজিৎ সাহা, চেয়ারম্যান মার্কেটিং বিভাগ, শামা আহমদ, সহযোগী অধ্যাপক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, মেহেদী হাসান, সহকারী অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ, লাইব্রেরিয়ান আশরাফুল করিম। প্রতিবেদনটি গ্রন্থনা করেছেন শবনম নাহিদ স্বাতী, সহযোগী অধ্যাপক, (সমাজবিজ্ঞান)

পরিচালনা পরিষদ

ঢাকা কমার্স কলেজ সুশিক্ষিত, বিজ্ঞ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ সফিক আহমেদ সিদ্দিক। এ পর্যন্ত ১১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শিক্ষক পরিষদ

ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকবৃন্দের সমন্বয়ে শিক্ষক পরিষদ গঠিত। শিক্ষক পরিষদের সচিব প্রফেসর মোঃ আবদুল কাইয়ুম, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা, ইংরেজি বিভাগ। শিক্ষক পরিষদ মাধ্যমে কলেজের নিয়মিত শিক্ষক বৃন্দের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষক প্রতিনিধি মনোনীত

২০১৪ সালের জন্য কলেজ পরিচালনা পরিষদ শিক্ষক প্রতিনিধি মনোনয়ন করুন। ০৮/০৫/২০১৪ তারিখ নব্য শিক্ষক প্রতিনিধি দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শীত বস্ত্র বিতরণ

প্রতিবছরের মতো ২০১৪ সালেও শীতার্তদের শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

শিক্ষকদের বনভোজন

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ সফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যারের গাজীপুরস্থ খামার বাড়িতে শিক্ষকবৃন্দের বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষকবৃন্দ সেখানে আনন্দ ঘন মুহূর্ত অতিবাহিত করেন। বনভোজনের শেষপর্বে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অমর একুশে পালিত

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে ঢাকা কমার্স কলেজের নতুন শহীদ মিনারের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন ভাষা সৈনিক কবি আহমেদ রফিক। উক্ত অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ, প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল, পরিচালনা পরিষদের সদস্য বি.ইউ.বিটির উপাচার্য প্রফেসর মোঃ আবু সালেহ, পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও ঢাকা কমার্স কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, কলেজের শিক্ষকবৃন্দ ও তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ সদ্যনির্মিত শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন। অনুষ্ঠানের আহবায়ক ছিলেন প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদার ১৭ মার্চ জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মদিন পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

২৬ মার্চ ২০১৪ সালে প্যারেড গ্রাউন্ডে লাখো কণ্ঠে 'সোনার বাংলা' জাতীয় সংগীত গাওয়ার অনুষ্ঠানে ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকবৃন্দ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। কলেজের পক্ষে এই আয়োজনের আহবায়ক ছিলেন প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে সিটি ক্লাব মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন

মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ইলিয়াস মোলা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন জনাব জালাল ইউনুস, মিডিয়া কমিটি, বিসিবি। কলেজের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ সফিক আহমেদ সিদ্দিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল ও কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের আহবায়ক ছিলেন মোঃ হাসানুর রশীদ।

বার্ষিক ভোজ

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে বার্ষিক ভোজ সম্পন্ন হয়েছে। বার্ষিক ভোজের উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ। ভোজের প্রধান অতিথি ছিলেন মোহম্মদ গোলাম রব্বানী, ভারপ্রাপ্ত সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিশেষ অতিথি ছিলেন মোঃ শহীদ উল্যাহ খন্দকার, চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ। এছাড়া সম্মানিত অতিথি ছিলেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর সফিক আহমেদ সিদ্দিক। পরিচালনা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এ. এফ. এফ সরওয়ার কামাল। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক অধ্যক্ষ কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ফারুকী, কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ ও পরিচালনা পরিষদের সদস্য প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দের পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কলেজের শিক্ষার্থী শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তাদের পরিবার বর্গ ও অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ভোজে অংশগ্রহণ করেন। বার্ষিক ভোজের আহবায়ক ছিলেন মোঃ নুরুল আলম ভূঁইয়া, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ সফিক আহমেদ সিদ্দিক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাঈদ। কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল, শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান সাফল্য মণ্ডিত করেন। পুরস্কার বিতরণ শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের আহবায়ক ছিলেন জনাব মাকসুদা শিরিন সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ

১৬/৬/২০১৪ থেকে ১৮/৬/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত কলেজে অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সাহিত্য ও সাস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ এবং উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল। অনুষ্ঠানের আহবায়ক ছিলেন জনাব হাসানুর রশীদ, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ ও মোঃ শাহজাহান আলী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ।

বিদায় সংবর্ধনা

২৩ মার্চ ২০১৪ তারিখে দ্বাদশ শ্রেণির বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল। অনুষ্ঠানের আহবায়ক ছিলেন জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ শিক্ষার্থী উপদেষ্টা, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ।

নবীনবরণ

সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় ১৫ মে, ২০১৪। অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের ভর্তি কমিটির আহবায়ক ছিলেন জনাব আকতার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, চেয়ারম্যান, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ।

একাদশ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন

একাদশ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগাম অনুষ্ঠিত হয় ১ জুলাই ২০১৪। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল। অনুষ্ঠানে ভর্তি কমিটির আহবায়ক ছিলেন প্রফেসর শফিকুল ইসলাম, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা, ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

পদোন্নতি

২০১৪ সালে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন সর্বজনাব তানভীর আহম্মেদ। তন্ময় সরকার, মোঃ হযরত আলী, মোঃ মাহবুবুল আলম, ফারহানা হাসমত, মীর মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন জনাব শবনম নাহিদ স্বাতী।

নিয়োগ

বাংলা, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, মার্কেটিং, পরিসংখ্যান গণিত ও কম্পিউটার বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়।

ইফতার পার্টি

১৬ জুলাই ২০১৪ তারিখে মাহে রমজান উপলক্ষ্যে কলেজ পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দের জন্য ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস পালিত

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। ১৫ আগস্ট সকালে কোরআন খানি ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছিল। ২১ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে নিচতলার হলরুমে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে সভাপত্বি করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন উপাধ্যক্ষ মোঃ মোজাহার জামিল ও শিক্ষকবৃন্দ। উক্ত আলোচনা সভায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঈদ পুনর্মিলনী

ঈদুল ফিতরের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে ৯/৮/২০১৪ তারিখ, ঈদুল আযহার ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৩/১০/২০১৪ তারিখে। উক্ত দুই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ। অনুষ্ঠানে ঈদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন শিক্ষক পরিষদের সচিব প্রফেসর আব্দুল কাইয়ুম, ইংরেজি বিভাগ।

টিচার্স ওরিয়েন্টেশন প্রোগাম

১৫/৯/২০১৪ তারিখে ১৯তম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আহবায়ক ছিলেন প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ। ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে শিক্ষকবৃন্দ প্রবন্ধ পাঠ করেন আলোচনা করেন এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদান বিষয়ে নবীন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সামগ্রিক বিষয়ে আলোচনা করেন কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল।

নৌভ্রমণ (শিক্ষাসফর)

০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে নৌভ্রমণ সম্পন্ন হয়েছে। ১০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী নৌভ্রমণে অংশগ্রহণ করে। কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ, পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ নৌভ্রমণে অংশ গ্রহণ করেন। নৌভ্রমণে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অতিথিবৃন্দ আনন্দ উপভোগ করেন। নৌভ্রমণের আহবায়ক ছিলেন মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ।

এইচ.এস.সির ফলাফল প্রকাশ

এইচ.এস.সির ফলাফল ১৩ আগস্ট ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত হয়। সর্বমোট পরীক্ষার্থী ছিল ২১৮৫ জন। জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮১৯ জন। ২১৭৯ জন পাস করেছে, পাসের হার ৯৯.৭৩%।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠিত

কলেজ পরিচালনা পরিষদের ০৮/০৫/২০১৪ তারিখের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কলেজের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়েছে।

প্রকাশনা

কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী ও কাজী সায়মা বিনতে ফারুকী কর্তৃক রচিত 'ব্যবসায় সংগঠনও ব্যবস্থাপনা' দ্বিতীয়পত্র এবং 'ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা' দ্বিতীয়পত্র একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

চেয়ারম্যান ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা পরিবর্তন

২০১৪ চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন জনাব মাওসুফা ফেরদৌসী, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, জনাব আব্দুর রহমান পরিসংখ্যান, গঠিত ও কম্পিউটার বিভাগ, জনাব সাদিক মোহাম্মদ সেলিম, ইংরেজি বিভাগ, সাইদুর রহমান মিঞা, বাংলা বিভাগ শিক্ষার্থী উপদেষ্টা পদে যোগদান করেন প্রফেসর শফিকুল ইসলাম, প্রফেসর আব্দুল কাইয়ুম, প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী, প্রফেসর মোঃ ইলিয়াছ, জনাব ইউনূস হাওলাদার।

শোকসংবাদ

ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শরিফুল ইসলামের মাতা ১২ আগস্ট ইন্তেকাল করেন। শিক্ষক পরিষদের সভায় তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। লাইব্রেরিয়ান আশরাফুল করিমের শ্বশুড় অক্টোবর ৬ তারিখে ও শাশুড়ী নভেম্বরের ৩ তারিখে ইন্তেকাল করেন। শিক্ষক পরিষদের সভায় তাঁদের জন্য দোয়া ও আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

উন্নয়ন ও নির্মাণ

ঢাকা কমার্স কলেজের ২০১৪ ইং সনের নির্মাণ কাজ :

১। শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ।

২। সাব-স্টেশন, জেনারেটর ভবন নির্মাণ ও সাব-স্টেশন, জেনারেটর স্থানান্তর, স্থাপন করা।

৩। অডিটরিয়াম স্টেজ নির্মাণ, ডেকোরেশন, লাইটিং সিস্টেম, ফায়ার-ফাইটিং সিস্টেমস এবং পেইন্টিং করা।

৪। আবাসিক ভবন-২ এর বাহিরের পাশের রং এর কাজ করা।

৫। একাডেমিক ভবন-২ এর ১৪,১৫তম নির্মাণ কাজ ও নতুন

একটি লিফ্‌ট সংযোজনের কাজ চলিতেছে।

৬। ছাত্রী হোস্টেলের রং এর কাজ ও লিফ্‌ট সংযোজনের কাজ চলিতেছে।

৭। অডিটরিয়ামের উত্তর পাশের মাঠের বাউন্ডারী ওয়ালের কাজ শুরু হবে।

ঢাকা কমার্স কলেজ ডরমেটরি

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, ধুমপান ও রাজনীতিমুক্ত ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কমার্স কলেজ জন্মলগ্ন থেকেই সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে কলেজের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির মেধাবী ও দারিদ্র ছাত্রদের লেখাপড়ার সুযোগদানের জন্য প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় ১৬ আসন বিশিষ্ট একটি ডরমেটরি স্থাপন ও পরিচালনা করে আসছে। ডরমেটরিতে কেবল ঢাকা কমার্স কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে অধ্যয়নরত (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি) দরিদ্র ও মেধাবী (SSC-তে কমপক্ষে জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ ছাত্র) কর্তৃপক্ষের অনুমতিতে বসবাসের জন্য সিট বরাদ্দ পেয়ে থাকে। দরিদ্র বলতে প্রার্থী ছাত্রকে প্রকৃতপক্ষে (যেমন-কৃষক, দিনমজুর, রিক্সাওয়ালা, কাজের বুয়া, নিতান্তই স্বল্প আয়ের ব্যক্তির সন্তান) ঘরের সন্তান হতে হবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ১ জন শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড বিভাগ, সার্বক্ষণিক ডরমেটরির ব্যবস্থাপনা ও বরাদ্ধপ্রাপ্ত ছাত্রদের দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি ডরমেটরির সিট বরাদ্দ; বাতিলসহ যাবতীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, ইংরেজী বিভাগ, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি, জনাব মোঃ ইউনুছ হাওলাদার, সহযোগী অধ্যাপক, সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি ও মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ।

সম্মানিত কলেজ গভর্নিং বডি বিশেষত মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় ড. সফিক সিদ্দিক স্যারের বিবেচনা এবং অধ্যক্ষ মহোদয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর কলেজ কর্তৃপক্ষ ডরমেটরির অবকাঠামোগত সংস্কার সাধন করে ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন। এছাড়াও, ডরমেটরিতে নতুন পড়ার টেবিল, চেয়ার, রান্নাঘরের খাবারের র‌্যাক এবং অতিরিক্ত ফ্যান-লাইট সরবরাহ করে ছাত্রদের বসবাসের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছেন। গত ২০১৪ সালের জুলাই মাসে কলেজ কর্তৃপক্ষ ২৪ ঘন্টা খাবার পানি সরবরাহকল্প প্রায় ৭০,০০০/- টাকা (সত্তর হাজার টাকা) ব্যয়ে নতুন মটর ও সেনিটারি সরঞ্জাম সরবরাহ করে ডরমেটরির ছাত্রদের দীর্ঘদিনের পানির সমস্যা সমাধান করেছেন। ডরমেটরিতে বসবাসরত ছাত্রদের পড়ার জন্য নিয়মিত একটি দৈনিক সংবাদপত্র সরবরাহ করা হয়।

২০১৩ সালের শেষদিকে সম্মানিত কলেজ গভর্নিং বডি এক সভায় ডরমেটরিতে বসবাসরত ছাত্রদের জন্য কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ভর্তি ফি মওকুফ এবং বিনাবেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেছেন। দরিদ্র মেধাবী কল্যাণ তহবিল থেকে বিশেষ বিবেচনায় ৫ জন ছাত্রকে খাবার খরচ বাদ বার্ষিক ১,২০,০০০/- টাকা (একলক্ষ বিশ হাজার টাকা মাত্র) প্রদান করা হয়।

ক্লাব কার্যক্রম ২০১৪

আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফী

রং তুলির মাধ্যমে বা ক্যামেরা বন্ধি করে আমরা আমাদের জীবনে ছোট ছোট ঘটনাগুলোকে স্মৃতিময় করে রাখতে পারি। জীবনের স্মৃতিময়তাকে ধরে রাখার জন্য ছবি তোলা ও আঁকা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য আমাদের "আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি" সোসাইটি গঠিত হয়েছে ২০০৬ সালের ৯ জুলাই। ঢাকা কমার্স কলেজের যতগুলো ক্লাব রয়েছে আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি তাদের মধ্যে অন্যতম। সোসাইটির সামগ্রিক কার্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপিকা শামা আহ্‌মদ ও কো-মডেরেটর হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ। প্রেসিডেন্ট ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের ৪র্থ বর্ষের তৌহিদুল ইসলাম বাঁধন ও সেক্রেটারি নুসরাত নওরীন রুমা। এছাড়াও কো-অরডিনেটর ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের ১ম বর্ষের মোঃ জিহান ও মিজানুর আরিয়ান।

উদ্দেশ্য : শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে এবং বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে এই ক্লাব বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন ইভেন্টের আয়োজন করে থাকে।

নিয়মিত সভা : এ বছরে একাদশ শ্রেণীর নতুন সদস্যদের জন্য মাসিক নিয়মিত ক্লাব কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে তাদের সৃজনশীল বিকাশের ও প্রতিভা উন্নয়নে ক্লাব গুলো প্রজেক্টরের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে।

ফটোওয়ার্ক : এ বছরের প্রথমে এবং বছরের বিভিন্ন সময়ে ফটোওয়ার্ক এর আয়োজন করা হয়। ফটোওয়ার্ক বিরুলিয়া, বোটানিক্যাল গার্ডেন ও DOHS- এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

*** আলোকচিত্র ও চিত্রাংকন প্রদর্শনী :** এ বছর ২টি আলোকচিত্র ও চিত্রাংকন প্রদর্শনী এর আয়োজন করা হয়।

* **নবীনবরণ :** এ বছরের ১৯/০৯/১৪ তারিখে কলেজ অডিটোরিয়াম এই আয়োজন করা হয়। শিক্ষা সফর এ বছর ৭/১১/১৪ তারিখে টাঙ্গাইলে মহেরা জমিদার বাড়ি (পুলিশ ট্রেনি একাডেমী)-তে একদিনের সকাল-সন্ধ্যা শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়েছে।

আইডি কার্ড : প্রতিবছর আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটির নতুন সদস্যদের নির্ধারিত লোগো সম্বলিত আইড কার্ড প্রদান করা হয়।

ফেইসবুক গ্রুপ পেইজ : ARTA AND PHOTOGRAPHY SOCIETY (DCC) নামে একটি ফেইসবুক গ্রুপ পেউজ রয়েছে। যা ইতিমধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

ঢাকা কমার্স কলেজ কল্যাণ সংঘ

শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের নিয়মিত টিফিন সরবরাহ, শিক্ষার্থীদের ইউনিফরম বিতরণ, ফাইল ও খাতা সরবরাহ ও কম্পিউটার ল্যাব পরিচালনাসহ কলেজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে ঢাকা কমার্স কলেজ কল্যাণ সংঘ। সদস্যদের পারস্পরিক কল্যাণ, সামাজিক সম্পর্ক বৃদ্ধি, বৈষয়িক কল্যাণ, বিপদে সহায়তা এবং পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ কল্যাণ সংঘ। ২০১৪ সালে কল্যাণ সংঘের সচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান এস এম আলী আজম। ২০১৪ সালে কল্যাণ সংঘের কার্যক্রম নিম্নরূপ :

আধুনিক কম্পিউটর ল্যাব উদ্বোধন : ৩০ মার্চ ২০১৪ ঢাকা কমার্স কলেজ কল্যাণ সংঘ পরিচালিত অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থা বিভাগের প্রফেসর এবং তথ্য ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ড. মোঃ মঞ্জুর মোর্শেদ। এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল উপস্থিত ছিলেন।

২০১৪ সালে ৬২টি নতুন কম্পিউটার, ৬০টি কম্পিউটার টেবিল, ৬০টি উন্নত মানের চেয়ার, ৬০টি ইউপিএস, ৪টি প্রিন্টার্স এবং ৪টি প্রজেক্টর ক্রয় করা হয়েছে। ৩০ মার্চ ২০১৪ থেকে ল্যাব ক্লাস প্রজেক্টরে নেয়ার মাধ্যমে কলেজে ডিজিটাল ক্লাসরুম কার্যক্রমের শুভ সূচনা হয়।

১২ এপ্রিল ২০১৪ কম্পিউটার ল্যাবসমূহ নেটওয়ার্কিং করা হয়। ১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ কম্পিউটার ল্যাবসমূহে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়। এছাড়া পুরাতন কম্পিউটারসমূহ উইন্ডোজ ৯৮ থেকে আধুনিক এক্সপি করা হয়েছে। কম্পিউটার ল্যাবে কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রোগ্রাম উদ্ভাবক এবং বিভিন্ন হার্ডওয়্যার পরিচিতি সম্বলিত ডিজিটাল পরিচিতি সংযোগ করা হয়েছে।

ফলাহার : ১১ জুন ২০১৪ ঢাকা কমার্স কলেজ কল্যাণ সংঘ আয়োজিত ৭ম বার্ষিক ফলাহার উৎসব হয়। দেশীয় বহুরূপ ফলাহার অংশগ্রহণ করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সদস্যবৃন্দ এবং শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

আইসক্রিম জোন উদ্বোধন : ৩০ আগস্ট ২০১৪ কল্যাণ সংঘ পরিচালিত ডি-ক্যাফে ঈগলু আইসক্রিম জোন উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ। এসময়ে সকল শিক্ষক ও কর্মচারীকে ঈগলুর সৌজন্যে আইসক্রিম বিতরণ করা হয় এবং ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নন্দনপার্ক প্রবেশ কুপন ও ফ্রি রাইড কুপন দেয়া হয়।

কফি উৎসব : কল্যাণ সংঘের সহযোগিতায় নেসক্যাফে সৌজন্যে ১১ ও ১২ আগস্ট ২০১৪ ৩য় কফি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এসময়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ১১ হাজার কাপ কফি বিতরণ করা হয়। ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ কল্যাণ সংঘের সহযোগিতায় নেসক্যাফের সৌজন্যে নৌবিহার অংশগ্রহণকারী শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ২ হাজার কাপ কফি বিতরণ করা হয়।

পিঠা উৎসব : ১৭ জানুয়ারি ২০১৪ কল্যাণ সংঘ আয়োজিত ৩য় পিঠা উৎসবে কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ ১৮ আগস্ট ২০০১ গঠিত হয়। 'সেবার মাধ্যমে বন্ধুত্ব'-এ আন্তর্জাতিক শোগান নিয়ে এবং 'জ্ঞান অর্জন করো, বন্ধুত্ব গড়ো ও স্বাবলম্বী হও'-এ ক্লাব থিম নিয়ে ক্লাবটি বহুধরনের কার্যক্রম সম্পাদন করছে। আন্তর্জাতিক এ সংগঠনটির অভিভাবকত্বে রয়েছে রোটারি ক্লাব অব ঢাকা পল্টন। ক্লাবের চার্টার প্রেসিডেন্ট ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম এবং ২০১৪-১৫ বর্ষে ক্লাব প্রেসিডেন্ট হিসাববিজ্ঞান সম্মান প্রথম বর্ষের ছাত্র আবু সাঈদ। ২০১৪ সালে ক্লাবটির কার্যক্রম নিম্নরূপ :

জাতীয় কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন : ৮ নভেম্বর ২০১৪ ঢাকা কমার্স কলেজ কনফারেন্স হল-এ রোটার‍্যাক্ট জাতীয় (রোটার‍্যাক্ট জেলা ৩২৮১) কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু

সাইদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল। ১২টি দলে রোটার‍্যাক্টর ও ছাত্রবৃন্দ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এতে চ্যাম্পিয়ন হয় রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা ইস্ট ওয়েস্ট এবং সেমিফাইনালে অংশগ্রহণ করে ঢাকা কমার্স কলেজ।

ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন এবং চ্যাম্পিয়ন : ২৬ অক্টোবর ২০১৪ মিরপুর-১ ঈদগাহ মাঠে অত্র ক্লাব যৌথভাবে রোটার‍্যাক্ট রিজোনাল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করে। টুর্নামেন্টে অত্র ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ অত্র ক্লাব মিরপুর ভাষানটেক স্কুল প্রাঙ্গণে যৌথভাবে রোটার‍্যাক্ট রিজোনাল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আয়োজন করে।

খাবার বিতরণ : ১৫ জুলাই ২০১৪ অত্র ক্লাব মিরপুর শাহআলী মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে দরিদ্রদের মধ্যে যৌথভাবে রোটার‍্যাক্ট জোনাল ফুড ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম আয়োজন করে। প্রোগামে দরিদ্রদের মধ্যে দুধ, চিনি ও সেমাই বিতরণ করা হয়।

বিজয় র‍্যালি, মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধণা স্বাক্ষর প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা : ১৬ ডিসেম্বর ২০১৪ মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়াম থেকে ঢাকা কমার্স কলেজ পর্যন্ত বিজয় র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এতে মিরপুরের ১৩টি রোটার‍্যাক্ট ক্লাব এবং মিরপুর রোটারি ক্লাবের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে কলেজ হলরুমে আলোচনা সভা ও মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয় দিবস উপলক্ষে অত্র ক্লাব ১৩ তম বার্ষিক স্বাক্ষর প্রতিযোগিতা আয়োজন করে।

ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং অ্যান্ড হেল্‌থ চেকআপ: ইয়ং বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতা রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ ১৬ ডিসেম্বর ২০১৪ বিজয় দিবস ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং অ্যান্ড হেল্‌থ চেকআপ কর্মসূচি পালন করে। কলেজের সম্মুখে সর্বসাধারণরে জন্য এ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ।

ইফতার পার্টি : ৭ জুলাই ২০১৪ কলেজ হলরুমে ১৩ তম বার্ষিক ইফতার পার্টি আয়োজন করা হয়।

প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন : ১৮ আগস্ট ২০১৪ কলেজ হলরুমে কেককেটে ক্লাবের ১৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

নিয়মিত সভা : ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ক্লাবটি ৩৩৫টি নিয়মিত সভা (পাক্ষিক) আয়োজন করেছে।

জাতীয় কমিটির পদ লাভ : ২০১৩-১৪ বর্ষে রোটার‍্যাক্ট জাতীয় (জেলা ৩২৮১) কমিটিতে অত্র ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি রো : সুমন সরকার ডেপুটি ট্রেইনার ও প্রাক্তন সভাপতি রো: ফরহাদ হোসেন বিপু এইড টু ডিআরআর পদে দায়িত্ব পালন করে।

জাতীয় প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ : এ বছর ক্লাব সদস্যবৃন্দ রোটার‍্যাক্ট জাতীয় কনফারেন্স, অ্যাসেম্বলি, প্যাসেট্স, অভিষেক, অ্যাওয়ার্ড, পিকনিক, র‍্যালি ও রিলে প্রোগামে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া ৮ আগস্ট ২০১৪ ক্লাব সদস্যবৃন্দ হোটেল ৭১-এ অভিভাবক রোটারী ক্লাব অব ঢাকা পল্টনের ১৫তম অভিষেক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

রোটার‍্যাক্ট অ্যাওয়ার্ড লাভ : রোটার‍্যাক্ট বার্ষিক অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে অত্র ক্লাব প্রেসিডেন্ট রো: আবু সাঈদ 'ইনোভেটিভ রোটার‍্যাক্টর অ্যাওয়ার্ড' লাভ করে।

ক্রীড়া কার্যক্রম

কলেজের নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রমের পাশাপাশি নিয়মিত খেলাধুলা অনুশীলন হয়। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়াও নিয়মিত দাবা, ক্যারাম, টেবিল টেনিস ও ব্যাডমিন্টন অনুশীলন হয় কলেজের নিজস্ব বড় মাঠ না থাকায় অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের অধিকতর সুযোগ দেয়া হয়। ২০১৪ সালে ১৫ সস্য ক্রীড়া কমিটির আহবায়ক ছিলেন বাংলা বিভাগের সহযোগী জনাব হাসানুর রশীদ।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৪

কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সিটি ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জাকজমকপূর্ণ এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব ইলিয়াছ উদ্দিন মোলাহ বিকেল ৪টায় সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক মোহাম্মদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে BNCC ও ক্রীড়াবিদদের মনোজ্ঞ মার্চপাস্ট অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী ক্রীড়া পরিচালনা শেষে আকর্ষণীয় লোকনৃত্য গীতিনাট্য পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানের কলেজের অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ ক্রীড়া কমিটির আহবায় সহ সকল শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের মধ্যে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয় দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয় দ্বাদশ শ্রেণির মিলা।

বার্ষিক অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিত ২০১৪

কলেজের বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৪" ১১জন ২১ জুন ২০১৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। দাবা, ক্যারাম, টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় ছাত্র ও ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। শিক্ষক, শিক্ষিকা কর্মচারীবৃন্দ, দাবা, ক্যারাম, টেবিল-টেনিস

প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

ঢাকা শিক্ষাবোর্ড আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতা

ফুটবল

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ অংশগ্রহণ করে। ২১/০৯/২০১৪ উদ্বোধনী খেলায় ঢাকা কমার্স কলেজ নবাব হাকিবুলাহ স্কুল এন্ড কলেজকে ১-০ গোলে পরাজিত করে ২য় রাউন্ডে উঠে।

২য় রাউন্ডে ২৩/০৯/২০১৪ তারিখ ঢাকা কমার্স কলেজ নটরডেম কলেজের নিকট ০-২ গোলে পরাজিত হয়ে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয়।

ব্যাডমিন্টন

২৮/০৯/২০১৪ তারিখে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ ছাত্রদের টিম একক ও দ্বৈতে অংশগ্রহণ করে এবং কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে। ছাত্রীদের বিভাগ একক প্রতিযোগিতায় দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী মিলা প্রথম খেলায় গার্লস আইডিয়াল কলেজের নিকট ২/১ সেটে পরাজিত হয় কিন্তু দ্বাদশ শ্রেণির দ্বৈতে সরাসরি ২য় রাউন্ডে আদমজি কলেজকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে। ২৯/০৯/২০১৪ : ছাত্রদের এককে কোয়ার্টার ফাইনালে দনিয়া কলেজকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উঠে। সেমিফাইনালে আদমজী কলেজের সাথে পরাজিত হয়। দ্বৈত প্রতিযোগিতা মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী কলেজকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উঠে। সেমিফাইনালে আদমজী কলেজের সাথে পরাজিত হয়।

ছাত্রীদের দ্বৈত প্রতিযোগিতায় ঢাকা মডেল কলেজকে পরাজিত করে সেমি ফাইনালে উন্নিত হয় এদিন বিকালে ফাইনাল প্রতিযোগিতায় বাংলা কলেজকে পরাজিত হয়ে রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

এ্যাথলেটিকস

৩০/০৯/২০১৪ তারিখ এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা মোহাম্মদপুরে সরকারী শারীরিক শিক্ষা কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রদের মাঝে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র আবীর গোলক নিক্ষেপে ১ম স্থান ছাত্রীদের ইভেন্টে দ্বাদশ শ্রেণির মিলা দীর্ঘ লাফে ১ম স্থান অধিকার করে। উভয় শিক্ষার্থী বিভাগীয় পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

ক্রিকেট (পুরুষ)

ঢাকা কমার্স কলেজ ক্রিকেট টিম এ বছর ধারাবাহিক সফলতা অর্জন করে সেমি ফাইনালে উন্নীত হয়। ২১/১০/২০১৪ তারিখ ১ম খেলায় লালবাগ মডেল কলেজ ২২/১০/১৪ তারিখ ২য় খেলায় কুর্মিটোলায় স্কুল এন্ড কলেজকে পরাজিত করে ২য় রাউন্ডে উঠে।

২৫/১০/১৪ তারিখ ২য় রাউন্ডে শক্তিশালী দনিয়া কলেজকে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়। ০৩/১১/১৪ তারিখ কোয়ার্টার ফাইনালে বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ কলেজকে পরাজিত করে সেমি ফাইনালে উন্নীত হয়। ৫/১১/১৪ তারিখ সেমি ফাইনালে ইম্পিরিয়াল কলেজের সাথে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়।

জাতীয় ফেডারেশন আয়োজিত প্রতিযোগিতা

বাশ আপ (মার্শাল আর্ট)

গত ২৮/– ৩০/০৯/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ জিমনে সিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় কলেজ পর্যায়ে ছাত্রদের ইভেন্টে কলেজ পর্যায় ঢাকা কমার্স কলেজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং ছাত্রীদের পর্যায়ে ঢাকা কমার্স কলেজ রানার্স আপ হয়।

ফ্লোর প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ ফ্লোরবল এসোসিয়েশন আয়োজিত জাতীয় ফ্লোর প্রতিযোগিতা গত তারিখ....মিরপুর শহীদ সরওয়ার্দী ইন্‌ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা মহিলা বিভাগে ঢাকা কমার্স কলেজ চ্যাম্পিয়ন ও পুরুষ বিভাগে ঢাকা কমার্স কলেজ রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

ফেন্সিং

এপ্রিল মাসে মিরপুরস্থ শহীদ সহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ৪র্থ প্রেসিডেন্ট কাপ ফেন্সি টুর্নামেন্টে ঢাকা কমার্স কলেজ মহিলা টিম দলগত রানার্স আপ ও পুরুষ দল দলীয় ৩য় স্থান অধিকার করে।

এছাড়াও আন্তঃ কলেজ রাগবি প্রতিযোগিতা ও জাতীয় বেসবল প্রতিযোগিতার জন্য টিম গঠন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক (কমনওয়েল গেমস্)

ঢাকা কমার্স কলেজের মার্কেটিং ৪র্থ বর্ষের ছাত্র রিফাত এবছর যুক্তরাজ্যে গাসগোতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে সাইক্লিং বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে।

এশিয়ান গেমস্

দক্ষিণ কোরিয়ার ইন্‌চেনে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমস প্রতিযোগিতায় মহিলা দলের সদস্য হওয়ার গৌরব অর্জন করে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী তান্‌হা।

ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং সোসাইটি

'যুক্তিতেই মুক্তি-এ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে ঢাকা কামার্স ডিবেটিং সোসাইটি বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃ কলেজ

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতার প্রশিক্ষণ ও উৎসবের মাধ্যমে ২০১৪ সাল অতিবাহিত করে। জ্ঞান ভিত্তিক ও মেধাও মননশীল এ সব কর্মকাণ্ডে বিতর্ক ক্লাবের সফল পদচারণ মুখরিত করেছে ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গণ এই ক্লাবের মডারেট হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব নাঈম মোজাম্মেল।

ঢাকা কমার্স কলেজ আবৃত্তি পরিষদের কার্যক্রম :

'অন্তর মম বিকশিত কর - এই স্লোগান লালন করে গঠিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ আবৃত্তি পরিষদ। পরিষদের মডারেটর বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব রেজাউল আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক কমার্স কলেজের কৃতি ছাত্র মোঃ মেহেদী হাসান। আবৃত্তি পরিষদ প্রতি বছরের ন্যায় এবারও নতুন সদস্য সংগ্রহ করে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রশিক্ষিত হয়ে সদস্যবৃন্দ কলেজ ও কলেজের বাইরে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করেছে। আবৃত্তি পরিষদের সদস্য উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী মেহরীন সুলতানা তিন্নি ২০১৪ সালে কলেজ পর্যায়ে সকল কলেজের মাঝে প্রথম হয়ে অর্জন করে 'নরেন বিশ্বাস পদক - ২০১৪'। আবৃত্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মেহেদী হাসান একজন দক্ষ প্রশিক্ষক ও আবহ সংগীত পরিচালক হিসেবে ইতোমধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছে। বর্তমানে সে 'রেডিও স্বাধীন' ও 'এবিসি' রেডিওতে আরজে 'অনিন্দ্য' হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল অর্কেস্ট্রা টিম -এর চিফ ইন্সপেক্টর হিসেবে কর্মরত আছে।

বিভাগীয় কার্যক্রম ২০১৪

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১. পদোন্নতি : ১ জানায়ারি ২০১৪ জনাব তানবীর আহমেদ, জনাব তন্ময় সরকার ও জনাব মোঃ হযরত আলী প্রভাষক পদ হতে সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ১১ জানুয়ারি পদোন্নতি প্রাপ্ত শিক্ষকদের ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়।

২. বিভাগীয় বনভোজন : ২ এপ্রিল ২০১৪ নরসিংদী ড্রীমহলিডে পার্কে ব্যবস্থাপনা বিভাগের বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। বনভোজনে বিভাগীয় সকল শিক্ষক, ছাত্র ও ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

৩. ক্লাশ সমাপনী : (ক) সম্মান ১ম বর্ষ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সম্মান ১ম বর্ষের ক্লাশ সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।

(খ) সম্মান ৪র্থ বর্ষ: ২৬ জুন ২০১৪ সম্মান ৪র্থ বর্ষের ক্লাশ সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) মাস্টার্স শেষ বর্ষ: ১৮ মার্চ ২০১৪ মাস্টার্স শেষ বর্ষের ক্লাশ সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।

৪. পরীক্ষার ফলাফল : ২০১৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড পরীক্ষায় ২০৭৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮৯১ জন ছাত্র-ছাত্রী ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ বিষয়ে 'A+' পেয়েছে। এছাড়া অনার্স ও মাস্টার্সে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জিত হয়েছে।

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

১. পদোন্নতি : হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক জনাব ফারহানা হাসমত এ বছর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। এ উপলক্ষে বিভাগীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পদোন্নতিপ্রাপ্ত শিক্ষককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

২. নতুন শিক্ষক : কলেজের নিয়োগ বিধি অনুসারে ১১ মে ২০১৪ তারিখে হিসাববিজ্ঞান বিভাগে নতুন শিক্ষক নিয়োগ হয়।এ উপলক্ষে উক্ত তারিখে বিভাগীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নতুন শিক্ষক শিমুল চন্দ্র দেবনাথ কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

৩. পরীক্ষার ফলাফল : বরাবরের মতো এবারও আমাদের শিক্ষার্থীবৃন্দ হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার পাশাপাশি বহিঃ পরীক্ষায় চমৎকার ফলাফল অর্জন করেন।

(ক) উচ্চ মাধ্যমিক : ২০১৪ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১৯৪০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৮২ জন ছাত্র-ছাত্রী হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে A+ পায়।

(খ) অনার্স : এ বছর প্রকাশিত অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা-২০১১ এর ফলাফলে দেখা যায় ৪৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ২৬ জন ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ২ জন ১ম শ্রেণিতে ১ম হয় ও ১ জন ৬ষ্ঠ হয়। ১৯ জন ২য় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়। কোনো ৩য় শ্রেণি নেই।

(গ) মাস্টার্স : মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা-২০১০ এর ফলাফল এবছর প্রকাশিত হয়। এ পরীক্ষায় ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১৯ জন ১ম শ্রেণিতে এবং ১০ জন ২য় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়। কোনো ৩য় শ্রেণি বা ফেল নেই।

৪. কৃতি শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠান : মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা-২০১০ এর ফলাফলের পর সকল ছাত্র-ছাত্রী ০৭/২০/১৪ তারিখে বনলতা চাইনিজ অ্যান্ড পার্টি সেন্টারে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভাগীয় শিক্ষকদের পাশাপাশি অন্যান্য বিভাগের কোর্স শিক্ষকগণও অংশ নেন।

৫. ক্লাস সমাপনী : প্রতিবারের ন্যায় এ বছরও বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের ক্লাস সমাপনী উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে

আয়োজন করে। এর মধ্যে গত ১৯/০৩/১৪ তারিখে হিসাববিজ্ঞান মাস্টার্স -এর ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান সিটি মহল চাইনিজ রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় এবং ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীরা জিনজিয়ান চাইনিজ রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টারে তাদের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শিক্ষার্থীদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ফুল, উপহার ও নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৬. শিক্ষাসফর : হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অনার্স পার্ট-২ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ০৬/০৩/২০১৪ তারিখ থেকে ১১/০৩/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত শিক্ষাসফর উপলক্ষে কুয়াকাটা ঘুরে আসে। উক্ত সফরে ছাত্র-ছাত্রীদের তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্ব পালন করেন বিভাগীয় শিক্ষক জনাব মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক। এ ছাড়াও অনার্স পার্ট-৩ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ সাতছড়ি সিলেটে শিক্ষাসফরে যায়, উক্ত সফরে ছাত্র-ছাত্রীদের তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্ব পালন করেন বিভাগীয় শিক্ষক জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ ও জনাব মোঃ মঈনউদ্দীন। এ ছাড়াও অনার্স পার্ট-৪ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ শেরপুর শিক্ষাসফরে যায়, উক্ত সফরে ছাত্র-ছাত্রীদের তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্ব পালন করেন বিভাগীয় শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সালাম ও জনাব মোঃ মাহমুদ হাসান।

১. পদোন্নতি : ১ জানুয়ারি ২০১৪ জনাব তানবীর আহমেদ, জনাব তন্ময় সরকার ও জনাব মোঃ হযরত আলী প্রভাষক পদ হতে সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ১১ জানুয়ারি পদোন্নতি প্রাপ্ত শিক্ষকদের ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়।

২. বিভাগীয় বনভোজন : ২ এপ্রিল ২০১৪ নরসিংদী ড্রিমহলিডে পার্কে ব্যবস্থাপনা বিভাগের বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। বনভোজনে বিভাগীয় সকল শিক্ষক, ছাত্র ও ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

৩. ক্লাস সমাপনী :

(ক) সম্মান ১ম বর্ষ : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সম্মান ১ম বর্ষের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।

(খ) সম্মান ৪র্থ বর্ষ : ২৬ জুন ২০১৪ সম্মান ৪র্থ বর্ষের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) মাস্টার্স শেষ বর্ষ: ১৮ মার্চ ২০১৪ মাস্টার্স শেষ বর্ষের ক্লাশ সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।

৪. পরীক্ষার ফলাফল : ২০১৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড পরীক্ষায় ২১৭৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮৯১ জন ছাত্র-ছাত্রী ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ বিষয়ে 'A+' পেয়েছে। এ ছাড়া অনার্স ও মাস্টার্সে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত হয়েছে।

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

১. দায়িত্ব গ্রহণ : ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি জনাব মোহাম্মদ আক্তার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ২০১৪-২০১৫ মেয়াদের জন্য জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, সহযোগী অধ্যাপক-এর নিকট থেকে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

২. শিক্ষাসফর : অনার্স পার্ট-৪ এর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গত ১১/০২/২০১৪ থেকে ১৬/০২/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বিভাগীয় শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, সহকারী অধ্যাপক এবং জনাব মোঃ হাসান আলী, প্রভাষক-এর নেতৃত্বে ৫ দিন ব্যাপী "ঢাকা-কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন-ঢাকা" শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়।

*জনাব মোহাম্মদ আক্তার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান এবং জনাব মোঃ হাসান আলী, প্রভাষক-এর নেতৃত্বে অনার্স পার্ট-২ এর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গত ০৯/০৩/২০১৪ থেকে ১৩/০৩/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ৪ দিন ব্যাপী "ঢাকা-কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন-ঢাকা" শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়।

৩. ফলাফল : ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের অনার্স পার্ট-১ (সেশন ২০১১-২০১২), অনার্স পার্ট-২ (সেশন ২০১০-২০১১), অনার্স পার্ট-৪ (সেশন ২০০৭-২০০৮) এবং মাস্টার্স (সেশন ২০০৯-২০১০) - এর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। অনার্স পার্ট-৪ (সেশন ২০০৭-২০০৮) -এর মোট ৫৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৪৮ জন ছাত্র-ছাত্রী ১ম শেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। বাকি ৭ জন ২য় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয় এবং কোনো ৩য় শ্রেণি পায় নি। ঢাকা কমার্স কলেজের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ মাস্টার্স শ্রেণি থেকে নাশিতা তানজীন সারা বাংলাদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগে ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অর্জন করে।

৪. প্রশিক্ষণ :

(ক) গত ১৮/০৬/২০১৪ তারিখ থেকে ২৯/০৬/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আক্তার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়' কর্তৃক আয়োজিত এবং কুমিল্লা বোর্ডে অনুষ্ঠিত "সৃজনশীল পদ্ধতির মডিউল তৈরি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

(খ) গত ২৫/১০/২০১৪ তারিখ থেকে ৩০/১০/২০১৪ তারিখ এবং ১৫/১১/২০১৪ থেকে ২০/১১/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আক্তার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক 'ঢাকা বোর্ড' কর্তৃক আয়োজিত এবং 'টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকায়' অনুষ্ঠিত "সৃজনশীল পদ্ধতি" বিষয়ক মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করেছেন।

(গ) ২০১৪ সালের ০৯ এবং ১০ নভেম্বর, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ আক্তার হোসেন এর তত্ত্বাবধানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা বিষয়ের "সৃজনশীল পদ্ধতির" উপর দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগের সকল শিক্ষকগণ উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

৫. ভাষা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন:

২০১৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আক্তার হোসেন-এর নেতৃত্বে বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ ঢাকা কমার্স কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থিত মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

৬. ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান:

গত ২৭/০২/২০১৪ তারিখে বিবিএ (সম্মান) পার্ট-১ এবং গত ০৪/০৪/২০১৪ তারিখে বিবিএ (সম্মান) পার্ট-৩ এর ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ আক্তার হোসেন, প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল এবং বিভাগীয় শিক্ষকমণ্ডলী ও অন্যান্য কোর্স শিক্ষকগণ। ছাত্র-ছাত্রীরা ফুল বিনিময়, কেক কাটা, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে।

মার্কেটিং বিভাগ

১. ২য় বর্ষের ক্লাস সমাপনী : ২০ জানুয়ারি সম্মান পার্ট-২ এর ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা ফুল বিনিময়, কেক কাটা, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে।

২. ১ম বর্ষের ক্লাস সমাপনী : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সম্মান (বিবিএ) পার্ট-১ এর ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা ফুল বিনিময়, কেক কাটা, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে।

৩. ৪র্থ বর্ষের শিক্ষা সফর : ২৪-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সম্মান পার্ট-৪ এর ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা সফর উপলক্ষে কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন ও রাঙ্গামাটি ভ্রমণ করে। উক্ত সফরে ছাত্র-ছাত্রীদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব শনজিত সাহা ও বিভাগীয় শিক্ষক জনাব আরিফুর রহমান।

৪. ৩য় বর্ষের শিক্ষা সফর : (১১/০৩/২০১৪) অনার্স পার্ট-৩ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা ১১/০৩/২০১৪ শিক্ষা সফর উপলক্ষে গাজীপুরেরর সাফারি পার্কে ভ্রমণ করে। উক্ত সফরে নেতৃত্ব দেন সহযোগী অধ্যাপক জনাব জোবাইদা নাসরীন, জনাব মঞ্জরুল আলম ও বিভাগীয় শিক্ষক জনাব ফারহানা আক্তার সাদিয়া।

৫. ২য় বর্ষের শিক্ষা সফর : (১৩/০৩/২০১৪) অনার্স পার্ট-২ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা কুমিল্লা বোর্ডে শিক্ষা সফর করে। উক্ত সফরে ছাত্র-ছাত্রীদের নেতৃত্ব দেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব শনজিত সাহা ও সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম।

৬. মাস্টার্স শেষ পর্বের সমাপনী অনুষ্ঠান : ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে গত ১৮/০৩/২০১৪ তারিখ 'হ্যাপি ডিলস্' এ মাস্টার্স শেষ পর্বের সমাপনী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভাগীয় শিক্ষকগণ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৭. ৩য় বর্ষের ক্লাস সমাপনী : গত ৩ এপ্রিল ২০১৪ সম্মান (বিবিএ) পার্ট-৩ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা ফুল বিনিময়, কেক কাটা, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করে।

৮. ৪র্থ বর্ষের ক্লাস সমাপনী : ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে গত ২৬/০৬/২০১৪ তারিখে 'হ্যাপি ডিলস্' এ বিবিএ ৪র্থ বর্ষের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভাগীয় চেয়ারম্যানসহ সকল শিক্ষক অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৯. মার্কেটিং ৩য় বর্ষের ক্যান্সার আক্রান্ত শিক্ষার্থী মোঃ সাখাওয়াত হোসেন রেজভী (রোল এমকেটি ৯২২) এর সাহায্যার্থে বিভাগের উদ্যোগে সংগৃহীত ২, ১৪, ০০০ টাকা

তার মায়ের হাতে প্রদান করা হয়।

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (বিবিএ)

পরিচালক নিয়োগ: ১২ এপ্রিল ২০১৪ তারিখের ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির ২০১ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদকে বিবিএ প্রোগ্রামের পরিচালক পদে ০২ (দুই) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়। এ নিয়োগ ১৩/০৪/২০১৪ থেকে ১২/০৪/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর হবে।

পরিচালককে অভিনন্দন জ্ঞাপন : বিবিএ প্রোগ্রামের পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করায় ব্যবস্থাপনা বিভাগের পক্ষ থেকে ২৩ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদকে অভিনন্দন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

শিক্ষকদের অভিনন্দন জ্ঞাপন : বিবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষকদের কলেজের পক্ষ হতে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয় ০৩ জন ২০১৪ তারিখে অভিনন্দন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

অনলাইনে আবেদন শুরু : ১৫ মার্চ ২০১৪ তারিখে বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল প্রোগ্রামের ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষে ভর্তিচ্ছুকদের অনলাইনে আবেদন কার্যক্রম কলেজের ভর্তি তথ্য কেন্দ্রে আরম্ভ হয়।

ভর্তি কার্যক্রম শুরু : ২০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল প্রোগ্রামের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষে যোগ্য প্রার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়।

শ্রেণি কার্যক্রম শুরু : ০৪ জুন ২০১৪ তারিখে বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল প্রোগ্রামের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ ১ম সেমিস্টারের শ্রেণিকার্যক্রম শুরু হয়।

বিভাগ পরিদর্শন: বিবিএ প্রোগ্রামের পরিচালকের ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগরে অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান বর্তমানে অনারারি প্রফেসর ড/ মোঃ মইনুল ইসলাম ১২ আগস্ট ২০১৪ তারিখে কলেজের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (বিবিএ) পরিদর্শন করেন। তিনি বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম অবলোকন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন।

প্রকাশনা: বিবিএ প্রোগ্রামের পরিচালক ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ-এর একটি আর্টিকেল 'Journal of the Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh - এ Vol. XLII, No. 2, March-April 2014 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১. ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন "অ্যালামনি এ্যাসোসিয়েশন" কর্তৃক আয়োজিত ইফতার মাহফিলে উপস্থিত বিভাগীয় বর্তমান চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক সাদিক মোহাম্মদ সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক মঈনউদ্দিন আহমেদ ও সংগঠনের সভাপতি আলিম আল সাইদ হিমেল।

২. ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'এ্যালামনি এ্যাসোসিয়েশন' কর্তৃক আয়োজিত ইফতার মাহফিলে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সাথে বিভাগীয় বর্তমান চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক সাদিক মোহাম্মদ সেলিম এবং সহযোগী অধ্যাপক মঈনউদ্দিন আহমেদ।

৩. ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'অ্যালামনি এ্যাসোসিয়েশন' কতৃক আয়োজিত রক্তের গ্রুপ নির্ণয় কর্মসূচিতে উপস্থিত কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ মোজাহার জামিল এবং ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক সাদিক মোহাম্মদ সেলিম।

৪. শিক্ষা সফরে গাজীপুরের সাফারি পার্কে উপস্থিত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ।

৫. শিক্ষাসফরে উপস্থিত অতিথিদের সাথে বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ।

৬. শিক্ষাসফরে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকবৃন্দ।

ইংরেজি বিভাগ

কলেজের প্রচলিত প্রথা ও ঐতিহ্য অনুযায়ী ২০১৪ সালেও ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ, তার বাৎসরিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

২০১৩ সালের শেষ দিকে ও ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: ৫ নভেম্বর ২০১৩ সালে ইংরেজি বিভাগের ৪ জন নতুন প্রভাষক- জনাব তারেকুর রহমান, জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম, জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন ও জাকারিয়া ফয়সাল যোগদান করেন।

২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম স্যারের যোগদান, আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণ ও সহযোগী অধ্যাপক জনাম মোঃ মঈনউদ্দিন আহমেদ স্যারের চেয়ারম্যান পদ থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৪ সালের ১ আগস্ট থেকে চেয়ারম্যান হিসেবে সহযোগী অধ্যাপক জনাব সাদিক মোঃ সেলিম দায়িত্ব পালন করছেন। চেয়ারম্যান পদ থেকে প্রফেসর জনাম মোঃ আব্দুল কাইয়ুম স্যারের বিদায় অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ১ আগস্ট ২০১৪ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থী উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন

করছেন।

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ বিভাগের সকল শিক্ষকবৃন্দ ও ইংরেজি ভার্সনের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সফরে গাজীপুরের সাফারি পার্কে গমন অন্যতম আকর্ষণীয় ঘটনা যা সকলের মধ্যে আনন্দের উদ্বেল সৃষ্টি করে।

২০১৪ সালের ১২ অক্টোবর বিভাগে নতুন প্রভাষক-অনুপম বিশ্বাসের যোগদান অনুষ্ঠিত হয়।

ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন "অ্যালামনি এ্যাসোসিয়েশন" কর্তৃক গত ১৮ জুলাই শুক্রবার এক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত ইফতারে বর্তমান বিভাগীয় চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক সাদিক মোহাম্মদ সেলিম এবং সহযোগী অধ্যাপক মঈনউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

অর্থনীতি বিভাগ

১. ফলাফল শিক্ষাবর্ষ ২০০৭-০৮ এর সম্মান শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষায় দুই জন ছাত্র-ছাত্রী প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং বাকি ০৯ জন দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

২. পদোন্নতি বিভাগীয় শিক্ষক শবনম নাহিদ স্বাতী ০৯/০৫/২০১৪ তারিখে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। পদোন্নতি উপলক্ষে বিভাগের পক্ষ থেকে শবনম নাহিদ স্বাতীকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

৩. ২০১৪ সালে জনাব হাফিজা শারমীন ও জনাব সুরাইয়া খাতুন M.B.A ডিগ্রি লাভ করেন।

পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ

১. ২১ ফেব্রুয়ারি কলেজের শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন: পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান ড. এম মিরাজ আলী আকন্দ-এর নেতৃত্বে প্রভাত ফেরি শেষে বিভাগের সকল শিক্ষক শহীদ মিনারে পুষ্প অর্পণের মাধ্যমে সকল ভাষা শহীদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

২. চেয়ারম্যান পরিবর্তন: ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে বিদায়ী চেয়ারম্যান ড. এম মিরাজ আলী আকন্দকে বিভাগের সকল শিক্ষক বিদায় সম্বর্ধনা প্রদান করেন। এ ছাড়া বিদায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক আয়োজিত মধ্যাহ্ন ভোজে সকল শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে বিভাগের নতুন চেয়ারম্যান মোঃ আবদুর রহমানকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করায় সকল শিক্ষক সম্বর্ধনা প্রদান করেন।

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা

অফিস পরিদর্শন: প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগের অফিস পরিদর্শন কাজ সফলভাবে সমাপ্ত করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৪-এর পরীক্ষার্থীদের সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তত্ত্বীয় জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য অফিস ব্যবস্থাপনা-২য় পত্রের (অফিস পরিদর্শন) ১৮৯২ জন ছাত্র-ছাত্রীদের ৬টি গ্রুপে বিভক্ত করে।

১. বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, ২. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ট্রেনিং সেন্টার, ৩. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ট্রেনিং সেন্টার এবং ৪. বি.এস.বি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক, গুলশান, ঢাকাতে অফিস পরিদর্শনের কাজ সফলভাবে সম্পাদন করা হয়। উল্লেখ্য এ জন্য শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষায় ২০ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে।

পরীক্ষার ফলাফল : ২০১৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মোট ১৮৯২ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে ১৬৯৭ জন GPA (A+) অর্জন করে যা মোট ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা ৮৯.৬৯%।

পদোন্নতি : বিভাগীয় জ্যেষ্ঠ শিক্ষক জনাব মোঃ আবু তালেব -এর সহযোগী অধ্যাপক পদ থেকে প্রফেসর পদে পদোন্নতি হয় এবং ২১/৭/১৪ তারিখ থেকে পরীক্ষা কমিটির আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন।

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ

শিক্ষাবর্ষে ঢাকা কমার্স কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে পূর্বের অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল মোট ২০০ নম্বরের বিষয়ের পরিবর্তে পৃথকভাবে ভূগোল ১ম ও ২য় পত্রে মোট ২০০ নম্বরের পাঠক্রমে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে ভূগোল ১ম ও ২য় পত্রের মোট নম্বর বণ্টন হচ্ছে তত্ত্বীয় ৭৫ x ২ = ১৫০ এবং ব্যবহারিক ২৫ x ২ = ৫০

বিভাগীয় চেয়ারম্যান: ১২ জুন ২০১৪ থেকে জনাব মাওসুফা ফেরদৌসী বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শিক্ষার্থী উপদেষ্টা: ০১ আগস্ট ২০১৪ থেকে অধ্যাপক বাহার উল্যা ভূঁইয়া উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থী উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রবন্ধ
অনুবাদ
ভ্রমণ কাহিনী

নাম	লেখক	পৃষ্ঠা
‘নিয়মানুবর্তিতা’	মোঃ ওয়ালী উল্যাহ	৫৬
শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক	মো. সাইদুর রহমান মিঞা	৬০
পারস্পরিক সম্পর্ক	মোঃ ইউনুছ হাওলাদার	৬৪
শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা	সাদিক মোঃ সেলিম	৬৭
পরীক্ষা পদ্ধতি	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ	৭১
ব্যক্তিত্ব, নৈতিকতা ও বিনোদন	মোহাম্মদ আক্তার হোসেন	৭৪
অপরাহ্ণের সৃষ্টি	মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন	৭৯
বাবা, আলবেয়ার কামু	মনসুর আলম	৮২
একটি সিগারেটের আত্মকাহিনী	জান্নাতুল ফেরদাউস এশা	৮৬
বিশ্বাস ঘাতকদের করুণ পরিণতি	মাহামুদুল হাসান নাবিল	৮৬
ঢাকা কমার্স কলেজ আমার প্রথম দিন	নূরজাহান ইসলাম সূচি	৮৭
কলেজের প্রথম দিন	আল-আমিন আহমেদ সোহাগ	৮৮
৭ মার্চের ভাষণ	মিনহাজুল করিম বাপ্পি	৯০
মেলা	আকিল মেহের লিয়ান	৯৪
মাতৃ স্নেহ	আকিল মেহের লিয়ান	৯৪
অপেক্ষা	ফাহাত বিন আমিন সিক্ত	৯৫
বোরকা পড়া মেয়েটি	ফিহির হোসাইন	৯৫
এই তো আমি	ফরহাদ হোসেন	৯৭
সেই দশ টাকা আর দেয়া হলো না, বেলা ১২:৩০	মোঃ গোলাম রাব্বানী	৯৯
আমার অপ্রকাশিত বাবা		১০১
কলেজ মানিয়ে নেওয়ার ম্যানুয়েল	কার্নিজ পারভীন অর্থি	১০১
এখন অনেক রাত		১০১
পদ্ম পাতার জল	জাহিদ হাসান শুভ	১০২
মুমূর্ষ রূপকথা	মাহামুদুল হাসান	১০৩
পিছুটান	মাহতাব উদ্দিন আহমেদ (মাহিন)	১০৪
সর্বশেষ পৃষ্ঠা	মাহমুদুল হাসান	১০৫
মহাপুরুষ প্রিয়	মোঃ জায়েদ হোসেন নূর	১০৬
নাবিল এবং অদ্ভুত বল	রিসালাত জাওয়াদ	১০৮
শিক্ষণীয় গল্প ও কবিতা	রিতা ইসলাম	১১১
অর্জন	সাবিকা তাসনীম	১১১
দেড়মণ ভূত	আফরা ফারহানা	১১২
M.T.E.S পাস	আবির হাসান	১১৩
স্বপ্ন আমার নীল আকাশ ছোঁয়া	মোহসিনা চৌধুরী যুথী	১১৪
গ্রাম্য ও শহুরে সমাজের স্বরূপ	পার্থ মজুমদার	১১৪
জীবনের স্রোতে	আশরাফ মাসুদ দিব্য	১১৫
নবজন্ম	নাহিয়ান সিফাত	১১৫
	সাইফুল আলম	১১৭
জীবন	সুদীপ্ত চক্রবর্ত্তী	১১৮
ক্ষমতা	তানজিন ফরহাদ জেনি	১১৮
রহস্য উদ্ঘাটন	মোঃ তাসদীদুল ইসলাম রোকন	১১৯
প্রশ্ন ফাঁস	জাহিদ হাসান শুভ	১২১
	আশরাফুল আলম	১২২
আমাদের পড়াশোনার অবস্থা	রিতা ইসলাম	১২৩
LIVING AN AUTHOR	সাবিদ কামাল	১২৩
A Glass of Water	Toufiq Mahbub (Borshon)	১২৪
মিশন তেঁতুলিয়া	আশফাক মাসুদ দিব্য	১২৫
তিস্তা ব্যারেজ ভ্রমণ	মোঃ রাঈসুল হাবীব	১২৫
বান্দরবানের সেই ভ্রমণ	হাছিবুর রহমান (সুদিন)	১২৬
চিটাগাং, কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন ভ্রমণ	লিপি আক্তার	১২৬
ভ্রমণ	রাইমা চাকমা	১২৭
সদরঘাট টু মামার বাড়ি	বিল্লাল হোসেন	১২৭
ভ্রমণের মজা	মোঃ সোহানুর রহমান সোহান	১২৮

'নিয়মানুবর্তিতা': প্রেক্ষতি, ঢাকা কমার্স কলেজ

মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

নিয়মানুবর্তিতা মানবজীবনে অতি প্রয়োজনীয় একটি শিক্ষা। এছাড়া সমাজ চলতে পারে না। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ও একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজে যেমন মানুষকে সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন করতে হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তেমনি সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের সুশৃঙ্খল নিয়ম অনুসরণ করে চলতে হয়। নিয়মানুবর্তিতার উপর সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণ নির্ভর করে। মানব সমাজের উন্নতি ,অগ্রগতি ও সভ্যতার বিকাশের মূলে রয়েছে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়মিত কর্মপ্রচেষ্টা। সুশৃঙ্খল-নিয়মানুবর্তিতার সিঁড়ি বেয়েই মানুষ সভ্যতার উঁচু চূড়ায় উঠতে পেরেছে। ব্যক্তির সামাজিক বিকাশের জন্য যেমন সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা অনুসারে চলতে হয় তেমনি শিক্ষার্থীদের জীবন বিকাশের জন্যও সময়ের চাহিদা অনুসারে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে N.L. Bossing বলেন, "বিদ্যালয়ে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশের উপযোগী মনোভাব ও অভ্যাস গঠন করা এবং বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সাধন করা।"

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য এ পর্যন্ত একক কোনো নীতিমালা/নিয়মাবলী তথা নির্দেশনা সরকারের তরফ থেকে নেই। সরকার সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নীতিমালা জারি করেছেন, যার আলোকে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারটি যুক্তরাজ্যের শাসনতন্ত্রের সাথে তুলনীয়। অত বড় একটি দেশ অথচ তার শাসনতন্ত্র নেই-কথাটা শুনে চমকে উঠতে হয়। আসলে কথাটি ঠিক নয়-যুক্ত রাজ্যের শাসনতন্ত্র আছে, কিন্তু সেটা 'অলিখিত' অর্থাৎ অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রের মতো এক সময়ে প্রণয়ন করা হয়নি। প্রয়োজনের তাগিদে এবং সময়ের আলোকে একটি একটি আইন জারি করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আইনের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল যুক্তরাজ্যের জনগণ সে সব আইন মিলিয়েই তৈরী করেছে তাদের শাসনতন্ত্র। অনুরুপভাবে ঢাকা কমার্স কলেজও প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে কোনো নীতিমালা একত্রে প্রণয়ন করে কার্যক্রম শুরু করেনি। বরঞ্চ আরম্ভ করে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৌশল ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এ সকল নির্দেশনা আন্তরিকতার সাথে পালন করার কারণে তথা সকলের সুহৃদ নিয়মানুবর্তিতার ফলে অত্যন্ত অল্প সময়ে কলেজ বর্তমান অবয়বে দাঁড়িয়েছে।

নিয়মানুবর্তিতা অনুশীলনের কেন্দ্রবিন্দু শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শ্রেণীকক্ষ। ঢাকা কমার্স কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা কতকগুলো ইউনিট বা স্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। শ্রেণীকক্ষের নিয়মানুবর্তিতা পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালনের জন্য সম্পর্কযুক্ত ইউনিটগুলোকে চিহ্নত করে নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হল:

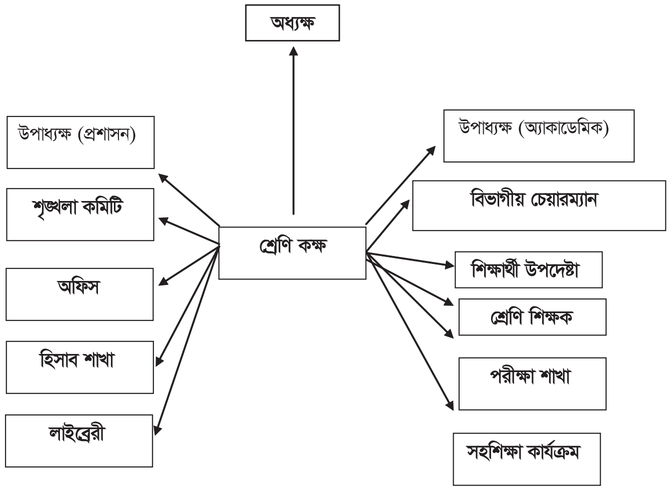

নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন স্তর বা ইউনিটে করণীয় সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিয়মনীতি প্রণয়ন ও তা শিক্ষার্থীদের অবহিত করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা যেন নিয়মগুলো পালন করে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। পাশাপাশি প্রত্যেক স্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারিকেও নিয়মের মধ্যে চলতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ইউনিটের ভূমিকা আলোচনা করা হলো:

শ্রেণি শিক্ষক : শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করেন। শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বযুগে শিক্ষকই হচ্ছেন নেতা বা পরিচালক। তাই প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষককে আদর্শবান, কর্তব্যপরায়ন, সহৃদয়বান, সহানুভূতিশীল এবং বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাবের

অধিকারী হতে হবে।

পরিচালক হিসাবে শিক্ষকের করণীয় :

* রুটিন অনুযায়ী শ্রেণীকক্ষে হাজির হওয়া ।

* নির্ধারিত সময়ে ক্লাসে যাওয়া, যথাযথভাবে হাজিরা ডাকা, পাঠদান, পাঠ আদায়, শিক্ষার্থীদেরকে বাড়ির কাজ দেওয়া ও কাজ আদায় করা ইত্যাদি।

বর্জনীয় :

* শ্রেণীকক্ষে ক্লাস চলাকালীন সময়ে ফোন Receive এবং Call করা।

* শিক্ষা নৈতিকতায় শারীরিক শাস্তি গ্রহণযোগ্য নয়। তাই শারীরিক শাস্তি বর্জনীয়।

* মৌখিক শাস্তি প্রদানের সময় শব্দ নির্বাচনে সর্তক থাকতে হবে।

বিভাগীয় প্রশাসন :

প্রশাসনিক কার্যক্রমে সকল শিক্ষককে দক্ষ করা এবং এর জটিলতা সকলকে বুঝানোর জন্য দুই বছর পর পর বিভাগীয় চেয়ারম্যান পরিবর্তনের বিধান ঢাকা কমার্স কলেজে বিদ্যমান। দুই বছর অন্তর বিভাগীয় চেয়ারম্যান পরিবর্তন কলেজ পর্যায়ে বাংলাদেশে ঢাকা কমার্স কলেজেই প্রথম।

বিভাগ থেকে যে সকল কার্যাবলী করা আবশ্যক :

* পাঠ্যসূচি যথাযথ বিন্যাস।

* নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পাঠ পরিকল্পনার সময় বন্টন।

* বিভাগীয় রুটিন প্রণয়ন ।

* বিভাগের শ্রেণি কার্যক্রম মনিটর করা, প্রশ্ন প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, নিরীক্ষণ ইত্যাদি।

* বিভাগীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহকর্মীদের সাথে বিশেষ করে অভিজ্ঞদের সাথে শেয়ার করা।

* ছুটি আবেদনকারী শিক্ষকের শ্রেণি কার্যক্রম পুনঃবন্টন করা।

* নতুন শিক্ষককে শ্রেণিতে পরিচয় ও কলেজের কার্যক্রমের ঐতিহ্য বা রীতি যথাযথভাবে অবহিত করা এবং অনুপ্রাণীত করা।

* বিভাগীয় শিক্ষকদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন।

* আন্তঃবিভাগীয় সম্পর্ক জোরদার করার জন্য ক্লাস গ্যাপ সময়ে সকলেই বিভাগে অবস্থান না করে অন্য বিভাগের শিক্ষকের সাথে দেখা করা বা যোগাযোগ করা।

* সকল শিক্ষককে বেলা ২:০০ টা পর্যন্ত বিভাগে অবস্থান করানো।

* আরও অনেক অচিহ্নিত কার্যক্রম রয়েছে যা আমরা প্রতিনিয়তই করে চলেছি। বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত এসকল কার্যক্রমে যথাযথভাবে সহযোগিতার মাধ্যমেই কেবল বিভাগের সকল শিক্ষকের মধ্যে ভাল সম্পর্ক তৈরী করা সম্ভব।

শিক্ষার্থী উপদেষ্টা :

কলেজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের বিবিধ সমস্যা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও সমাধানের লক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজে শিক্ষার্থী উপদেষ্টা পদ রয়েছে। শিক্ষার্থী উপদেষ্টাদের কতিপয় কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

* শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির কারণ জানা এবং প্রতিবিধান করা।

* শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

* শ্রেণিকক্ষে ক্লাস কার্যক্রম মনিটর করা।

* ক্লাস ক্যাপ্টেন নির্বাচন করা।

* কোন ধরনের অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে কিংবা বিভাগকে কিংবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো এবং অসামঞ্জস্য দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ।

* অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ এবং শিক্ষার্থী সম্পর্কে অবহিতকরণ।

* আওতাধীন সেকশনগুলোর ফলাফল বিশ্লেষণ এবং ফলাফল উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

* শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্কিত বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রম অফিসের সহায়তায় সম্পাদন করা।

* কলেজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা তথা শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা।

* অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

শিক্ষার্থী উপদেষ্টাগণ এছাড়াও আরো অনেক ধরনের কার্যক্রম করে থাকেন যা এ স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব না।

অফিসের ভূমিকা (প্রশাসন ও হিসাব শাখা) : প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষায় অফিসের কাজকর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অফিসের কোনো কোনো কাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ , কিভাবে কাজ সম্পাদন করতে হয়, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ, রেজিষ্ট্রার, হিসাব-নিকাশ রক্ষণনাবেক্ষণের প্রয়োজন, আয়-ব্যয়ের হিসাব, বাজেট প্রণয়ন, ছাত্র বেতনের হিসাবপত্র, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের হিসাব, অন্যান্য খরচাদির হিসাব সংরক্ষণ সঠিক সময়ে সম্পন্ন না হলে প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। তাই উল্লেখিত কার্যাবলী নিয়মানুবর্তিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধান : অধ্যক্ষ কলেজের প্রধান ব্যক্তি। কলেজের সুনাম, উন্নতি, অবনতি তাঁর উপর নির্ভর করে। তিনি শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক,কর্মচারি, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ সবার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। তাই প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষায় অধ্যক্ষের ভূমিকা অপরিসীম।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী বা কর্মচারীরা যদি বুঝতে পারে যে অধ্যক্ষের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোনো কাজ করা যাবে না, তা হলে তারা নিয়ম বিরুদ্ধ কোনো কাজ করতে সাহস পাবে না। অধ্যক্ষ নিজেই একজন শিক্ষক। তাই কলেজের শিক্ষক, কর্মচারীদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতাকে কাজে লাগিয়ে কলেজকে সাফল্যের শিখরে উন্নিত করতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক, কর্মচারীসহ সকলেই অধ্যক্ষকে সহযোগিতা করতে হবে, অন্যথায় অধ্যক্ষের একার পক্ষে কলেজের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা ও উন্নয়ন করা সম্ভব না।

শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম :

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা না থাকলে শিক্ষার্থীরা তাদের বিভিন্নমূখী চাহিদার পরিতৃপ্তি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। তখন তারা অবাঞ্চিত পন্থা অবলম্বন করে যা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সম্পন্ন হওয়ার বিশেষ কর্মসূচি। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সকল বিভাগের শিক্ষকদেরকে নিয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়। এ সকল কমিটির মাধ্যমে আন্তঃবিভাগীয় সম্পর্ক এবং ব্যক্তিক সম্পর্ক তৈরী হয়। পারস্পারিক মতামত বিনিময় হয়। প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক তৈরি এবং পরিশীলিত আচরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সহায়ক শক্তি : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অফিস, হিসাবশাখা, লাইব্রেরি, প্রকৌশল শাখা ইত্যাদি সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রশাসনিক ইউনিটগুলোর আওতাধীন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে ইউনিটের কার্যক্রম সম্পাদন করেন। এর মাধ্যমে ইউনিটের আওতাধীন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। আবার সকল ইউনিট সকল ইউনিটকে সহযোগিতার মাধ্যমে কলেজের সকল কার্যক্রম সম্পাদন করে। এভাবে কলেজের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সাথে প্রশাসনের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ঢাকা কমার্স কলেজে এ সম্পর্ক ইনফরমাল রূপে গড়ে উঠেছে। এ ইনফরমাল সম্পর্কের কারণেই কলেজ এত দ্রুত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, ইনফরমাল সম্পর্কের কারণে ব্যক্তির মানস কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। অর্থাৎ নিম্নবর্ণিত প্রশ্নসমূহ কখনোই দেখা দেয় নি-

(i) এ কাজ কি আমার?

(ii) উনি কি আমাকে এ কাজ করতে বলতে পারেন?

(iii) উনি কি আমাকে এভাবে বলতে পারেন? ইত্যাদি।

কলেজের গন্ডি ছিল ক্ষুদ্র। সকলে ছিল আন্তরিক। সকলের লক্ষ্য ছিল এক। কলেজ করতে হবে। কলেজকে দাঁড় করাতে হবে। ব্যক্তির লাভ-লোকসান এখানে ছিল গৌন। এখন কলেজের সকল দিক দিয়ে কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যক্তির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি এখন আর গৌন নয়। ব্যক্তির মানস এখন গুরুত্ব পায়। তাই ইনফরমাল সম্পর্কের মধ্যে বর্তমানে অনেক ফরমাল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, পাচ্ছে এবং পাবে। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে এ সম্পর্কগুলো পরিবর্তিত হবে। আমাদের সকলের সচেতন থাকতে হবে যেন এ পরিবর্তনের ধারা সর্বদাই ধনাত্মক হয়। ইনফরমাল সম্পর্ক থাকার কারণে বলা হয়ে থাকে সিনিয়র জুনিয়র বলে কিছু নেই। এর অর্থ কি এই যে,

* বয়ঃ জ্যেষ্ঠকে আমি সম্মান করবো না?
* ছোটকে আমি স্নেহ করবো না?
* প্রথম দিকে সকল শিক্ষকই একজন আরেক জনকে ভাই/আপা বলে সম্বোধন করতেন। আজ থেকে দশ বছর পর যে আসবে সেও কি এই ভাবে সম্বোধন করবে?

ফলে ইনফরমাল সম্পর্কের পাশাপাশি ফরমাল সম্পর্কেরও গুরুত্ব দিয়ে চর্চা করার সময় এসেছে। তাই ভাল ও যথার্থ সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন- যার সাথে কাজ করছি বা কথা বলছি তাঁর বয়স, অভিজ্ঞতা, কলেজে তাঁর আগমন, কলেজে তাঁর অবদান ইত্যাদি।

কলেজের চেইন অব কমান্ড রক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। তাই কাজ করার সময় এ বিষয় মাথায় থাকা আবশ্যক। আমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি। কিন্তু কলেজ অভ্যন্তরে এ বন্ধনকে গুরুত্ব দেয়া যাবে না। অফিসিয়াল সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিতে হবে। সামাজিকভাবে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে বাসায় যে আচরণ গ্রহণযোগ্য তা অফিসে অবশ্যই বর্জনীয়। আন্তরিকতা থাকার কারণে কলেজ ক্যাম্পাসের বাহিরে যে সম্বোধন আদরনীয় তাই কলেজ ক্যাম্পাসে বর্জনীয়। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো প্রশাসনিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্থ করে। আশাকরি আপনারা আরো বিষয়কে চিহ্নিত করবেন।

নির্দেশনা ও দায়িত্ব পালনের বহিঃপ্রকাশই আচরণ, যথার্থ আচরণ ব্যতিত গ্রহণযোগ্য দায়িত্ব পালন কিংবা নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ সম্ভব নয়। নিম্নে কতিপয় অগ্রহণযোগ্য আচরণ চিহ্নিত করা হলো-

* শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীকে শারীরিকভাবে বেত্রাঘাত করা কিংবা রক্তাক্ত করা কিংবা নিজের হাত দ্বারা চড়-থাপ্পড় কিংবা নিজের মাথা দ্বারা শিক্ষার্থীদের মাথায় আঘাত করা।।
* অগ্রহণযোগ্য শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে মানসিক শাস্তি প্রদান।

* শ্রেণীকরে ডায়াসের উপর অর্ধশায়িত হয়ে পাঠদান।
* কান্তিজনিত কারণে ক্লাসের ডায়াসের উপর বসে কিংবা চেয়ারে বসে পাঠদান।
* পাশের শ্রেণীতে ডিস্টার্ব হতে পারে এমন কাজ করা যেমন- শিক্ষক নিজে কিংবা শিক্ষার্থীদেরকে গান গাইতে দেয়া।
* শিক্ষার্থীদের বডি সার্চ করার ক্ষেত্রে ছাত্রীদের বডি ছাত্রদের দ্বারা সার্চ করানো অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ।
* শ্রেণিকক্ষে মোবাইলের ব্যবহার।
* পরীক্ষার হলে ডেস্কে অর্ধবসা, দরজার সামনে বেশিরভাগ সময় অবস্থান করা, পরীক্ষায় ডিউটিরত অবস্থায় অন্য শিক্ষকের সাথে গল্প করা, গল্পের বই পড়া, পেপার পড়া, নিজের লিখিত বইয়ের প্রুফ দেখা, কলেজেরই অন্য দায়িত্ব যেমন- বিভাগের/কলেজের রুটিন প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম।
* পরস্পর পরস্পরের সাথে কথা বলা কিংবা প্রশাসনের সাথে কথা বলার সময় শব্দ চয়নে সতর্ক না থাকা।
* কলেজের বিধি-বিধানকে ব্যঙ্গ করা।
* ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে এরূপ কথাবার্তা শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা।

নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ বলে বিবেচিত কাজসমূহ-

* ক্লাস গ্রহণের দায়িত্ব পালনে সময়ানুবর্তিতার অভাব অথবা ক্লাস/অফিস চলাকালে ব্যক্তিগত অন্যকোন কাজে ব্যস্ত থাকা।
* বিনা অনুমতিতে কর্তব্য হতে অনুপস্থিত থাকা।
* কর্তব্য পালনে অবহেলা বা উদাসিনতা বা অপরাগতা বা বিরক্তি প্রকাশ।
* পূর্বে অবহিতকরণ ব্যতিরেকে ছুটিতে গমন বা ছুটির মেয়াদ বর্ধিতকরণ।
* ছুটি মঞ্জুর হওয়ার আগে ছুটিতে যাওয়া।
* যথা নিয়মে ছুটির আবেদন পেশ না করা।
* পরীক্ষার উত্তরপত্র যথাযথ/যথানিয়মে মূল্যায়ন ও নিরীক্ষণ না করা।
* পরীক্ষা বা প্রশ্নের বা দায়িত্বের গোপনীয়তা ফাঁস করা।
* অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ অথবা পরিচালনা পরিষদের কোনো বৈধ/ যুক্তিংগত নির্দেশ একাকী বা অন্যান্যদের সহযোগে অমান্য করা বা মান্য করতে অন্যান্যদের প্রভাবিত করা।
* কলেজের কোনো সম্পদ অপচয় বা নষ্ট করা বা বৈধ অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার বা ভোগ করা বা স্থানান্তর করা।
* এমন কোনো কার্যে লিপ্ত থাকা যা শিক্ষক বা কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি অথবা নৈতিক অবয়ব সৃষ্টি করতে পারে।
* কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা গুরুতর অভিযোগ আনা হলে।
* শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে নৈতিক অবয়ব লক্ষ্য করা গেলে।
" কোন গ্রহণযোগ্য অভিযোগ উত্থাপিত হলে।
* নির্দিষ্ট সময়ের বেশি সময় শ্রেণিকক্ষে অবস্থান করে পরবর্তি ক্লাস শিক্ষকের সময়ক্ষেপণ করা।
* কলেজের গোপনীয় তথ্য ফাঁস করা।

প্লেনে চড়ে দ্রুততর গতিতে গন্তব্যে পৌঁছা যায়। এখানেও কিছু নিয়ম মানতে হয়। যেমন- ইচ্ছেমতো হাত পা ছুঁড়ে, যে দিকে ইচ্ছে সে দিকে হাঁটার স্বাধীনতা প্লেনে চড়লে থাকে না। কিন্তু সময়ের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে মানুষ প্লেনে চড়ছে। শিক্ষা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়ার একটি কাজ হলো অতীতকে জানা, বিশ্বের সঞ্চিত জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। কিন্তু আর একটি বড় কাজ যা আরও গুরুত্বপূর্ণ তা হল, বিরাজমান জ্ঞানের জগৎকে অতিক্রম করে যাওয়া। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যদি কোনো নিয়মনীতি থাকে তা হলো, মানব প্রজাতির উপর অর্পিত এই সম্মুখ চলার দায়িত্ব বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে অতীতকে জেনে, পুরানো জ্ঞানকে পটভূমিরূপে ব্যবহার করে, নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কার এবং নতুন উপলব্ধি সৃষ্টি। নিয়মানুবর্তিতা ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। জীবনের সকল স্তরে নিয়ম-নীতি মেনে চললে ব্যক্তি এবং সমাজের উন্নতি হবে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক

জনাব মো. সাইদুর রহমান মিঞা
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ

শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ education এসেছে ল্যাটিন শব্দ educare বা educatum থেকে। যার অর্থ to lead out অর্থাৎ ভেতরের সম্ভাবনাকে বাইরে বের করে নিয়ে আসা বা বিকশিত করা। সাধারণ অর্থে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনই শিক্ষা। ব্যাপক অর্থে পদ্ধতিগতভাবে জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকেই শিক্ষা বলে। তবে শিক্ষা হল সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের অব্যাহত অনুশীলন। বাংলা 'শিক্ষা' শব্দটি এসেছে 'শাস' ধাতু থেকে। যার অর্থ শাসন করা বা উপদেশ দান করা। সক্রেটিসের ভাষায় 'শিক্ষা হল মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের বিকাশ।' 'সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হল শিক্ষা'-এরিস্টটল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শিক্ষা হল তাই যা আমাদের কেবল তথ্য পরিবেশনই করে না বিশ্বসত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।' শিক্ষা প্রক্রিয়ায় কোন ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের জন্য উৎসাহ দেয়া হয় এবং সমাজের একজন উৎপাদনশীল সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য যে সকল দক্ষতা প্রয়োজন সেগুলো অর্জনে সহায়তা করা হয়।

এককথায় বলা যায়, জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের যে প্রক্রিয়া মানুষকে আলোকিত করতে সাহায্য করে তাকেই শিক্ষা বলে। কোন বিষয় চর্চা বা অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ যে ধারণা ও জ্ঞান অর্জন করে এবং ঐ জ্ঞানের জ্যোতির দ্বারা নিজে আলোকিত ও সমাজকে জ্যোর্তিময় করতে সহায়তা করে শিক্ষা তাকেই বলে। যে প্রক্রিয়া মানুষের মন-মনন, মানসিক উৎকর্ষ সাধন করে, মানুষের আচার-আচরণ, মন ও আত্মার ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন ঘটায়, মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের প্রভাব ফেলে এমন কর্ম প্রক্রিয়াকে শিক্ষা বলে। অন্তরাত্মার উন্নতি ছাড়া যে শিক্ষা তা সময়েরই অপচয় মাত্র। আর শিক্ষক হচ্ছেন উলিখিত শিক্ষা প্রক্রিয়াকে প্রণোদিত, উৎসাহিত ও অনুপ্রেরণা-দানকারী ব্যক্তি। তিনি সভ্যতার অভিভাবক, সমাজের অভিভাবক, সমাজের প্রতিনিধি। কার্যত শিক্ষক বলতে একজন আলোকিত, জ্ঞানী, গুণী ও বুদ্ধিদীপ্ত পণ্ডিত ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি সভ্যতা বিনির্মাণে অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শিক্ষা প্রিয়ার নিবেদিতপ্রাণ সেবক, ব্যবসায়ী নন। তিনি তাঁর আচার-আচরণ, মন ও মননে নিজেই বটবৃক্ষের ছায়া। তাঁর সাফল্যের ভিত্তি হল পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা, নির্মল চারিত্রিক গুণাবলী, জ্ঞান সঞ্চারণে আন্তরিক সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টা। তাই শিক্ষক বলতে এমন এক অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি শিক্ষার্থীকে শিখন প্রক্রিয়ায়, জ্ঞান অন্বেষণ ও আহরণে, মেধা বিকাশ ও উন্নয়নে, শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনে, নৈতিক ও মানসিক গুণাবলী বিকাশে এবং সমাজ বিবর্তনে অনুঘটক ও সুশীল সমাজ তৈরির সহায়তা দানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হচ্ছেন অন্য শিক্ষকদের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাই প্রধানের দায়িত্বও এ ক্ষেত্রে কম নয়।

যে কোন সম্পর্কেরই প্রধান ভিত্তি হলো পরস্পরের প্রতি প্রত্যাশা। অন্যভাবে বলা যেতে পারে আদান প্রদান (give and take)। প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির যোগফল মিলে সম্পর্কটি করে তোলে সহজ ও সুন্দর। শিক্ষার্থীর কাছে একজন শিক্ষকের প্রত্যাশা থাকে তাঁর শিক্ষার্থী যেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফল হয়। শিক্ষার্থীর ভালো ফলাফল শিক্ষককে গর্বিত করে। শিক্ষার্থী শিক্ষকের প্রতি আচরণে বিনয়ী হবে, এমনটাই তারা আশা করেন।

অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা চায় শিক্ষকের একটুখানি মনোযোগ, স্নেহ, ভালবাসা, সৌহার্দ্য। তারা চায় শিক্ষক ভালোভাবে ক্লাসে পড়াবেন। শিক্ষকের কঠোর মনোভাব তাদের মনে ভীতি তৈরি করে। শিক্ষকের প্রতি তারা আস্থা রাখতে চায়। আরেক ধরনের শিক্ষার্থী চায় শিক্ষক পরীক্ষার সময় সহজ প্রশ্ন করবেন ও খাতায় বেশি বেশি নম্বর দেবেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এসব প্রত্যাশা পূরণ সম্পূর্ণাংশে সম্ভব হয় না। অনেক শিক্ষার্থী আজকাল শিক্ষককে যথোপযুক্ত সম্মান করে না, ভ্রুক্ষেপও করতে চায় না। এর পেছনেও রয়েছে কিছু কারণ। শিক্ষকের নিজের ভাবমূর্তি যদি শিক্ষার্থীদের কাছে নেতিবাচক হয়ে থাকে

তবে তার পক্ষে সেই শিক্ষককে মন থেকে শ্রদ্ধা করা সম্ভব নয়। আবার শিক্ষার্থীর পারিবারিক নৈতিকতা-শিক্ষার অভাব থেকেও এমন আচরণ করে থাকে।

তবে মনে রাখতে হবে যে, একজন শিক্ষককে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়, তিনি নিয়মিত ক্লাসে যান, পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন। এসব ব্যস্ততার কারণে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের খোঁজখবর নেয়া, তাদের সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দেওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। ফলে শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকের সহজ সুন্দর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হবার সুযোগটাও হয়ে যায় সীমিত। অন্যদিকে যেসব শিক্ষক কোচিং এর নামে বাণিজ্য করে থাকেন তাদের প্রতিও শিক্ষার্থীদের আস্থার জায়গাটা নষ্ট হয়।

এক সময় শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সামান্য অপরাধে নানা রকম শারীরিক শাস্তি দিতেন। শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকদের যমের মত ভয় পেত। এখন শারীরিক ও মানসিক উভয় শাস্তি বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু শাস্তি না দিয়ে কিভাবে শিক্ষার্থীদের আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন করা যায় এ ব্যাপারে শিক্ষকদের জন্য কোনও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কটি সহজ ও সুন্দর না হয়ে যেন একটা ইঁদুর-বিড়াল খেলার মত হয়ে গেছে।

অনেক সীমাবদ্ধতার পরও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক সুন্দর সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষার্থীর সাফল্য নিজের সন্তানের সাফল্যের মতই গর্বিত করে তোলে একজন শিক্ষককে। একজন শিক্ষক শুধু শিক্ষকই নন, একজন ভালো বন্ধুও বটে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হলেই একজন শিক্ষার্থীর জানার পরিধি বেড়ে যায় অনেকগুণ। শুধু শিক্ষার্থীই যে সব সময় শেখে তা নয়, শিক্ষার্থীর কাছ থেকেও প্রতিনিয়ত অনেক কিছু নতুন করে জানতে পারেন শিক্ষক। শিক্ষাসফর, পিকনিক, স্পোর্টস ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক তৈরি হবার সুযোগ হয়। নবীন শিক্ষার্থীদের সংস্পর্শে থাকার কারণে একজন শিক্ষক থাকেন সব সময় আপডেটেড ও চির সতেজ। আর শিক্ষকের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষার্থীরাও জীবন সম্পর্কে নিতে পারে সঠিক সিদ্ধান্ত। প্রযুক্তির এই উৎকর্ষের যুগে শিক্ষকের ফেসবুকের বন্ধু তালিকাতেও দেখা যায় শিক্ষার্থীদের ভিড়। শিক্ষকের স্ট্যাটাসে লাইক, কমেন্ট দিয়ে শিক্ষার্থীরাও তাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানিয়ে দেয় সহজেই। প্রিয় শিক্ষকের ক্লাস মিস করার দিনগুলো নিয়ে তাদের মধ্যে আফসোসের সীমা থাকে না।

সমাজের প্রত্যাশা মোতাবেক একজন শিক্ষক হবেন জ্ঞান তাপস, মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত, ব্যক্তিত্ববান, চৌকস, শ্রেণিকক্ষে আন্তরিক পাঠদানকারী ও জ্ঞান বিতরণে আগ্রহী। তিনি সুবিচারক, সুপরীক্ষক, শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রক, যুক্তিবাদী, গবেষক এবং উদ্ভাবকও বটে। তিনি সঠিক পথের দিশারী, পথ পরিদর্শক; অবশ্যই সৎ ও নিষ্ঠাবান। শিক্ষক সহজ হবেন, সরল হবেন, নির্মল হবেন, হবেন অকুতোভয়-সত্যবাদী। সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ববান, সমাজ হিতৈষী, পরোপকারী এবং আধুনিকতামনস্ক সমাজ সংস্কারক। শিক্ষক হবেন চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন, পরিশ্রমী, নিরপেক্ষ, হাস্যোজ্জ্বল, সুপরামর্শদাতা ও প্রাণবন্ত এবং গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি অবশ্যই হবেন স্নেহশীল, বিশ্বাসযোগ্য, চরিত্রবান, ধৈর্যশীল, প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষক। তাঁর থাকবে স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গীকার। তিনি হবেন উত্তম, দক্ষ ও সুশীল ব্যক্তি। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান সাধনায় হবেন সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে হৃদয়স্পর্শী ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রত্যয়ী। সাহসী, সেবাদানকারী দৃঢ় প্রত্যয়ী, নির্মল, সৎ, মানবতাবাদী ও সমাজহিতৈষী পণ্ডিত ব্যক্তি।

সমাজ যেহেতু একজন শিক্ষককে আলোকিত মানুষ হিসেবে দেখতে চায় সে কারণে একজন জ্ঞানী শিক্ষক সমাজের সুশীল মানুষের অন্যতম হিসেবে কখনই সংকীর্ণ মনের হবেন না, মোসাহেবি বা দালালি করবেন না, অসৌজন্যমূলক আচরণ করা থেকে বিরত থাকবেন, দলাদলি পরিহার করবেন, কপটতা থেকে দূরে থাকবেন, অসৎ সঙ্গ পরিহার করবেন। তিনি কখনও পক্ষপাতমূলক আচরণ করবেন না, কখনই দেশের কল্যাণ ভাবনা থেকে পিছিয়ে পড়বেন না। মেধা বিকাশে, অজ্ঞতা দূরীকরণে, মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে, নৈতিকতার উন্নয়নে, উদ্ভাবনী কাজে, গবেষণায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে তৎপর থাকবেন। মনে রাখতে হবে একজন শিক্ষক কেবল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের শিক্ষক নন, তিনি সমাজের সর্বোপরি দেশের শিক্ষক।

বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রবর্তিত বিধিতে শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়াটা লজ্জার ও অপমানের। তবুও অনেক শিক্ষকই সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করেন না, কর্তব্যের প্রতি নেই তাদের একাগ্রতা। তাই

শিক্ষকতা আজ ব্রত থেকে, গঠনমূলক মনোভাব থেকে ছিটকে এসে বেতনভুক্ত কর্মচারি/কর্মকর্তাদের কাতারে দাঁড়িয়েছে, যা লজ্জাকর।

সামাজিক জীব হিসেবে 'সম্পর্ক' শব্দটার তাত্ত্বিক অপেক্ষা প্রায়োগিক তাৎপর্য বেশি। কেননা সামাজিক পরিমণ্ডলে জন্ম থেকে শুরু করে বেড়ে ওঠা, বিকাশ, সফলতা, প্রাপ্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে কোন না কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করতে হয়। আর এ নির্ভরশীলতার অন্যতম ভিত্তি হলো সম্পর্ক। হোক সেটা রক্তের, ব্যক্তিগত, পেশাগত অথবা ভিন্ন কিছু। তবে সম্পর্কের মানদণ্ড বিচার করলে শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক একটু ভিন্ন রকমের বলেই মনে হবে। যেহেতু শিক্ষকতা একটি মহান ব্রত, এ জন্য এখানে পেশাগত ব্যাপারটি ছাড়িয়ে যেটি অর্থবহ হয়ে ওঠে তা হলো পবিত্রতা যা পরিমাপের কোনো মানদণ্ড নেই।

একজন শিক্ষকের সঙ্গে তার শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক কেমন হবে-ইতিবাচক না নেতিবাচক, তা ওই শিক্ষকের কতগুলো বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। যেমন শিক্ষকের জ্ঞান-গভীরতা, বিদ্যোৎসাহিতা, সততা, নৈতিকতা ইত্যাদি। এসব গুণের সমন্বয় স্বভাবতই শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আস্থাশীল করে তোলে, যার চূড়ান্ত রূপ ফুটে ওঠে একটি সৃষ্টিশীল শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের মাধ্যমে। বুদ্ধিবৃত্তিক বিবেচনায় একজন শিক্ষক অবশ্যই শিক্ষার্থী অপেক্ষা উচ্চ আসনে আসীন থাকবেন। কিন্তু এটার যদি ব্যত্যয় ঘটে, শিক্ষকের নৈতিকতা যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয় কিংবা অন্য কোনও নেতিবাচক বিষয়ের উপস্থিতি ঘটে তাহলে এ সম্পর্কে চিড় ধরতে বাধ্য। এ জন্য একজন শিক্ষককে অবশ্যই সব সমালোচনার উর্ধ্বে থাকতে হবে।

শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্কের প্রভাব শুধু বিদ্যাপীঠের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একজন শিক্ষার্থীর জীবনে এর প্রভাব ব্যক্তিজীবনেও বিস্তৃত। শিক্ষার্থী-শিক্ষক মহৎ সম্পর্কের স্বাদ ও স্বরূপ পেতে হলে কাঠামোগত সংস্কার ও মানসিকতার আমূল পরিবর্তন অপরিহার্য।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন কোন মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করতে পারে না। তাই বলা হয়, কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হলে সেই জাতির শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দাও। আজকের শিশু আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। একটি স্বনির্ভর জাতি গঠনে আজকের শিশুদের জন্য সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। একটি শিক্ষিত জাতি গঠনে যার ভূমিকা প্রধান তিনি হচ্ছেন শিক্ষক। শিক্ষককে তাই বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। একটি শিশুর জন্মের পর যেমন তার সঠিক লালন-পালন নির্ভর করে পিতা-মাতা অর্থাৎ অভিভাবকের ওপর, তেমনি শিশুটি বেড়ে ওঠার সঙ্গে তাকে সুশিক্ষিত, সুনাগরিক, বিবেকবান ও নিবেদিতপ্রাণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে একজন শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য ।

জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময় হল শৈশব কিংবা ছাত্রজীবন। জীবনের স্বর্ণালী সময়টা শিশুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাটায়। তাই শিক্ষাঙ্গনকে শিক্ষার্থীদের স্বর্গ, পবিত্রতম স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্যক্তির চালিকাশক্তি যেমন তার প্রাণ, জাতির চালিকাশক্তি তেমনি শিক্ষাঙ্গন। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে উচ্ছ্বল প্রাণের স্পন্দন নেই। শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক, দেশ ও জাতির একমাত্র প্রার্থনা যেন শুধু ভালো রেজাল্টের প্রতি। একজন শিক্ষার্থী প্রতিদিন স্কুল, প্রাইভেট, কোচিং, বাসায় টিউটরের কাছে ঠিকমতো পড়ছে কিনা, প্রতি বিষয়ে জিপিএ-৫ নম্বর পেল কিনা, ভাবনা কেবল এইসবকে কেন্দ্র করে। শিক্ষার্থীদের হাতে মোবাইল, কাঁধে কম্পিউটার–তারা এ দুটোকে জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়া মনে করে জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময় ব্যয় করে। যন্ত্রকেন্দ্রিক জীবন চালনার ফলে শিক্ষার্থীরা প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। একথা মানতেই হবে যে, একজন শিক্ষার্থীর বিকাশ ঘটে তার শিক্ষার মাধ্যমে, সুস্থধারার সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে। পড়ালেখার পাশাপাশি সাহিত্য সংস্কৃতি, বিনোদন ও খেলাধুলা চর্চা অব্যাহত না থাকলে শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে না।

শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। জীবন গড়ার সময় বাবা-মা ও শিক্ষকদের সান্নিধ্যে থাকে, তাই তাদের আচার-আচরণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষার্থীকে যেভাবে শেখানো হয় সে সেভাবেই গড়ে ওঠে। তাই শিক্ষক-শিক্ষার্থী সর্ম্পক হতে হবে একদিকে আদর্শের, নীতির অপরদিকে অভিভাবকের। পিতামাতার পরে শিক্ষকের স্থান। শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর শুধু লেখাপড়ার সম্পর্কই মূল কথা নয়। একজন আদর্শ শিক্ষক আদর্শ মানুষ গড়ে তোলেন, যে মানুষ একদিন তাদের পরিবারের তথা সমাজের বা রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়ে ওঠে। বর্তমান সমাজে যে অবক্ষয় চলছে, তা থেকে উত্তরণে শিক্ষকই হতে

পারেন শিক্ষার্থীর বাতিঘর। একটা সময় ছিল যখন পণ্ডিত মশাইরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্র জোগাড় করতেন, বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেন, সমাজের মানুষকে আলোর পথ দেখাতেন, কালের বিবর্তনে তা আজ বিলীন হওয়ার পথে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে যে আত্মার, ভালোবাসার, আদর্শের সম্পর্ক থাকার কথা সেখানে কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে অনৈতিক, অনাদর্শের, শত্রুতার তথা বিরূপ সম্পর্ক। সেখানে সম্পর্কটি কেবল বাণিজ্যনির্ভর হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীকে পাঠদানের পাশাপাশি তার মানসিক বিকাশ ও মানবিক দিকগুলোকে উদীপ্তকরণ এবং সমাজের প্রতি তার দায়বোধ শেখানো একজন শিক্ষকের দায়িত্ব।

শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে–শিক্ষক প্রয়োজনে শিক্ষার্থীকে শাসন করবেন তাতে দোষের কিছু নেই, কিন্তু তা যদি হয়ে পড়ে আক্রোশের কিংবা মানসিক বিকৃতির–আপত্তি সেখানেই। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে তিনিও সন্তানের পিতা-মাতা, একজন অভিভাবক। মেধাসম্পন্ন, আন্তরিকতাসম্পন্ন বা প্রকৃত শিক্ষানুরাগী শিক্ষকের অপ্রতুলতা পরিবেশকে বেশি জটিল করে তুলছে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত যদি সঠিক করা যায়, তাহলে তাদের সব প্রশ্নোত্তর, লেখাপড়াজনিত সমস্যাসমূহ শ্রেণিকক্ষে সমাধান করা সহজ হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাগুলো বিশেষণের জন্য শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন আছে। এছাড়া শিশুকাল থেকে শিশুদের মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে আস্তে আস্তে শিক্ষাদান করা উচিত। সবচে বেশি নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। এখানে শিক্ষক ও অভিভাবকদের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

এক সময় সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা ছিল সবার ওপরে। শিক্ষার্থীদের মানুষ করতে গিয়ে শিক্ষকগণ অনেক সময় কঠোর হতেন এতে অভিভাবগণ কোন আপত্তি করেননি। কারণ তারা বুঝতেন যে, তাদের সন্তানের মঙ্গলের জন্যই শিক্ষকদের এই আপাত কঠোরতা। কবি কাজী কাদের নেওয়াজের 'শিক্ষকের মর্যাদা' কবিতার বিষয়বস্তুতে দেখা যায়, মুঘল বাদশাহ আলমগীর তার পুত্রকে একজন শিক্ষকের কাছে পড়াতে দিয়েছিলেন। একদিন তিনি খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন শাহজাদা পাত্র থেকে পানি ঢালছেন আর শিক্ষক নিজ হাত দিয়ে পা ধুয়ে নিচ্ছেন। এ দৃশ্য দেখে বাদশাহ ঐ শিক্ষককে ডেকে পাঠান। বাদশাহর আদেশ পেয়ে ঐ শিক্ষক ভয়ে মুষড়ে গেলেন। তিনি প্রথমে ভাবলেন, বাদশাহর সন্তানকে দিয়ে পায়ে পানি ঢালিয়ে না জানি তিনি কত বড় স্পর্ধার কাজ করে ফেলেছেন! কিন্তু পরক্ষণেই তার আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠে। পরদিন তিনি মাথা উঁচু করেই বাদশাহর সামনে হাজির হন। কিন্তু তিনি যা ভেবে গিয়েছিলেন প্রকৃত ঘটনা তার বিপরীত। বাদশাহ শিক্ষককে তিরস্কার করে বললেন যে, আপনার কাছ থেকে আমার সন্তানতো কোন আদব-কায়দাই শিখলো না! এ কেমন শিক্ষা দিলেন যে আপনার ছাত্র আপনার পায়ে পানি ঢেলে দেবে আর আপনি আপনারই হাত দিয়ে পা পরিষ্কার করবেন? আপনি তাকে এমন শিক্ষা দিলেন না কেন যেন সে নিজেই নিজের হাত দিয়ে আপনার পা ধুয়ে দেয়? তখন শিক্ষক লজ্জাবোধ করেন এবং শিক্ষকদের প্রতি বাদশাহর এত বড় সম্মান প্রদর্শনে অভিভূত হন। এ কারণে তিনি উচ্চকিত কণ্ঠে বাদশাহর প্রশংসা করেন।

এভাবেই প্রাচীনকালে গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত শিষ্যরা। গুরুর মুখনিঃসৃত বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করত শিষ্যরা। গুরুর কথার অন্যথা কখনো ভাবতে পারত না তারা। শিষ্যদের কাছে গুরু ছিলেন সাক্ষাৎ দেবতা। সে যুগ এখন আর নেই। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কটা এখন অনেক বেশি স্বার্থের। শিক্ষার্থীদের সমস্যায় শিক্ষকগণকে দূরে থাকতে দেখা যায়। আবার অনেকক্ষেত্রে শিক্ষকগণ ক্ষমতার অপব্যবহার করেন যা শিক্ষার্থীদের জন্য হয়রানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একজন শিক্ষক কখনো শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন না। তিনি শিক্ষার্থীকে এমনভাবে তৈরি করবেন যেন শিক্ষার্থী নিজ থেকে প্রয়োজন অনুভব করে তার শিক্ষককে কতখানি সম্মান করতে হবে। সম্মানের অর্থ শুধু সালাম দেয়া নয়; আবার সম্মানের অর্থ শিক্ষার্থীকে দিয়ে বাজারের ব্যাগ বহন করানোও নয়। শিক্ষার্থী নিজ থেকে উপলব্ধি করবে তার শিক্ষকের জন্য তার কী করা প্রয়োজন। এ জন্য একটি সুনিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠা দরকার যা একইসাথে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক।

কথায় বলা হয়ে থাকে 'বাপে জন্ম দেয় ভূত আর শিক্ষক বানায় পুত।' অর্থাৎ একজন পিতা তার সন্তানকে মানুষ করে তোলার পেছনে খুব বেশি ভূমিকা রাখেন না যতটা শিক্ষক রাখেন। সেজন্য শিক্ষককে বলা হয় দ্বিতীয় জন্মদাতা। তিনি একই সাথে বন্ধু, সহচর এবং অভিভাবক। শিক্ষক তার শিক্ষার্থীর কাছে এমন হবেন যেন শিক্ষার্থী নির্দ্বিধায় তার সমস্যার কথাগুলো বলতে পারে যা তার বন্ধুদের কাছেও সে বলতে পারে না।

প্রতিটি মানুষই তার জীবনের কোন না কোন এক অংশে তার শিক্ষকের কাছ থেকেই খুঁজে পায় অনুপ্রেরণা। একজন শিক্ষক কেবল শ্রেণিকক্ষে পড়ানই না, তিনি একই সাথে শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করেন একটি জগৎ, দেখান স্বপ্ন, সাহায্য করেন ভবিষ্যৎ পথ পরিক্রমায়। একজন শিক্ষক এভাবেই হয়ে যান একজন বন্ধু, ফিলসফার, গাইড এবং সর্বোপরি ভালোবাসার মানুষ। হয়ে উঠেন রোলমডেল, কিংবা প্রিয় ব্যক্তিত্বের একজন।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কটা নির্ভর করে তাদের নিজস্ব আচরণের ওপর। আসলে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে এক ধরনের বলয়ের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন। এ বলয়টা ভাঙ্গা দরকার। তবে অবশ্যই তাদের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধার জায়গাটাও বজায় রাখতে হবে। তবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সুন্দর সম্পর্কের জন্য শিক্ষকদেরই প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার্থীদেরকে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে, তাদের সাথে আলাপ আলোচনা বা ক্লাসের পাঠদানের বিষয়গুলোও প্রাণবন্ত হতে হবে, এখানে পেশাদারিত্ব ফুটে উঠবে উভয় পক্ষ থেকেই। কোন বিশেষ শিক্ষার্থী নয় বরং সকল শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগী হতে হবে। তাদের কথা ও দাবির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। তবে একটা ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য শিক্ষার্থীদেরও শিক্ষককে মর্যাদা দিতে হবে। আর উভয়কেই যে কোন ধরনের স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে একসাথে কাজ করতে হবে।

পারস্পরিক সম্পর্ক প্রেক্ষিতে : ঢাকা কমার্স কলেজ

মোঃ ইউনুছ হাওলাদার
শিক্ষার্থী উপদেষ্টা ও সহযোগী অধ্যাপক, সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

প্রাতিষ্ঠানিক কোনো লক্ষ্য অর্জনে যৌথভাবে কাজ করার জন্য সহযোগিতা সহমর্মিতার কোনো বিকল্প নেই। পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল থাকলে যে কোনো সমস্যা অতি সহজে সমাধান করা যায়। ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হল পারস্পরিক সম্পর্ক। যে সকল প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক চমৎকার তারাই সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পেরেছে। ঢাকা কমার্স কলেজের প্রেক্ষিতে পারস্পরিক সম্পর্ক আমরা নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করতে পারি:

১. শিক্ষক-শিক্ষার্থী পারস্পরিক সম্পর্ক : ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী পারস্পরিক সম্পর্ক চমৎকার। নবীণবরণে তাজা গোলাপের শুভেচ্ছা দিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ একটি জাগ্রত পরিবার এ গান গেয়ে আমরা শিক্ষার্থীদেরকে বরণ করে নেই। শ্রেণিক্ষকে পাঠদানের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রম যেমন নৌ-ভ্রমণ (ইলিশ ভ্রমণ), সুন্দরবন ভ্রমণ, শিক্ষা সফর, বার্ষিক ক্রীড়া, বিভিন্ন কালচারাল অনুষ্ঠান, বিতর্ক, বার্ষিক ভোজ, বিভিন্ন ক্লাব, পুনর্মিলনী, শিক্ষার্থীর নাম বা পরিচয় জানা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।

২. বিভাগীয় শিক্ষকদের পারস্পরিক সম্পর্ক : বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। কেন না প্রতিটি বিভাগ সুন্দরভাবে চললে পুরো কলেজই সুন্দরভাবে চলে। বিভাগীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে প্রতিটি বিভাগের আলাদা একটি নিজস্ব প্রশাসন রয়েছে। কলেজ প্রশাসনের গাইড লাইন অনুযায়ী ক্লাস, রুটিন, ক্লাস বণ্টন, খাতা ভাগ এবং মূল্যায়ন একটি নীতিমালা অনুযায়ী ভাগ করলে

বিভাগীয় শিক্ষকদের মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় থাকে। এ ছাড়া বিভাগে নতুন শিক্ষক যোগদান, পদোন্নতি, কোনো সুসংবাদে অভিবাদন ও কোনো শিক্ষকের বিপদে সহমর্মিতা জানালে পারস্পরিক সম্পর্ক পৃদ্ধি পায়। কোনো সহকর্মী ছুটিতে থাকলে তার ক্লাস ম্যানেজ করা। পরীক্ষার খাতা যথাসময়ে মূল্যায়ন করে চেয়ারম্যানকে সহযোগিতা করা। ক্লাসে কোনো কারণে শিক্ষক না গিয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক ম্যানেজ করা। বিভাগীয় শিক্ষকগণ অবশ্যই সিনিয়রিটি মেনে চলবেন। সিনিয়র শিক্ষকও জুনিয়র শিক্ষককে স্নেহ ও মমতার চোখে দেখবেন। বিশেষ করে নতুন শিক্ষকদেরকে অবসর সময়ে ক্লাস পদ্ধতি, পড়ানোর কৌশল, কলেজের বিভিন্ন নিয়মকানুন সম্পর্কে ধারণা দেবেন। কলেজের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরবেন।

৩. আন্তঃবিভাগ সম্পর্ক : ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিটি বিভাগই স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হয়। যেহেতু প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য টিমওর্য়াকের বিকল্প নেই, সে জন্য কলেজের এক বিভাগের সাথে অন্য বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল থাকা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের কলেজের শুরু থেকেই আন্তঃবিভাগ সম্পর্ক চমৎকার। এ সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য বিভাগের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অন্য বিভাগকেও দাওয়াত দেয়া হয়। ঈদের পর ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমরা পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাই। প্রতি বার্ষিক ভোজের সময় ঢাকা কমার্স কলেজ নাইট উদ্‌যাপিত হয়। এ সময় গানের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সময় কাটে, রান্নাও তদারকি করা হয়, যাকে বলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা।

৪. শিক্ষক-অভিভাবক পারস্পরিক সম্পর্ক: কলেজের স্টেকহোল্ডার হলো অভিভাবক। সুতরাং শিক্ষক-অভিভাবকদের পারস্পরিক সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

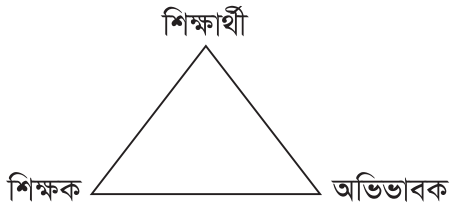

চিত্র অনুযায়ী শিক্ষার্থীর উন্নতির জন্য শিক্ষক-অভিভাবক পারস্পরিক সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। সে জন্য নিয়মিত অভিভাবক মিটিং করতে হবে। সে ক্ষেত্রে আমার একটি প্রস্তাব হলো- অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারে পেরেন্টস-ডে (অভিভাবক দিবস) উল্লেখ রাখা যায়। এ রকম একটি পেরেন্টস ডে-তে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের টার্ম পরীক্ষার ফলাফল পেরেন্টস এর হাতে তুলে দিতে পারি।

কলেজের উপদেষ্টাগণ বিভিন্ন কারণে সবচেয়ে বেশী অভিভাবকগণের সাথে সাক্ষাৎ করে থাকে। এতে উপদেষ্টাগণ তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, কৌশল দিয়ে কলেজের নিয়মকানুন অনুসরণ করে অভিভাবকগণের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক বাজায় রাখবেন। কেন না অভিভাবকগণ তার পোষ্যের ভাল ফলাফল করতে কলেজ প্রশাসনকে সহায়তা করবে এবং কলেজের সুন্দর নিয়মকানুনগুলো সে তার পরিমণ্ডলে প্রচার করবে। এতে কলেজ উপকৃত হবে। প্রকৃতপক্ষে অভিভাবকগণ আমাদের নিকট কিং এর মতো। ব্যাংকে একটি কথা প্রচলিত আছে Customer has no error অর্থাৎ গ্রাহকের কোনো ভুল নেই। কারণ ব্যাংকারদের বেতন হয় কাস্টমারের টাকায়। আমাদের প্রায় ৬ হাজার অভিভাবকের ব্যবহার ৬ হাজার রকমের হবে এটাই স্বাভাবিক। কলেজের গেটে দায়িত্বরত, অভ্যর্থনাকারী, চেয়ারম্যান, উপদেষ্টা সবাইকে এ ভিন্নতা মাথায় রেখে কাজ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই অভিভাবককে প্রতিপক্ষ বানানো যাবে না। অভিভাবককে বুঝাতে হবে আমরা আপনার পোষ্যের সবচেয়ে মঙ্গল কামনা করছি। গাইড শিক্ষকগণও তাদের অধীনস্থ শিক্ষার্থীর ফলাফল উন্নতির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

৫. কলেজ প্রশাসনের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক : কলেজের লোকাল প্রশাসন বলতে আমি বোঝাতে চাই অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ স্যারের সাথে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সু-সম্পর্ক থাকা একান্ত আবশ্যক। ঢাকা কমার্স কলেজে আমি মনে করি এদিক দিয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছে। কেন না এ কলেজের অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ স্যার ওপেন ডোর পলিসিতে বিশ্বাসী। এখানে যে কোনো শিক্ষক-শিক্ষার্থী তার প্রয়োজনে

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ স্যারের সাথে অতি সহজে কথা বলার সুযোগ পেয়ে থাকে। পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে কলেজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। সু-শাসন এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষতা পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত করে। ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবার কনসেপ্টে আমরা বিশ্বাসী। এ সম্পর্কের কারণে শিক্ষক- কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সুখে-দুঃখে কলেজ সব সময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

৬. শিক্ষক-কর্মকর্তা, কর্মচারী পারস্পরিক সম্পর্ক : ঢাকা কমার্স কলেজ একটি সেবামুখী প্রতিষ্ঠান। এ বিশাল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য অফিস, হিসাব শাখা, পরীক্ষা শাখা, প্রকৌশল শাখা সাপোর্টিং হিসেবে কাজ করে। শিক্ষক-কর্মকর্তা, কর্মচারী পারস্পরিক সম্পর্ক অবশ্যই ভাল থাকতে হবে। সম্পর্ক ভাল থাকলে কাজে আন্তরিকতা থাকবে। এতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ দ্রুত ও নির্ভুল সেবা পাবে। শুধু তাই নয় পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল থাকলে অনেক সময় কর্মকর্তা ও কর্মচারী দিয়ে বেশি বা অতিরিক্ত সময় কাজ করিয়ে নেয়া যায়।

এ ছাড়াও কলেজের শিক্ষার্থীরা যেহেতু গণপরিবহণে যাতায়াত করে সে জন্য কলেজ প্রশাসন ও রুটের পরিবহন কোম্পানির সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে বৈঠক করতে পারে। সাথে সাথে কলেজের শিক্ষার্থীদের নোটিশের মাধ্যমে এ বিষয়ে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে। কলেজের আশেপাশের ভবন মালিক, দোকান, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। এতে এলাকার আইন শৃঙ্খলা ও পরিবেশ ভাল রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা বোর্ড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল রাখতে হবে।

পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের উপায়সমূহ :

০১. কুশল বিনিময়;
০২. পারস্পরিক বিশ্বাস বা আস্থা অর্জন করা;
০৩. পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখা;
০৪. সবাইকে নিয়ে কোনো ভ্রমণ, ট্যুর বা পিকনিকের আয়োজন করা;
০৫. জন্মদিন বা বিবাহ বার্ষিকীতে অভিবাদন জানানো;
০৬. পরিবারের কোনো সু-সংবাদে অভিনন্দন জানানো;
০৭. মত বিনিময় করা;
০৮. সহকর্মীদের বিপদে এগিয়ে আসা;
০৯. অন্যের মতামতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা;
১০. অন্যের দুর্বল দিক সম্পর্কে আলোচনা না করা;
১১. অযথা বিতর্ক না করা;
১২. পিছনে সমালোচনা না করা;
১৩. সহকর্মীর ভুলকে গোপনে শুধরে নেয়ার পরামর্শ দেয়া;
১৪. ভাল পরামর্শ দেয়া;
১৫. মাঝে মাঝে সকলের পরিবারকে নিয়ে একত্রে অনুষ্ঠান করা;
১৬. নিজে বেশি জানি এমন ভাব না দেখানো;
১৭. ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা;
১৮. যথাযথ সম্বোধন করা;
১৯. কোনো সমস্যা অন্য সহকর্মীর সাথে শেয়ার করা;
২০. মন খুলে আড্ডা দেয়া;
২১. সহকর্মীকে অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে না দেয়া;
২২. সহকর্মীকে উপহাস না করা;
২৩. ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবার ধারণাটি মনে পোষণ করা।

সর্বোপরি বলা যায়, পারস্পরিক সম্পর্ক কোনো প্রতিষ্ঠানের উন্নতির মূল চাবিকাঠি। ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের মূলে রয়েছে পারস্পরিক সম্পর্ক। ঢাকা কমার্স কলেজ একটি প্রাইভেট কলেজ। আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে আমাদের চাকুরি বদলিযোগ্য নয়। সুতরাং পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল না থাকলে সহকর্মীদের সাথে এক সাথে চাকুরি করা খুব কঠিন হয়ে পড়বে। বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে যে সকল বাধা রয়েছে তা অতিক্রম করে সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

বিঃ দ্রঃ প্রবন্ধটি টিচার্স ওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড ট্রেনিং প্রোগ্রামের জন্য রচনা করা হয়েছে

** Source : Internet*

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা

সাদিক মোঃ সেলিম
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ইংরেজি বিভাগ

একজন শিক্ষকের জন্য শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা বলতে শ্রেণিকক্ষের এমন একটি আদর্শ অবস্থাকে বুঝায় যা শিক্ষাগ্রহণ কাজটি যথার্থভাবে সম্পাদিত হতে সাহায্য করে। প্রচলিত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা বলতে কেবল শ্রেণিকক্ষের শৃঙ্খলা ও শিক্ষার্থীদের অসদাচরণ নিয়ন্ত্রণকে বোঝানো হতো। বর্তমানে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা দ্বারা ছাত্রের আচরণ নিয়ন্ত্রণের চেয়ে পাঠদান ও শিক্ষাগ্রহণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। সুষ্ঠু ক্লাসরুম ব্যবস্থাপনাকে পৃথিবীর সর্বত্রই অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। কারণ অনেক সময় একটি কোর্সের সাফল্য অনেকাংশে এর উপর নির্ভর করে। শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার আওতায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রাখা হয়-

১। আসন ব্যবস্থাপনা
২। পাঠদান/পাঠগ্রহণ কর্মকাণ্ড
৩। শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা
৪। শ্রেণিকক্ষের বিশেষ মুহূর্তগুলো
৫। শিক্ষা উপকরণ এবং পাঠদান কৌশল
৬। শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত রেখে কাজ করা

একজন শিক্ষক প্রাপ্ত সময় ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করেন। আর তা নিশ্চিত করতে যে সাংগঠনিক ও নির্দেশনামূলক কার্যাবলি তিনি সম্পাদন করে থাকেন তাকে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা বলা হয়। শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনাকে কিছুটা পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে এর অনেকখানিই করতে হয় ক্লাস চলাকালীন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। এটি করতে হয় পাঠের ধারাকে বজায় রাখতে, কখনো বা পাঠদানে গতির পরিবর্তন আনতে অথবা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী শিক্ষক অথবা শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী Interaction/আন্তঃ কর্মকাণ্ড বাড়ানোর জন্য। শিক্ষা বিশারদদের অনেকে মনে করেন বড় শ্রেণিকক্ষ অর্থাৎ যেখানে একটি শ্রেণিকক্ষে অনেক বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী বসে ক্লাস করে, কিংবা ভাষা শিক্ষাদানের কোর্স, যেখানে ভাষা শিক্ষাদানের বিভিন্ন Skills গুলোর উপর জোর দেয়া হয়, সে রকম ক্লাসে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো: ১) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ২) সংগৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা। শিক্ষক সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি কি কি কাজ করবেন এবং এর প্রেক্ষিতে তাঁকে সম্পাদনের জন্য কর্মকাণ্ডগুলো পরিকল্পনাও স্থির করতে হবে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পর তার মাথায় অনেকগুলো বিষয় এসে উপস্থিত হয়। এর ভেতর থেকে তাঁকে যে কোনো একটি কর্মকাণ্ডকে বাছাই করতে হয় এবং অন্যগুলো সরিয়ে দিতে হয়। এক্ষেত্রে আবার কয়টি কাজ তিনি করবেন, কোনটি আগে আর কোনটি পরে এবং এ ব্যাপারে কতটা সময় বরাদ্দ থাকছে তা বণ্টনসহ কোন কাজটি কীভাবে সম্পাদন করা হবে- সেটাও তাৎক্ষণিকভাবে চিন্তা করে নিতে হবে এখানেই শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি চলে আসে এক্ষেত্রে তাঁকে কেউ উপস্থিত হয়ে বলে দেবেন না কাজটা করার সঠিক পন্থা কোনটি। এ বিষয়ে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট একক উত্তর নেই অথবা একটি পাঠ্য বিষয়কে শুধু একটি পন্থায় কার্যকরভাবে পড়ানো যাবে তেমন সুযোগও নেই। এটাই স্বাভাবিক যে, বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অবস্থায় একটি সমস্যার সমাধান দেবেন। কাজেই একজন শিক্ষকের পাঠদানের বিষয়টি তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করে।

একজন শিক্ষকের জন্য শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার মূল দিকটি হলো শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে প্রথমেই তিনি উপস্থিত শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে দেখবেন। এর পর তিনি ভেবে নেবেন ও পর্যবেক্ষণ করবেন তখনকার অবস্থার আলোকে তাঁর হাতে কি কি বিকল্প চিন্তা আছে। এর পর তিনি সঠিক সিদ্ধান্তটি বেছে নেয়ার চেষ্টা করবেন। সবশেষ কাজটি হবে বাছাইকৃত কাজগুলো দক্ষতার সাথে ও কার্যকরভাবে সম্পাদন করা।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যে সিদ্ধান্ত নেন ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন তা মূলত নির্ধারিত হয় একজন শিক্ষকের মনোভাব, ইচ্ছা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ দ্বারা। অর্থাৎ শিক্ষণের কোন দিকটি তার নিকট গুরুত্বপূর্ণ। আর একজন শিক্ষকের তাঁর শিক্ষার্থীদের

সম্পর্কে প্রকৃত অনুভূতি কি? শিক্ষার্থীকে কোন কাজটিতে কতটুকু নিয়োজিত করা যায়, কীভাবে একটি অনুশীলন করতে বলা যায়, আর সেটি কতটুকু কার্যকর হবে বলে শিক্ষক মনে করেন- এ বিষয়গুলো নির্ভর করে শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকের কতটুকু আস্থা বা বিশ্বাস আছে তার উপর।

শ্রেণিকক্ষে মিথস্ক্রিয়া (Interaction): শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় Interaction একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই Interaction হয় শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর অথবা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে। প্রথাগত ভাবে আমরা দেখে এসেছি শিক্ষক ডায়াসে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়ে থাকেন আর শিক্ষার্থী সেটি অনুসরণ করার চেষ্টা করে। বর্তমানে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের বিষয়টিকে অনেকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আর ক্লাসটি যদি হয় ভাষা শিক্ষার কোনো ক্লাস তা হলে তো কথা-ই নেই। ভাষা বিশেষজ্ঞরা আজকাল দুটি Term (শব্দ) ব্যবহার করে থাকেন- একটি হলো TTT ও অন্যটি হলো STT. TTT (Teacher Talk Time) এর বিপরীতে বর্তমানে STT (Student Talk Time) কে-ই বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে, অর্থাৎ শ্রেণিতে শিক্ষক কথা বললে আর শিক্ষার্থী তা শুনলে বা শিক্ষকের সাথে অংশগ্রহণ করলে শিক্ষার্থীর ভাষা শিক্ষার জন্য দরকারী Skill গুলো অনুশীলনের পর্যাপ্ত সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ভাগে ততটা জোটে না। ফলে STT এর জন্য বেশি সময় বরাদ্দ রাখার পক্ষেই অধিকাংশ ভাষা বিশারদ মত দিচ্ছেন। এতে করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যেও যে বিভিন্ন চিন্তা ও নতুন কিছু দেয়ার মতো কিছু রয়েছে তা প্রকাশ পায় এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের শেখার সুযোগ তৈরি হয়। শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় বলে এরকম অংশগ্রহণমূলক ক্লাসে তাদের মনোযোগ অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে। Group Work ও Pair Work এর মাধ্যমেও ভাষা শিক্ষার ক্লাসগুলোকে কার্যকরী করতে হয়। TTT এর পরিবর্তে STT কে বেশি গুরুত্ব দেয়ার আরেকটি কারণ হলো মানুষ সাধারণত একটি কাজ দেখে বা শুনে যতটুকু শিখে তার চেয়ে বেশি শিখে সেটি করার চেষ্টা করে।

মিথস্ক্রিয়া বাড়ানোর জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে বিবেচনায় আনতে পারেন :

১. শ্রেণিকক্ষে বন্ধুসুলভ ও খোলামেলা শিক্ষা গ্রহণ উপযোগী একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

২. শিক্ষক নিজে পাঠ্য বিষয়টির ব্যাখ্যা না দিয়ে শিক্ষার্থীর নিকট উত্তর জানার চেষ্টা করবেন।

৩. শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন শোনার জন্য এবং চিন্তা করে তার উত্তর প্রদানের জন্য যথেষ্ট সময় দেবেন।

৪. শিক্ষার্থীর কথা শিক্ষককে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতে হবে। শিক্ষার্থীকে তার কথা শেষ করার সুযোগ দিতে হবে।

৫. শ্রেণিতে যে শিক্ষার্থী কথা কম বলে অথবা মৃদু স্বরে কথা বলে তাকেও প্রয়োজনীয় কথা বলতে অথবা Interaction কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।

আসন বিন্যাস : শ্রেণিকক্ষের আসন বিন্যাস শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষাগ্রহণ কার্যক্রমকে সহায়তা করে এমন ভাবেই আসন বিন্যাস করতে হবে। শিক্ষকের যথার্থ দৃষ্টির সীমায় সকল শিক্ষার্থীকে রাখতে হবে। সবদিক বিবেচনা করেই অনেক প্রতিষ্ঠানে এমন আসন বিন্যাস করা হয়। শিক্ষক যেন শ্রেণিকক্ষের ভেতরে যথার্থভাবে চলাচল করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিকটতম দূরত্বে যেতে পারেন এবং কথা বলতে পারেন এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে। কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট আসন ব্যবস্থা রাখা হয়। এতে সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই থাকে। যে শিক্ষার্থী প্রতিদিন পেছনের সিটে বসে তার পক্ষে শিক্ষকের কথায় মনোযোগ দেয়ার সুযোগ থাকে কম। এছাড়া অধিকাংশ শিক্ষক সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন বিধায় অমনোযোগী শিক্ষার্থীরা পেছনে বসে নিজের ও অন্যের লেকচার শ্রবণে বাধা সৃষ্টি করার সুযোগ পায়। ঢাকা কমার্স কলেজ-এ নির্ধারিত আসনে শিক্ষার্থীদের বসতে হয়। এক্ষেত্রে পেছনের শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন একই সীটে বসে বিধায় অনেক সময় পাঠে অমনোযোগী থাকে এবং শিক্ষককে ক্লাস নেয়ার সময় কিছুটা বেশি বিরক্ত করে থাকে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে Group Work ও Pair Work করানোর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রেণিকক্ষে ব্যবস্থা রাখা হয় যেটি আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নেই বললেই চলে। শ্রেণিকক্ষে আসন বিন্যাসের সময় খেয়াল রাখতে হবে সকল শিক্ষার্থীর আসনে যেন পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকে।

শ্রেণিকক্ষে পাঠ নির্দেশনা প্রদান : শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় পাঠ নির্দেশনা প্রদান ও শিক্ষার্থীদের সে নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অনেক সময় শিক্ষক কী করাতে চাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা তা বুঝতে পারে না। তখন ক্লাসের স্বাভাবিক শিক্ষাগ্রহণ কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হয়। এ সংক্রান্ত সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

১। শিক্ষক যে বিষয়টি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করতে

চাচ্ছেন তা নিয়ে একটি পূর্ব পরিকল্পনা করবেন। নিজেই সেটিকে সহজ, সাবলীল ও ক্রমানুসারে সাজাবেন এবং বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবেন।

২। পাঠদান চলাকালে যে সমস্ত বিষয় শিক্ষার্থীদের সে মুহূর্তে জানার দরকার নেই সেগুলোর অবতারণা করার প্রয়োজন নেই।

৩। পড়ানোর বিষয় নিয়ে যখন আলাপ আলোচনা চলে অথবা শিক্ষক লেকচার প্রদান করছেন; তখন তিনি অপ্রয়োজনীয় গল্প, জোঁকস ইত্যাদির অবতারণা করবেন না।

৪। পাঠদান কার্যক্রম শুরুর পূর্বে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকৃষ্ট করবেন। তিনি সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর আই-কন্টাক্ট করবেন। নিজের কর্তৃত্ব প্রকাশ করে এমন ভাবে তিনি বক্তব্য দেবেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা তাঁর কথায় মনোযোগ দিচ্ছে - এটি তিনি নিশ্চিত হতে চেষ্টা করবেন। শিক্ষক নিশ্চিত হয়ে নিবেন তিনি যা করাচ্ছেন বা করতে বলেছেন সকল শিক্ষার্থী তা বুঝতে পেরেছে।

শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ : অনেক শিক্ষক শ্রেণিতে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীর কোলাহল না থামিয়ে অথবা মনোযোগ আকৃষ্ট না করেই পাঠদান শুরু করেন। এতে করে শ্রেণিকক্ষে পাঠের সুষ্ঠু পরিবেশ থাকে না এবং শিক্ষণ কর্মকাণ্ড যথেষ্ট বিঘ্নিত হয়। এক্ষেত্রে তিনি শিক্ষার্থীদের বকাঝকা না করে বা চেঁচামেচি না করে ধৈর্য সহকারে তাদের মনোযোগ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন। তিনি সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর চোখে দৃষ্টি রাখবেন। শিক্ষার্থীর মনোযোগ প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষক পাঠ কার্যক্রম শুরু করবেন। শিক্ষককে অধৈর্য হলে চলবে না। শাসন করলেও চলবে না। কারণ, এতে শিক্ষার্থীদের অনেকেই আর শ্রেণি কার্যক্রমে আনন্দ বা উৎসাহ পাবে না।

তদারকি বা মনিটরিং করা : শিক্ষার্থীরা যখন শিক্ষকের নির্দেশে কোনো একটি পাঠ কার্যক্রমে নিয়োজিত হবে শিক্ষক সে-টি তদারকি করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট সুযোগ দেবেন তারা যেন নিজে সে-টি চেষ্টা করে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ঘুরে ঘুরে দেখবেন সকল শিক্ষার্থী নির্দেশনা অনুযায়ী কাজটি করছে কি-না। এ সময় শিক্ষার্থীদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে শিক্ষক সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।

কোন একটি বিষয় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করতে দেয়ার সময় শিক্ষক খেয়াল রাখবেন যেন অধিকাংশ শিক্ষার্থী যথা সময়ে কাজটি সম্পাদন করতে পারে। কর্মকাণ্ডটি শেষ হলে শিক্ষক ভুল ও শুদ্ধ উত্তরগুলো যথার্থভাবে উপস্থাপন করবেন। কাজ করতে করতে ঘণ্টা বেজে গেলে এবং শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর না জানতে পারলে ভবিষ্যতে আর এ জাতীয় কাজে মনোযোগী হবে না।

বোর্ডের ব্যবহার : শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে বোর্ডের ব্যবহার সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত পরিচিত বিষয়। অতীতে ব্লাক বোর্ড ও চক ব্যবহার করা হতো। এখন শহরের ভাল স্কুল কলেজগুলোতে 'হোয়াইট বোর্ড' ও 'মার্কার কলম' ব্যবহৃত হয়। বোর্ডের ডানদিকের কোণায় শিক্ষক তাঁর নামের সংক্ষেপ ও তারিখ লিখবেন। বোর্ডের উপরের অংশে মাঝামাঝি স্থানে বিষয়বস্তুর নাম লিখবেন। অধিকাংশ শিক্ষক বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে বোর্ডে লেখালেখির কাজটি করেন। কিন্তু দেখা যায় যে এতে শিক্ষার্থীদের বোর্ড দেখতে ও লিখতে যথেষ্ট সমস্যা হয়। পাশে অবস্থান নিয়ে বোর্ডে লিখলে শিক্ষার্থীদের তা অনুসরণ করতে সহজ হয়। কিছুটা পাশে দাঁড়িয়ে লিখলে আরো যে সুবিধা হয় তা হলো শিক্ষক একই সাথে পাশে চোখ ফিরিয়ে শিক্ষার্থীদের তার নজরে রাখতে পারছেন এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সাথে বিষয়বস্তু নিয়ে কিঞ্চিৎ মত বিনিময় করতে পারছেন। বোর্ড ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষককে খেয়াল করতে হবে যে তিনি সারা সময় জুড়ে শুধু বোর্ডে লেখালেখি করছেন না এবং তাঁকে এটিও খেয়াল রাখতে হবে যে তিনি যা লিখছেন শিক্ষার্থীরা তা তাদের খাতায় উঠিয়ে নিয়েছে। ক্লাস শেষে তিনি নিজে বোর্ড মুছে পরিষ্কার করে যাবেন।

শিক্ষার্থীদের নিজেকে ব্যক্ত করার সুযোগ প্রদান : একজন দক্ষ শিক্ষক নিজে সব কথা না বলে অনেক সময় শিক্ষার্থীকে ক্লাসে পাঠ্য বিষয়বস্তু নিয়ে প্রশ্ন করে তাদের মতামত বা ধারণা প্রকাশের সুযোগ করে দেবেন। অনেক শিক্ষার্থী একটি বিষয় সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখে। বিষয়বস্তু নিয়ে এ জাতীয় প্রশ্ন করে জানতে চেয়ে শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীরা কোন স্তরে আছে তা-ও জানতে পারেন। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিলে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের সক্রিয় হতে দেখা যায় ও মনোযোগ বেড়ে যায় এবং এ থেকে শিক্ষক নিজেও অনেক সময় বেশ লাভবান হন। তিনি নিজে কোনো একটি বিষয় ভিন্নভাবে জানার সুযোগ পান।

সজ্ঞা (Intuition) **:** একজন শিক্ষকের জন্য Intuitive ক্ষমতা থাকা অত্যন্ত জরুরি। এর দ্বারা তিনি শিক্ষার্থীকে সহজে বুঝতে পারেন। শিক্ষার্থীর মেধা ও মান বুঝার জন্য শিক্ষকের

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি থাকতে হবে। ক্লাসে পড়ানোর সময় প্রতিনিয়ত অজস্র বিষয় ও ঘটনা এসে উপস্থিত হয়। এর ভিতর থেকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষককে সঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ না করেই নিজস্ব প্রজ্ঞা ও মেধা দিয়ে কোন একটি বিষয়কে তড়িৎ অনুধাবনের ক্ষমতাকে সজ্ঞা (Intuition) বলে। যে শিক্ষকের মধ্যে এ গুণ যত বেশি আছে তিনি তত সফল শিক্ষক। এটি অর্জিত হয় অভিজ্ঞতা থেকে। প্রতিনিয়ত আমরা বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হই এবং তা আমাদের বিচার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামর্থ এনে দেয়। সাবলীলভাবে শ্রেণিকক্ষকে পাঠদান করতে হলে শিক্ষকের অনুভূতির এ বিশেষ গুণটি থাকতে হবে। পরিবেশ পরিস্থিতিকে বুঝাবার ক্ষমতা, অধ্যবসায় ও আন্তরিকতার সাহায্যে তা যেমন শেখা যায় তেমন উন্নতি ঘটানোও সম্ভব হয়।

শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম ব্যবহৃত হওয়ার কারণ সমূহ :

কতগুলো বিষয় আছে যা শিক্ষকের অজান্তে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকে ব্যাহত করে। যেমন :

ক) অধিক সময় জুড়ে শিক্ষকের কথা বলা : শিক্ষক শ্রেণিতে দীর্ঘ সময় কথা বললে শিক্ষার্থীর মনোযোগ বিঘ্নিত হয়। শিক্ষার্থীর নিজের চিন্তা ভাবনার জন্য সময় দরকার। পাঠের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করার জন্য শান্ত সময় দরকার।

খ) অস্পষ্ট নির্দেশনা : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের লেকচার অথবা নির্দেশনা হবে স্পষ্ট। অর্থাৎ শিক্ষক কি করাচ্ছেন বা শিক্ষার্থীরা কি করতে যাচ্ছে সেটি স্পষ্ট হতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে পাঠদান ব্যাহত হয় এবং অনেক সময় শ্রেণিকক্ষের শৃঙ্খলাও বিঘ্নিত হয়। অতএব শিক্ষককে স্পষ্টভাবে সঠিক নির্দেশনা দিতে হবে।

গ) অতি নম্রতা : শিক্ষক অনেক সময় বেশি সৌজন্য বা ভদ্রতা প্রদর্শন করেন। এ সৌজন্যের নিচে চাপা পড়ে যায় তার মূল পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠ নির্দেশনা। ফলে ক্লাস কার্যক্রম সুচারুভাবে এগোয় না এবং শ্রেণিকক্ষে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শিক্ষককে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশনা দিতে হবে। বলিষ্ঠ অবস্থানে থেকে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

ঘ) শিক্ষকের আত্মবিশ্বাসের অভাব : শিক্ষকের নিজের উপর, শিক্ষার্থীর উপর, তার পাঠদানের বিষয়স্তু বা কর্মকাণ্ডের উপর আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি থাকলে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় সমস্যা হয়। যদি পাঠদানের বিষয়বস্তু অতিরিক্ত কঠিন বা অতিরিক্ত সহজ হয়, তাহলে শিক্ষার্থীরা সে ক্লাসে খুব একঘেঁয়ে বোধ করবে। শ্রেণিকক্ষকে তিনি যে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন সে বিষয়ের উপর যথেষ্ট দখল থাকতে হবে - যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েই শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করতে হবে ও পাঠদান করতে হবে।

ঙ) ভালো শিক্ষার্থীদের অধিক মূল্যায়ন : অনেক শিক্ষক শুধু ভালো শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করেন। অর্থাৎ যারা তড়িৎ উত্তর দেয় তাদের গুরুত্ব দেয়ার ফলে পাঠদান কার্যক্রম দ্রুত গতিতে পরিচালিত হয়। এতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা শ্রেণি কার্যক্রমে মনোযোগী থাকে না। এমন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে শিক্ষকের উচিত হবে বিভিন্ন মানের শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে বুঝে নেয়া তারা শিক্ষকের লেকচার অনুসরণ করতে পারছে কি-না। অর্থাৎ সকল শিক্ষার্থীকে সমান গুরুত্ব দিয়ে শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম চালাতে হবে।

চ) সুসম্পর্ক সৃষ্টি : শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সম্পর্ক যত ভালো হবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও পাঠগ্রহণ তত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে। এ পরিবেশ ভালো না থাকলে শিক্ষণ কর্মকাণ্ডও নিম্নগামী হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য সেটি হবে নিছক সময়ের অপচয়। মনে রাখতে হবে যে একজন সফল শিক্ষকের তিনটি গুণ থাকা জরুরি। সেগুলো হচ্ছে নতুনত্ব, সম্মানবোধ ও সহমর্মিতা। একজন শিক্ষকের সচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তিনি শ্রেণিকক্ষের সমস্যাগুলো সনাক্ত করতে সক্ষম হন এবং সেগুলো সমাধানে কার্যকর বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে নিতে পারেন।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর আচরণ সন্তোষজনক না হলে অথবা শিক্ষার্থী পাঠে অমনোযোগিতা দেখালে অনেক শিক্ষক তাদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসেন। শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রটিতে একজন শিক্ষককে অত্যন্ত সর্তক হতে হবে। যখন একজন শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে শাস্তি প্রদান করেন তখন শিক্ষার্থী মনে কষ্ট পায় এবং শিক্ষার্থী সে ক্লাসটির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। আবার শিক্ষার্থীর আচরণগত দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড থেকে সরে যান। এতে অন্যান্য শিক্ষার্থীর মূল্যবান সময়ও নষ্ট হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে শিক্ষার্থীকে শাসন করতে গিয়ে শিক্ষক যে কড়াকড়ি মনোভাব পোষণ করেন সেটি শ্রেণিকক্ষের অন্যান্য শিক্ষার্থীর মনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে শিক্ষকের চরিত্রের কঠিন দিকগুলো অনেক শিক্ষার্থীর মনে খারাপভাবে দাগ কাটে

এবং স্থায়ীভাবে তারা ঐ শিক্ষক ও পাঠ্য বিষয়বস্তুর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। এক্ষেত্রে শিক্ষক যদি কাউকে শাস্তি দিতে চান, তিনি তাকে ক্লাস শেষে আলাদা ভাবে ডেকে নিয়ে সংশোধনীমূলক পরামর্শ দেবেন। একই সাথে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে স্কুল কলেজে শিক্ষার্থীকে প্রেরণ করা হয় পড়াশুনা শিখতে ও আচরণ শিখতে। আর শেখার এ কাজটি মানুষ সব সময়ই ভুল করতে করতেই সম্পন্ন করে। অতএব শিক্ষকের কাজ হবে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভুলগুলোকে আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সাথে শোধরিয়ে দেয়া।

শিক্ষক - শিক্ষার্থী সম্পর্কের মধ্যে নিহিত আছে শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ার সার্বিক সাফল্য লাভের বিষয়টি। শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের কাজটি শিক্ষাঙ্গনের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর ভেতরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্মিলিত অংশগ্রহণে সম্পাদিত হয়। বর্তমান সময়ে সকলের অনুভূতিতে এসেছে যে সফল শিক্ষকতা বলতে শুধু শিক্ষার্থীর আচরণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং যারা সবচেয়ে সফল শিক্ষক তারা শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনাকে শিক্ষার জন্য সহায়ক ও কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টি ও তা ধরে রাখার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখে থাকেন। শিক্ষক যদি শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় সফল হতে চান তা হলে তার মধ্যে অনেকগুলো গুণের সমাহার ঘটাতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী, অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দসহ সকলের প্রতি তার আন্তরিক ও শ্রদ্ধাশীল আচরণের বিষয়টি। শিক্ষার্থীদের সম্মুখে তিনি অন্য শিক্ষক বা কর্মচারী সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বললে শিক্ষার্থীদের আচার আচরণে তার প্রভাব পড়বে। এটা অবশ্যই একজন শিক্ষককে পরিহার করতে হবে। একইভাবে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্রেণিকক্ষের ভেতরে ও বাইরে একটি সুষ্ঠু পরিবেশ আনতে চায় সে প্রতিষ্ঠানের উচিত হবে শিক্ষকসহ অন্যান্যদের জন্য ভালো চাপমুক্ত, সুন্দর ও স্বচ্ছ পরিবেশ তৈরি করে দেয়া। এর অন্যথা হলে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষক কিছুটা হলেও বাধাপ্রাপ্ত হবেন। একজন শিক্ষক সমাজের একজন সদস্য। সামাজিক প্রেক্ষাপট অর্থাৎ যে সামাজিক পরিমণ্ডলে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবস্থিত তা দ্বারা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক কিছুটা হলেও প্রভাবিত হয়। সব কিছুকে বিবেচনায় রেখে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম সুচারুভাবে চালাতে হবে, সকলের প্রত্যাশাও তাই।

পরীক্ষা পদ্ধতি
প্রেক্ষিত: ঢাকা কমার্স কলেজ

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ
সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান করেন ও শিক্ষার্থী তা গ্রহণ করে। পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকগণের মেধা, বিষয় জ্ঞান, আচরণ, বাচনভঙ্গি, শব্দ চয়ন, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রচেষ্টা ও উপস্থাপনের কৌশলে ভিন্নতা থাকে। পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোযোগিতা, অনুধাবন ও প্রকাশ ক্ষমতায় পার্থক্য থাকে। পরীক্ষার মাধ্যমে এ পার্থক্যের মাত্রা যাচাই ও মূল্যায়ন করা হয়। মূলত: পরীক্ষা হচ্ছে পরীক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের শুদ্ধতার মাত্রা যাচাইকরণের একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াটি তিনটি ধাপে বিভক্ত। যথা:

১. পরীক্ষা গ্রহণ

২. উত্তরপত্র মূল্যায়ন

৩. ফলাফল প্রস্তুতকরণ ও সুপারিশ প্রদান

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে আজ পর্যন্ত ঢাকা কমার্স কলেজে উপরিউক্ত ৩ টি ধাপ বিশিষ্ট একটি মান সম্পন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি চালু আছে। পরিবর্তীত অবস্থার সাথে মিল রেখে এখানে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার, উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের ধারা চলমান রয়েছে। পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার সাথে কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষার্থী উপদেষ্টাগণ, বিভগীয় চেয়ারম্যানগণ, শিক্ষকমন্তলী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ সকলেই সংশ্লিষ্ট থাকেন। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য কলেজে একটি পৃথক পরীক্ষা শাখা রয়েছে। উক্ত শাখায় বর্তমানে একজন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, তিনজন পরীক্ষা সহকারী ও দু'জন পিওন কর্মরত আছে। প্রতি বছর শিক্ষকগণের মধ্য হতে অধ্যক্ষ কর্তৃক একজন আহ্বায়ক এবং এক বা একাধিক সদস্য

সমন্বয়ে একটি পরীক্ষার কমিটি গঠিত হয়। পরীক্ষা শাখা সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা এবং বহি:পরীক্ষা কার্যক্রম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুনিপুনভাবে পরিচালনা করে আসছে।

কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পূন:পূন: যাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের শুদ্ধতা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌছে দেয়া এবং বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তাদের উত্তম ফলাফল অর্জনে সাহায্য করা। এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তিন ধরনের পরীক্ষা নেয়া হয়। যেমন:

১. সাপ্তাহিক পরীক্ষা

২. মাসিক পরীক্ষা

৩. পর্ব পরীক্ষা

এখন আমি উপরিউক্ত প্রতিটি পরীক্ষার উদ্দেশ্য ও পরীক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া আলোচনা করছি।

সাপ্তাহিক পরীক্ষা

কোর্স শিক্ষকগণ এ পরীক্ষা গ্রহণ করেন। সাপ্তাহিক পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো:

- ক্স শ্রেণিতে পাঠদানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।
- ক্স পাঠদানকৃত বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষার্থীর অবস্থা যাচাই করা।
- ক্স উত্তরপত্রে যথাযথভাবে প্রশ্নোত্তর উপস্থাপন করতে শেখানো।

পরীক্ষা গ্রহণ: কোর্স শিক্ষক কর্তৃক সপ্তাহের একটি পূর্বনির্ধারিত দিনে উক্ত সপ্তাহের পাঠদানকৃত বিষয়বস্তুর উপর শ্রেণি কক্ষে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষার সময় কোর্স শিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত এবং পূর্ণমান ১০ নম্বর। এ পরীক্ষার জন্য উত্তরপত্র পরীক্ষার্থীরা নিয়ে আসে।

মাসিক পরীক্ষা

প্রতি মাসের শেষে শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ রেখে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখার মাধ্যমে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

মাসিক পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো:

- ক্স এক মাসে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকৃত সিলেবাসের উপর ফলাবর্তন;
- ক্স বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের সাথে পরিচিতকরণ;
- ক্স হাতের লেখার গতি বাড়ানো।

পরীক্ষা গ্রহণ: পরীক্ষা শুরু হওয়ার অন্তত এক সপ্তাহ পূর্বে শিক্ষার্থীদেরকে নোটিশের মাধ্যমে পরীক্ষার রুটিন সরবরাহ করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা হতে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সুনির্দিষ্ট তারিখে প্রশ্ন জমা দেয়ার জন্য লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়। বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ বিভাগের শিক্ষকের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা কতৃক সরবরাহকৃত নির্ধারিত কাগজে হাতে লেখা প্রশ্ন প্রণয়ন করে সিলগালাকৃত খামে জমা দেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখায় উক্ত প্রশ্ন কম্পোজ করার পর বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ প্রুফ দেখে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করেন। প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রুফ দেখাসহ সকল পর্যায়ে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। মাসিক পরীক্ষায়-

- ➢ কলেজ কতৃক নির্ধারিত উত্তরপত্র সরবরাহ করা হয়।
- ➢ প্রতি বিষয়ের পূর্ণমান ৩০ নম্বর এবং সময় ১ ঘন্টা।
- ➢ প্রশ্নসমূহ বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্য - রেখে প্রণয়ন করা হয়।
- ➢ এক দিনে ২ টি বিষয়ের পরীক্ষা নেয়া হয়।
- ➢ রোল নম্বরের উচ্চ ক্রমানুসারে সিট বসানো হয়।
- ➢ প্রতি ২০ জন- ২৫জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন করে
- \- শিক্ষককে কক্ষ প্রত্যবেক্ষকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। -প্রত্যবেক্ষকগণ যে সকল দায়িত্ব পালন করেন তা হল:

- ক্স পরীক্ষার ডিউটি রোস্টারে পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ১৫ মিনিট পূর্বে স্বাক্ষর করে উত্তরপত্র ও প্রশ্নপত্র বুঝে নেন এবং নির্ধারিত কক্ষের শিক্ষর্থীদের মাঝে উত্তরপত্র ও পরীক্ষার শুরুতে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করেন।
- ক্স পরীক্ষা সম্পর্কিত কোন নির্দেশিকা থাকলে তা

পরীক্ষার্থীদেরকে জ্ঞাত করেন।

ক্স উত্তপত্রের নির্ধারিত স্থানে শিক্ষার্থীর নাম, রোল নম্বর, শ্রেণি, বিষয়ের নাম ইত্যাদি সঠিকভাবে লিখেছে কিনা তা যাচাই করে উত্তপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং উপস্থিতি পত্রে পরীক্ষার্থীদের স্বক্ষর করান।

ক্স পরীক্ষার্থী উত্তরপত্রে যথাযথভাবে প্রশ্নোত্তর নম্বর লিখতে এবং প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর শেষে সমাপনী চিহ্ন দিতে বলেন।

ক্স প্রত্যবেক্ষকগণ এমনভাবে পরীক্ষার হলে ডিউটি করেন যাতে কোন শিক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ না পায়।

ক্স পরীক্ষা শাখা কতৃক সরবরাহকৃত টপসিট পূরণ করেন।

ক্স পরীক্ষা শেষে উত্তরপত্র সংগ্রহ করে রোল নম্বরের ক্রমানুসারে সাজিয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট উত্তরপত্র, টপসিট, উপস্থিতি পত্র, অব্যবহৃত উত্তরপত্র ও প্রশ্নপত্র জমা দেন এবং ডিউটি রোস্টারের নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত, অনুপস্থিত এবং মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা লিপিবদ্ধ করেন।

পর্ব পরীক্ষা

আমাদের কলেজে দু'ধরণের পর্ব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মোট ৫ টি পর্ব পরক্ষা নেয়া হয়। ১ম ও ৩য় পর্ব পরীক্ষার পূর্ণমান ৬০ এবং সময় ২ ঘন্টা। ২য়, ৪র্থ ও ৫ম পর্ব পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০ এবং সময় ৩ ঘন্টা। পর্ব পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো:

ক্স বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে প্রস্তুত করানো।

ক্স চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর শিখানো।

পরীক্ষা গ্রহণ: পর্ব পরীক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া অনেকটা মাসিক পরীক্ষার অনুরুপ। পার্থক্যগুলো হলো:

১। বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ ২ সেট প্রশ্ন মডারেশন করে জমা দেন।

২। পর্ব পরীক্ষায় প্রবেশপত্র প্রদান করা হয়।

৩। বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরুপ কভার পৃষ্ঠাসহ উত্তরপত্র সরবরাহ করা হয়।

উত্তরপত্র মূল্যায়ণ

তিন ধরণের পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া হচ্ছে:

সাপ্তাহিক পরীক্ষা: প্রশ্নোত্তরের মূল বিষয় সঠিক হলে অধিক নম্বর প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা হয়। প্রশ্নোত্তরের ক্রুটি নির্দেশপূর্বক মন্তব্য প্রদান প্রয়োজন। প্রাপ্ত নম্বর নম্বরপত্রে সংরক্ষণ করে উত্তরপত্র শিক্ষার্থীকে ফেরত দেয়া হয়।

মাসিক পরীক্ষা: মাসিক পরীক্ষার উত্তপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হয়:

১। প্রশ্ন অনুযায়ী যথাযথ উত্তর;

২। উত্তরপত্রে মার্জিন, প্রশ্নোত্তর নম্বর, গুরুত্বপূর্ণ অংশ পৃথকভাবে সনাক্তকরণ;

৩। ক্রুটি নির্দেশপূর্বক প্রয়োজনীয় মন্তব্য প্রদান;

৪। প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করে উত্তরপত্র পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে শিক্ষার্থীদেরকে দেখানো হয় এবং তাদের অভিভাবককে জ্ঞাত করানো হয়।

পর্ব পরীক্ষা: পর্ব পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ণে মাসিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের প্রক্রিয়া হতে বাড়তি দিকগুলো হলো:

১। নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুসরণ করা।

২। কভার পৃষ্ঠায় যথাস্থানে নম্বর পোস্টিং ও স্বাক্ষর প্রদান।

৩। সকল উত্তরপত্র নিরীক্ষা করে তার রিপোর্ট পরীক্ষা শাখায় জমাদান।

৪। পরীক্ষা কমিটির নির্দেশনা ব্যতীত উত্তরপত্র শিক্ষার্থীদেরকে দেখানো এবং প্রাপ্ত নম্বর জানানো হয় না।

ফলাফল প্রস্তুতকরণ ও সুপারিশ প্রদান

প্রতিটি পর্ব পরীক্ষার শেষে ফলাফল প্রস্তুত করা হয় পরীক্ষা শাখায়। যদি পর্ব পরীক্ষা ৬০ নম্বরের হয় তবে ফলাফল প্রস্তুত করা হয়- সাপ্তহিক পরীক্ষার ১০ নম্বর, মাসিক পরীক্ষর ৩০ নম্বর এবং পর্ব পরীক্ষার ৬০ নম্বরসহ ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে। যদি পর্ব পরীক্ষা ১০০ নম্বরের হয় তবে ফলাফল উক্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়। ফলাফল প্রস্তুতের সময় পরীক্ষা শাখার সংশ্লিষ্ট সকলকে যথেষ্ট সাবধানতার সাথে কাজটি করতে হয়। ফলাফল শিটে কৃতকার্য ও অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার, ২০ তম স্থান পর্যন্ত মেধা তালিকা, প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর মেধাক্রম, বিষয় ভিত্তিক ও বিষয়ের সংখ্যা ভিত্তিক অকৃতকার্যতা, অনুপস্থিত ও অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিত পরীক্ষার্থী ইত্যাদি নির্দেশ করে পরীক্ষা কমিটির আহবায়ক তা একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় উপস্থাপন করেন। সভার সকলের মতামতের ভিত্তিতে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়। একাডেমিক কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের অভিভাবক সভা আহবান করে পরবর্তী করণীয় জ্ঞাত করানো হয়। বর্তমানে পরীক্ষা শাখা অটোমেশনের আওতায় আসায় শিক্ষার্থীরা তাদের ফলাফল সহজে জানতে পারে।পর্ব পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের সেকশন পুন:নির্ধারণ করা হয়, ফলে একই মানের শিক্ষার্থীর একটি শ্রেণিকক্ষে অবস্থান করে এবং পাঠদান ও গ্রহণ কার্য সহজতর হয়।

সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সুবিন্যস্ত পরীক্ষা পদ্ধতি কলেজের উত্তম ফলাফল অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

ব্যক্তিত্ব, নৈতিকতা ও বিনোদন : প্রেক্ষিত ঢাকা কমার্স কলেজ

মোহাম্মদ আক্তার হোসেন

সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

ব্যক্তিত্ব: ব্যক্তিত্ব কী বা ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা কি বুঝি? কিসের ভিত্তিতে আমরা বলি উনার ব্যক্তিত্ব অনেক প্রখর আর উনার ব্যক্তিত্ব নেই? আসলে এটা কি পরিমাপের বিষয়? এটা কি তুলনা করা যায়? এক কথায় বলতে গেলে ব্যক্তিত্ব হচ্ছে অভিজ্ঞতার ঝুলি, আর এই ঝুলিতে রয়েছে–আমরা প্রতিনিয়ত যা বলি, যা করি, যা অনুভব করি, যা ভাবি, যা আশা করি, যা বিশ্বাস করি; সাথে রয়েছে চলার পথে আমরা কোনো পরিস্থিতিতে কী প্রতিক্রিয়া দেখাই সে সব কিছু। ব্যক্তিত্বের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে মানবিক সর্ম্পক বা হিউম্যান রিলেশন। মানবিক সর্ম্পকের উন্নয়ন ছাড়া ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন অসম্ভব।

আমাদের ব্যক্তিত্বের ওপর অন্যের কাছে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে। আর অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্যতার ওপর ব্যক্তি জীবনের সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে বিধায় ব্যক্তিত্ব নিয়ে যুগ যুগ ধরে মানুষের এতো চিন্তা-ভাবনা। জীবনের সফলতার ধাপগুলো দ্রুত পেরিয়ে যাওয়ার জন্যই ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং উন্নয়ন প্রয়োজন। আর এ কাজটি করতে হলে নিচের বিষয়গুলো একটু খেয়াল করতে হবে:

১। লক্ষ্য স্থির করা
২। নিজের সম্পর্কে উন্নত ধারণা সৃষ্টি করা
৩। সময়মতো কাজ করা
৪। ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করা ৫। সুন্দর বাচনভঙ্গিতে কথা বলা
৬। সঠিক পোশাক নির্বাচন করা
৭। আত্মবিশ্বাস বাড়ানো
৮। সামাজিকতা পালন করা

৯। ইতিবাচক চিন্তা করা
১০। পড়াশোনা করা
১১। কথা ও কাজের মধ্যে মিল রাখা
১২। অপরকে সহযোগিতা করা

আমরা সব সময় নিজেকে অন্যের চেয়ে বুদ্ধিমান, যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ হিসেবে তুলে ধরার জন্যে সচেষ্ট থাকি। কারণ বর্তমান যুগ হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ও প্রতিযোগিতার যুগ। নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে না পারলে অন্যদের থেকে পেছনে পড়ে যেতে হবে। এই প্রচেষ্টায় কখনও কখনও আমরা সফল হই, হাততালি পাই, ফুলের মালা পাই, আনন্দে আমাদের বুক ফুলে ওঠে, চেহারা উজ্জল হয়। কিন্তু রাতে যখন বিছানায় ঘুমুতে যাই, নিজেকে নিয়ে যখন একান্তে ভাবি তখন যে কেউ স্বীকার করবেন যে, আপনার নিজের ব্যক্তিত্ব উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এমন অনেক গুণ আছে যা আপনি কাজে লাগাননি, অনেক কৌশল রয়েছে যা আপনি আয়ত্ত করতে পারেন নি। মেধার অনেক ক্ষেত্রকে বিকশিত করতে পারেননি। এই চিন্তার ফলে আমরা প্রতিদিন বিকশিত হওয়ার চেষ্টা করি, পরিবর্তিত হই।

একজন শিক্ষক হিসেবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করা উচিৎ যা দেখে তারা শুদ্ধ হবে এবং প্রেরণা পাবে উন্নত চরিত্র গঠনের। দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বশীলতা কম বেশি সকলের আছে। তবে এ দায়িত্বটুকু আমি কতটুকু আন্তরিকতার সাথে পালন করছি তা বিবেচ্য বিষয়। আবার কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিত্ববান হবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নীতিগত দিক থেকে পরিশুদ্ধ না হন। শিক্ষকমাত্রই আদর্শের ধারক এবং বাহক। তিনি মনেপ্রাণে যা বিশ্বাস করেন, কর্মে তা পরিণত করেন। শুধু শিক্ষার্থী নয় সমাজের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী তার কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে এবং তাকে অনুসরণ করে। তাই একজন শিক্ষক কেবল ব্যক্তির না হয়ে সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের কাণ্ডারি রূপে পরিগণিত হন। শিক্ষক হবেন চিন্তায় ধীরস্থির এবং কর্মে পটু ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন। শিক্ষার্থীর অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে একজন শিক্ষক তার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষার্থীর ভাল-মন্দ, চারিত্রিক বিকাশের সহায়তা প্রদান ছাড়াও তার মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব একজন আদর্শ শিক্ষকের উপর ন্যস্ত থাকে। এভাবেই শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাছে হয়ে উঠেন একজন আদর্শ মানুষ।

নৈতিকতা: বর্তমান শতকে মানবজাতির সামগ্রিক জীবনে যে বিষয়টির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো নৈতিকতার যথাযথ প্রয়োগ। মূলত এর অভাবেই সামাজিক এবং মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পথ প্রসারিত হয়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল পর্যায়ে শিষ্টাচারমূলক মার্জিত আচরণ সবার কাম্য। মানবজীবনের প্রতিটি বাঁকে অজস্র বাধা-বিপত্তির মোকাবিলায় নৈতিকশক্তির বিকল্প অন্য কিছু আজও উপলব্ধি করা যায় নি। মানুষের প্রতিটি আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, তার ভেতরকার মনুষ্য রূপের প্রতিচ্ছবিকে প্রকাশ করে। স্বল্প পরিসরে মনে হলেও নৈতিকতার ব্যাপক প্রভাব মানবজাতির পুরো জীবনসমুদ্রে তরঙ্গাকৃতিতে বহমান।

নৈতিকতা একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের ব্যবহারিক জীবনে প্রতিফলিত হয়। নৈতিকতা নামক এই গুণটি এমনিতেই সৃষ্টি হয় না, এটি অর্জন করতে হয় এবং এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনা, আদর্শিক মূল্যবোধ এবং সৃজনশীল কর্মতৎপরতা বিকশিত হয়। একটি জাতির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য, কাঙ্ক্ষিত নৈতিকমানসম্পন্ন মানবসম্পদ গড়ে তুলতে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

সাধারণত কোনো সমাজের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত কল্যাণকর ও কাঙ্ক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী বিশ্বাস বা আদর্শকে মূল্যবোধ বলা হয়। মূল্যবোধকে একটি প্রত্যয় হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। এই প্রত্যয়ের উপাদান হচ্ছে নীতি, মান ও বিশ্বাস। এ সব উপাদান স্পষ্ট করে দেয়–ব্যক্তি, সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, ভাল-মন্দ, দোষ-গুণ, ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিকতা; এবং নৈতিক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে কাজের দিক নির্দেশনা। মূল্যবোধ শুধু পর্যবেক্ষণ বা সত্যের উক্তি নয়, এটি হচ্ছে অকৃত্রিম ও আপসহীন নীতি যা দৈনন্দিন আচরণে প্রতিফলিত হয়। সামাজিক আচরণের দিক দিয়ে কাম্য মূল্যবোধ হচ্ছে সুনাগরিকতা, দলগত বিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগ, দেশপ্রেম ইত্যাদি। ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনেও সত্যবাদিতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বন্ধুত্ব, কর্তব্যপরায়ণতার মতো সৎগুণাবলি অর্জন আবশ্যক। ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ব্যক্তির জীবনকে উন্নত মানে নিয়ে যায়। কোনো সমাজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি ধারণাগুলোর মুখ্য ও বৃহৎ অংশ হচ্ছে মূল্যবোধের সংগঠন। সামাজিক বিভিন্ন আচরণের ওপর ভিত্তি করে নানা স্তরের মূল্যবোধ তৈরি হয়। সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষাতত্ত্বের দিক দিয়ে শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ আহরণ গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার ও শিক্ষাঙ্গন শিক্ষার্থীকে সমাজ অনুমোদিত মূল্যবোধ কাঠামো আহরণ ও আয়ত্ত করতে সহায়তা করে।

নৈতিক শিক্ষা বলতে দীর্ঘদিনের আচার, আচরণ, বিশ্বাস ও

দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা শিক্ষাকে বোঝায়। নৈতিকতা জীবনাচরণেরই একটি অংশ। দীর্ঘ অনুশীলনের পর গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ায় সেই সব নীতি গ্রহণ করা হয় যেগুলো সঠিক, উচিত ও কাঙ্ক্ষিত। সে দিক থেকে বলতে গেলে নীতিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যে শিক্ষার আয়োজন করা হয় তাই নৈতিক শিক্ষা। মানব সভ্যতার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য নানা রকম সংস্কার, প্রথা, আচার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভক্ত হলেও কতকগুলো মৌলিক বোধ অনুশীলনে পুরো মানবজাতি অভিন্ন। এটি রক্ষা করার প্রয়াসে দেশে দেশে নানা রকম শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সত্য বলা, কথা রাখা, মানুষ ও পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীলতা, দেশপ্রেম, নৈতিকতা বোধ, দয়া, করুণা সহমর্মিতা, আত্মত্যাগ, শান্তি, মানবাধিকার, সংখ্যালঘুর অধিকার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দেশে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় নানারূপে মৌলিক মানবিক মূল্যবোধ শেখানোর ব্যবস্থা চালু আছে। সাধারণত এই প্রক্রিয়ায় এক প্রজন্ম তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কাঙ্ক্ষিত বোধ হস্তান্তর করে যায়। আর এভাবেই তৈরি হয় নৈতিকতা।

সুতরাং নীতিবিষয়ক যে শিক্ষা তাই নৈতিক শিক্ষা। সমাজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক মূল্যবোধ নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরের মানবিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নৈতিক শিক্ষা অপরিহার্য। নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর জীবনকে কোনো আদর্শের লক্ষ্যে পরিচালিত করে তার চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করে ব্যক্তি এবং সমাজজীবনে তা প্রতিষ্ঠা করা। নীতি শিক্ষাকে অনেকে সমর্থন দিতে অক্ষম হয়, কেন না যে কালোবাজারি করে, উৎকোচের জন্য হাত বাড়ায়, সে তার সন্তানের নৈতিক শিক্ষার ব্যাপারে স্বভাবতই উৎসাহী হতে পারে না। অনেকে নৈতিক শিক্ষা এবং ধর্ম শিক্ষাকে এক বলে মনে করেন। ফলে ধর্মশিক্ষা এবং নৈতিক শিক্ষা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার অনেকে ধর্ম শিক্ষাকে নৈতিক শিক্ষার বিকল্প হিসেবে চিন্তা করেন। সেটাও ঠিক নয়। নৈতিক শিক্ষা ব্যাপক, ধর্মশিক্ষা নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। নৈতিক শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে ইহজাগতিক। সমাজের প্রয়োজনে সমাজের ভেতর থেকেই নীতি এবং আদর্শ তৈরি হয় সমাজের আদর্শ মান রক্ষার্থে।

মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে আমরা দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু অন্ধকার বাস্তবতা দেখতে পাই। দুর্নীতি সমাজের প্রতিটি স্তরের শিরা-উপশিরায় বয়ে চলছে। সহিংসতা, সন্ত্রাস, খুন, ডাকাতি, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি আজ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধনী-গরিবের মধ্যে বৈষম্য অনেকটাই বেড়ে গেছে। সম্পদ, ক্ষমতো ও দায়িত্বের অসম বণ্টন খুবই লজ্জাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। আমরা এমনতরো পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ চাই। এ জন্য প্রয়োজন মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা।

মানবসমাজে প্রাচীনকাল থেকেই নৈতিকতার ধারণা রয়েছে। বস্তুত মানুষ একটি নৈতিক প্রাণী। মানুষকে নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। নৈতিক জবাবদিহিতা মানুষের বৈশিষ্ট্য। মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য প্রধানত নৈতিক। জৈবিক বিষয়টি মানুষসহ সব জীবেরই রয়েছে কিন্তু নৈতিক দিক শুধু মানুষেরই আছে। এ দিক দিয়ে মানুষ অনন্য। সব সমাজে ও সব ধর্মে নৈতিকতার গুরুত্ব স্বীকৃত। নৈতিকতার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বের দাবিদার একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যবস্থা যদি নৈতিকতার উন্নয়নের সহায়ক না হয় তা হলে সে শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতির সত্যিকার কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। নৈতিকতা আমাদের শেখায়–মানুষ স্বজাতি বহির্ভূত অন্যদের সাথে কিভাবে আচরণ করে তার নির্যাস ও রূপরেখা। অন্যদের সাথে পারস্পরিক কল্যাণ, প্রবৃদ্ধি, সৃজনশীলতার উন্নয়নে কিভাবে মানুষ আচরণ করে এবং কিভাবে মন্দের পরিবর্তে ভালো, ভুলের পরিবর্তে শুদ্ধতার জন্য প্রয়াস চালায় নৈতিকতা তারই নির্দেশনা দেয়।

নৈতিকতার কতগুলো মূল্যবান দিক

১। সামাজিক মূল্যবোধ: একজন শিক্ষক মানুষ হিসেবে সমাজের অভ্যন্তরের বাসিন্দা। কেবল পাঠদানই একজন শিক্ষকের মূল দায়িত্ব নয়। সমাজ এবং জাতি গঠনে তাঁর সুচিন্তিত মতামতের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, জাতীয় দিবস উদযাপন, বিভিন্ন সেমিনারে বক্তৃতা প্রদান, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষক তার মতামতকে উপস্থাপন করতে পারেন।

২। সামজিক দায়বদ্ধতা: সমাজের অনেক কাজের বাধ্যবাধকতা এবং উপলব্ধি নিজের মধ্যে থাকতে হবে। যেমন-আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন এবং সন্তানদের ব্যাপারে তাকে সচেতন ভূমিকা রাখতে হবে। অন্যের সাথে আর্থিক লেনদেন-এ তাকে স্বচ্ছ হতে হবে। একজন শিক্ষকের সাধ্যমতো আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের প্রতি সহযোগী মনোভাব থাকতে হবে। বাংলাদেশে ডাচ বাংলা ব্যাংক লি. প্রতিবছর সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ১০২ কোটি টাকা দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের মাঝে বৃত্তি প্রদান করে। কলেজের অনেক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিনা পয়সায় পড়ান এবং বই বিতরণ করে। এটাও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ।

৩। মানবিক মূল্যবোধ: মানুষের জীবনের প্রধান সাধনা হলো

মানুষের মতো মানুষ হওয়া। শিক্ষার্থীর সাথে মানবীয় গুণাবলি বিকাশে শিক্ষকের অবদান অপরিসীম। মানবীয় গুণ বলতে মমত্ববোধ, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, অপরের দুঃখকে উপলব্ধি করার মানসিকতা এবং সকল স্তরের মানুষকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বিভাজন না করে সমানভাবে ভালবাসাকে বুঝায়। এক কথায় মানুষ হিসেবে মানুষকে মূল্যায়ন করার নামই হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধ।

৪। ধর্মীয় মূল্যবোধ: ভাল কাজের পুরস্কার এবং খারাপ কাজের শাস্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে মানুষ অনেক খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে এবং ভাল কাজের দিকে ধাবিত হতে পারে। ধর্মীয় মূল্যবোধ একজন মানুষকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামে নৈতিকতা বুঝাতে সাধারণত সুন্দর চরিত্রকে বুঝানো হয়। সুন্দর চরিত্র বলতে আদব-কায়দা তথা নম্রতা-ভদ্রতা-শিষ্টাচার এবং নিজের ও পরিবারের সদস্যদের এবং সমাজ-সম্প্রদায়ের অন্যান্যদের সাথে কোনো ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থান সাপেক্ষে শৃঙ্খলা ও নিয়মসিদ্ধ আচরণকে বুঝায়।

কোরআনে বলা আছে : তুমি আল্লাকে ভয় করো কেন না তা তোমার সব কিছুকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেবে। এর অর্থ হচ্ছে একজন ব্যক্তি কোনো সামাজিক চাপে পড়ে বা ব্যক্তিগত সমষ্টিগত কোনো স্বার্থের কারণে নয় অথবা কোনো পার্থিব ভয় বা প্রলোভনের কারণে নয় বরং একমাত্র তার স্রষ্টাকে ভয় করে এবং তার সন্তোষ বিধানের লক্ষ্যেই সে তার সমস্ত ভালো কাজ সম্পাদন করবে। সমস্ত অন্যায় ও মন্দ থেকে বিরত থাকবে। এটাই ইসলামের সৌন্দর্য।

৫। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ: একজন মানুষের স্বাজাত্যবোধ, নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা তাকে বড় মানুষে পরিণত করে। শিক্ষকমাত্রই স্ব-জাতি সেবক, নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির ধারক। শিক্ষা সে সংস্কৃতির বাহনমাত্র। সংস্কৃতিবান না হলে তাকে আদর্শ মানুষ বলা যায় না । অবশ্যই সে সংস্কৃতি হবে শুদ্ধ ও রুচিশীল।

৬। দেশাত্মবোধ : স্বদেশপ্রীতি বা স্বদেশপ্রেম না থাকলে তাকে মানুষ বলা যায় না। শিক্ষক নিজে একজন দেশপ্রেমিক, শিক্ষার্থীকে তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। প্রকৃত অর্থে যিনি দেশপ্রেমিক তিনি কখনও অন্যের সম্পদ চুরি করতে পারে না, দুর্নীতি করতে পারে না। দেশপ্রেম মানবপ্রেমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দেশকে ভালোবাসার অর্থ হলো দেশের মানুষকে ভালোবাসা। সুতরাং দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত মানুষ কখনও কাউকে কষ্ট দিতে পারে না, কারো ক্ষতি করতে পারে না। একই সাথে তিনি অন্যায়কে প্রতিহত করতে বদ্ধপরিকর। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার মতো কোনো কাজ তিনি করবেন না । তার এই দেশজ চেতনা পরবর্তী প্রজন্মকে দেশপ্রেমিক করে গড়ে তোলে। দেশপ্রেমের আরো একটি বড় জায়গা হলো পরিবেশ সচেতনতা। একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে মানুষকে ভালোবাসার পাশাপাশি প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি মমত্ববোধ শেখাবেন। কিভাবে পরিবেশ সুন্দর রাখতে হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়, কিভাবে গাছপালার পরিচর্যা করতে হয়, কিভাবে জাতীয় সম্পদ রক্ষা করতে হয়। যে কোনো ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখা ও জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধও দেশেপ্রেমের বিশেষ অঙ্গ।

নৈতিকতার অন্যান্য অংশ হিসেবে উলেখ করা যেতে পারে অসৎ সঙ্গ ও বাজে নেশা যেমন মাদক দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকার প্রক্রিয়া। এ সব বিষয়ে শিক্ষক যেমন-সচেতন থাকবেন শিক্ষার্থীদেরকেও সচেতন করবেন। কারণ এ বিষয়গুলো সামাজিক অস্থিরতা তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। কোনো শিক্ষার্থী যদি শিক্ষককে ধূমপান করতে দেখে তখন সে উৎসাহিত হয়। আমরা কেন তাকে অনুশাসনে আবদ্ধ করে তার কাছ থেকে ভালো কিছু প্রত্যাশা করি? ঢাকা কমার্স কলেজ রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত। কোনো শিক্ষার্থীকে ধূমপানরত দেখলে তাকে টি.সি. দেয়া হয়। স্বভাবতই শিক্ষার্থীর মনে প্রশ্ন জাগে এ আইন কি কেবল শিক্ষার্থীর বেলায় প্রযোজ্য। কোনো শিক্ষককে একই কারণে কিন্তু বরখাস্ত করা হয় না। আমরা যা মানি না তা অন্যকে মানতে বলা অনৈতিকতার শামিল। **ঢাকা কমার্স কলেজের ভর্তি এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকে যে ‘ধূমপায়ীদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই’। কথাটি যখন কেবল কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ তখন নৈতিকতার কতখানি চর্চা থাকে তা বিবেচ্য বিষয়।**

একটি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব কিছু নিয়ম নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। নিয়ম ও শৃঙ্খলার ওপরই মূলত প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সফলতা নির্ভর করে। ঢাকা কমার্স কলেজ বিগত পঁচিশ বছরে সেই নিয়ম পালনে যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাার অন্যতম হলো সময় মতো ক্লাসে উপস্থিত হওয়া, নির্দিষ্ট ক্লোর্স সম্পন্ন করা, সঠিকভাবে খাতা মূল্যায়ন ও নিরীক্ষণ করা, পরীক্ষার ডিউটি যথাযথভাবে পালন করা, প্রশ্নপত্র প্রণয়নে স্বচ্ছতা, নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি অনুসরণ, কলেজের বাৎসরিক বিভিন্ন কমিটির দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা এ সব কিছুই ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকগণের অভ্যাসগত বিষয়। তবে এ ধারার ব্যতিক্রম হলে কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে সন্দেহ নেই। অনেক সময় দেখা যায় যারা কোচিং বা প্রাইভেট পড়ান তারা প্রশ্ন প্রণয়নের সাথেও জড়িত থাকেন। তিনি তার শিক্ষার্থীদের যে সব সাজেশান দেন সেখান থেকে প্রশ্ন কমন

পড়ে যায়। বিষয়টি কতখানি নৈতিকতার দাবি রাখে তা বিবেচ্য। কলেজের নিয়মানুসারে হাতেলেখা প্রশ্ন জমা দিতে হয়। কিন্তু অনেকেই নিজস্ব কম্পিউটারে প্রশ্ন কম্পোজ করে জমা দেন। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন মডারেশনের সুযোগ থাকে না। সুতরাং বিষয়টি পরিহার্য কি না ভেবে দেখার বিষয়। কলেজে প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ তাদের সুচিন্তিত মতোামতো ও সুপরামর্শের মধ্য দিয়ে কলেজটিকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

বিনোদনঃ শিক্ষার্থীর মনোবিকাশে বিনোদন একটি অপরিহার্য উপাদান। শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম তথা খেলাধুলা, ভ্রমণ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ক্লাব কার্যক্রম, জাতীয় দিবস উদযাপন, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, এ সব কিছুই একজন শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। খেলাধুলা একজন শিক্ষার্থীকে পরিশ্রমী হতে সাহায্য করে, পড়াশোনার ক্ষেত্রে তার শারীরিক শক্তি পৃদ্ধি পায়। একই সাথে সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কার্যক্রম শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কেবল পড়াশোনা একজন শিক্ষার্থীর জন্য একঘেয়েমির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং তাদের জন্য বিনোদন তথা বিভিন্ন ভ্রমণ, খেলার মাঠ এবং সাংস্কৃতিক চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ উলেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা ও সেই অনুপাতে পৃষ্ঠপোষকতা করা প্রয়োজন। শুধু ভালো ফল অর্জনের ওপর একটি প্রতিষ্ঠানের সুনাম নির্ভর করে না, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সফলতা দেশে ও বিদেশে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সুপরিচিত করে তোলে। বর্তমান শিক্ষা কমিশনে মাধ্যমিক পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলা বিষয়ে ১০০ নম্বরের একটি বাধ্যতামূলক কোর্স চালু আছে। অতএব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা রাষ্ট্রের জন্য খেলাধুলা ও বিনোদন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে নাট্যক্লাব, নৃত্যক্লাব, সংগীতকাব, আবৃত্তি ক্লাব, বিতর্ক ক্লাব, আর্টস ফটোগ্রাফি সোসাইটি, রিডার্স এন্ড রাইটার্স ক্লাব, রোটার‌্যাক্ট ক্লাব, সাধারণজ্ঞান ক্লাব ইত্যাদি ক্লাব রয়েছে। তাছাড়া অনার্স বিভাগের শিক্ষার্থীরা নিজেদের উদ্যোগে কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে ডিপিএল নামে ক্রিকেট ও ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করে। এখানে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা থাকে। বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও শিক্ষকমন্ডলী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে থাকে। তবে এখানকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের রয়েছে পরিধিস্বল্পতা। ঢাকা কমার্স কলেজের সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে আরো প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। ক্লাব কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে, দেশীয় সংস্কৃতি বিকাশে এগিয়ে আসতে হবে। ইন্টারনেট ও ফেইসবুক ব্যবহারে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন। তবে শ্রেণিকক্ষে বিনোদনের অংশ হিসেবে এমন কোনো কাজ করা উচিত নয় যাতে পাশের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে অসুবিধা হয়। তা ছাড়া শ্রেণিকক্ষে অন্যান্য আলোচনার চেয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়ে অধিকতর আলোচনা আবশ্যক। ভ্রমণ জাতীয় বিনোদনের ক্ষেত্রেও শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং সহকর্মীর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন। এতে করে উক্ত শিক্ষক একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবেই বিবেচিত হবেন এবং ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি হবে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষক উন্নত হলে শিক্ষার্থী উন্নত হবে; শিক্ষার্থী উন্নত হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা জাতি ও দেশ উন্নত হবে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও নৈতিকতা বিকাশে শিক্ষককে হতে হবে প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও নীতিবান; একই সাথে সংস্কৃতিবান। একজন সংস্কৃতিবান শিক্ষকই পারেন একটি সংস্কৃতিবান জাতি গঠন করতে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, ঢাকা কমার্স কলেজও একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আরো উন্নত হবে।

অপরাহ্ণের সৃষ্টি

মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

মানুষ স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। স্বপ্ন আছে বলেই শত বিপদে হিমালয় কাঁধে করে পথ চলতে পারে সহজ পথে। বট বৃক্ষ তার সকল ডালপালা দিয়ে মানুষকে ছায়া দেয়। নিজেকে শেষ করে অন্যের ব্যবহারে লাগে কিন্তু বিনিময়ে কিছুই চায় না। মনে হয় সমাজের উপকারের জন্য তাঁর জন্ম। এতো প্রকৃতির দেয়া অবদানের কথা বললাম। সৃষ্টিকর্তা তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ বানিয়েছেন এ মানুষেরা নিজের কথা, বয়স, সংসার, সুখ না ভেবে সমাজের দেশের গ্রামের বা জন্মভূমির জন্য নিজের সবটুকু বিলিয়ে দিতে চান। এরকম মানুষ সমাজে পাওয়া কষ্ট সাধ্য। আমার লেখার বিষয় তেমনি একজন অসাধারণ মানুষের অপরাহ্ণের সৃষ্টি নিয়ে।

মানুষটি হলেন আমাদের প্রিয় প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী। ছাত্র-ছাত্রী এবং সচেতন সকল মানুষের কৌতুহল ও জানার আগ্রহ– তিনি বর্তমানে কি করছেন? কিভাবে সময় কাটাচ্ছেন তার?

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্লাম ফারুকীর জন্ম ১৯৪৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর থানার পশ্চিম রাখালিয়া গ্রামের কাজী বাড়ি। পিতা- মরহুম কাজী নুর মোহাম্মদ ও মাতা জয়নব বানু। কাজী মাসুমা খাতুন, কাজী জমিলা খাতুন, কাজী ফারুকী, কাজী মাহফুজা ও কাজী মফিজুল ইসলাম এই পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়।

ব্যক্তি জীবনে স্বনামধন্য কাজী ফারুকী চার সন্তানের জনক। সন্তানদের মধ্যে কাজী সালমা বিনতে ফারুকী পেশায় ডাক্তার ও তার স্বামীও ডাক্তার। কাজী নুর-উল ফেরদৌস রবি পেশায় ডাক্তার, তার স্ত্রী ডা. রিফাত রশিদ। কাজী সায়মা বিনতে ফারুকী পেশায় অধ্যাপনা, স্বামী চাকুরীজীবি। কাজী নাঈমা বিনতে ফারুকী পেশায় অধ্যাপনা, স্বামী ব্যাংকার (এফসিএ)। অধ্যাপক কাজী শামছুন নাহার ফারুকী তাদের গর্বিত মা। যিনি লালমাটিয়া মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন।

স্কুল শিক্ষা গ্রামের রাখালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, দালাল বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে। কলেজ শিক্ষা চট্টগ্রাম গভঃ কমার্স কলেজ হতে অনার্স এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম কম, ডিগ্রী অর্জন করেন। বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার পেয়ে কর্ম জীবন শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের টি এন্ড টি কলেজ থেকে কর্মজীবন শুরু করে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। অবশেষে ঢাকা কলেজ হতে অবসর নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন ঢাকা কমার্স কলেজ।

আসলে পৃথিবীর সব মানুষ এক নয়। কিছু মানুষ আছে, যারা নতুন কিছু করার তাড়নায় ভাবেন। সমাজের মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করেন। এমনি একজন কাজ পাগল মানুষ হলেন কাজী ফারুকী স্যার। কমার্স কলেজ থেকে ২০১০ সালে কর্মজীবন শেষ করেও বসে নেই এই মানুষটি। ক্লান্ত সময়ের এই দিনগুলোতে, স্ব-উদ্দ্যোগে লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর থানার নিজ গ্রাম রাখালিয়ার বিভিন্ন সেবামূলক কাজে যোগ দেন। প্রমাণ করেন তিনি ফুরিয়ে যান নি। দেশকে আরো অনেক কিছু দিতে চান এবং দিয়েই যাচ্ছেন।

বায়তুল মামুর কমপ্লেক্স ও ঈদগাহ :

প্রিয় ফারুকী স্যার গ্রামের বাড়িতে আসলে যে ঘরটিতে থাকতেন তা হলো চারপাশে দেয়াল উপরে টিন। প্রচন্ড ঠান্ডা তাকে অনেক কষ্ট দিতো। শোবার ঘরটিতে একটি খাট। তা আবার বাড়িতে আসার আগে খাটের পায়া, ডাসা ইত্যাদি মেরামত করা হতো। বললাম, স্যার একটি বাড়ি তৈরি করেন। আপনার থাকার অনেক কষ্ট হয়। বললেন, “আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে কথা দিয়েছি - তাঁর ঘর না করে আমার ঘর বানাবো না”। অতি আদরের নাতি কাজী মো: রাফিধ নূর ফেরদৌস (ফাইয়াজ) এর কথা, দাদু একটি মসজিদ বানাও। আল্লাহ দাদা ও নাতি উভয়ের কথা কবুল করেছেন। অবশেষে

ঈদগাহ মাঠ সহ মসজিদে বায়তুল মামুর কমপ্লেক্স বানানো হয়েছে। যেখানে জমির পরিমাণ ৪০ শতাংশ। ২১ মে ২০১০ শুক্রবার, কাজ শুরু হয়ে ৩১ ডিসেম্বর ২০১০ শেষ হয়। যা অত্র এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষের এবাদত পালনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে।

প্রিন্সিপ্যাল কাজী ফারুকী স্কুল ও কলেজ :

সাত বছরের প্রিয় নাতি ফাইয়াজ প্রতি সপ্তাহে গ্রামে যাবে এবং শনিবারে চলে আসবে তার নাকি গ্রামে অনেক কাজ। স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, ইত্যাদি বানাতে হবে। যদিও স্যারের বহু দিনের স্বপ্ন গ্রামের বাড়িতে কিছু একটা অন্তত করা। একবার চরমোহনা উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ করেছেন। স্থানীয় অব্যবস্থাপনার কারণে তা নষ্ট হয়ে যায়। নাতি ফাইয়াজ এর মনের কথা এবং কাজ পাগল কাজী ফারুকী দেশে স্কুল, কলেজ ইত্যাদি করার কথা ভাবতে থাকেন। ঢাকা কমার্স কলেজের কয়েকজন শিক্ষককে বাসায় ডাকলেন। তার চিন্তার কথা বললেন। এক বাক্যে উপস্থিত সবাই না বললেন। আপনার সেই বয়স নেই। মসজিদ করা আর স্কুল কলেজ করা এককথা নয়। তিনি ছেলে, ছেলের বউ, মেয়ে, মেয়ের জামাই সকলের সাথে পরামর্শ করলেন। বৈঠক করলেন। সবাই তাঁর শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে, না-ই করলেন। একরোখা এই মানুষটি কারো কথা শুনার পাত্র নয়। যেটা বলেন, সেটাই করেন। গ্রামের প্রতিবেশী মিজান ও করিমকে ফোন করে বললেন, বাগানের সকল গাছ কেটে ফেলতে [বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল কাজী ফারুকী স্কুল ও কলেজের চারপাশে অনেক আম, জাম, কাঁঠাল, সুপারি ও নারিকেল গাছ ছিল] আর বর্তমান কলেজের দক্ষিণ পূর্ব কোনে একটি জলাশয় ছিল তা মালিকের কাছ থেকে কেনার ব্যবস্থা করতে।

স্কুল কলেজ এর বিষয়টি নিয়ে স্যার ঘুমাতে পারে না। কিভাবে করবেন সেই চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন সারাক্ষণ। প্রিয় সহধর্মীনি বললেন, অনেক টাকা লাগবে। কোথায় পাবো এত টাকা? প্রিয় স্যার কারো কাছে ভিক্ষা করার লোক নয়। নিজেদের রিটায়ারমেন্টের সকল ডিপোজিট ভাঙ্গালেন। বাংলা বাজারের বইয়ের দোকানঘর বিক্রি করলেন। স্যারের সাথে গ্রামে যাওয়ার সঙ্গী হলাম এবং অনেক কষ্টে অসুস্থ স্যারকে নিয়ে গ্রামে পৌঁছালাম। স্যার গ্রামের গণ্যমাণ্য ব্যাক্তিদের সাথে আলাপ আলোচনা করলেন। সবাইকে নিয়ে স্কুল এন্ড কলেজের সাইনবোর্ড উত্তোলন ও দোয়া করলেন। যে বাগানটির পাশ দিয়ে যাবার সময় ভয় পেতাম, প্রায় দৌড় দিয়ে পার হতাম, সেখানে দেখি বিশাল মাঠ। মাঠের পশ্চিম কোনায় ১৪ এপ্রিল ২০১০ তারিখে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে প্রফেসর কাজী ফারুকী স্যার, প্রিন্সিপাল কাজী ফারুকী স্কুল এন্ড কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন– প্রায় ১০০ শতক জমির উপর। মাটি পরীক্ষা, স্কুল-কলেজ ভবন তৈরির নক্সা– সব কাজ চলছে সমান তালে। রড, সিমেন্ট, বালি, ইট আনা শুরু হলো। স্যারের তহবিল শেষ। ঢাকায় আসলেন কোন উপায় না পেয়ে। নিজের ধানমন্ডি ৫/এ রোডের ফ্ল্যাটটি বন্ধক রেখে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক মিরপুর শাখা হতে ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ নিলেন। তাতেও হলো না। অবশেষে ফ্ল্যাটটি বিক্রি করে দিলেন। সকল টাকা দেশে পাঠালেন। পূর্ণদমে কাজ শুরু হলো। নির্মিত হলো স্কুল ও কলেজ বিল্ডিং। স্যারের বোন কাজী মাসুমা খাতুন ১.৫ শতাংশ, কাজী জমিলা খাতুন ৩ শতাংশ, কাজী মাহফুজা খাতুন ১.৫ শতাংশ, একমাত্র ভাই কাজী মফিজুল ইসলাম ১.৫ শতাংশ, চাচা কাজী জয়নাল আবেদীন প্রায় ১ শতাংশ এবং চাচাতো ভাই কাজী বদিউজ্জামান ১ শতাংশ জমি দান করে স্যারের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। জমি দানকৃত জীবিতদের সুস্থাস্থ্য এবং মৃতদের বেহেশত কামনা করি– আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট। অধ্যক্ষসহ একঝাঁক তরুণ শিক্ষক, শিক্ষিকা নিয়োগ দিলেন। ১লা জানুয়ারি ২০১১ প্রিন্সিপাল কাজী ফারুকী স্কুল এন্ড কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হলো। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা বাড়তে লাগলো। পশ্চিম রাখালিয়া কাজী বাড়ি এখন লক্ষ্মীপুর জেলার অসম্ভব ব্যস্ততম জায়গায় উপনীত হলো। ২০১৩/১৪ সালে অষ্টম শ্রেণি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ফলাফলে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে এটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে।

শহীদ কাজী হাসানুজ্জামান হেফজখানা :

মরহুম কাজী হাসানুজ্জামান কাজী ফারুকী স্যারের চাচা। ব্রিটিশ জাহাজে তিনি চাকুরি করতেন। ১৯৪৫ সালে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীর বোমার আঘাতে জাহাজ ডুবে যাবার সময় অন্যদের সংগে তিনিও লাইফ বোটে উঠেন। কিন্তু ডুবন্ত জাহাজ হতে কোরআন শরীফ আনতে গিয়ে আর ফিরে আসতে

পারেননি। প্রিয় ফারুকী স্যার চাচার নামে শহীদ কাজী হাসানুজ্জামান হেফজখানা ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত হেফজখানায় নিয়মিত কোরআন তিলওয়াত হচ্ছে এবং এলাকার অনেক মানুষ তাঁদের সন্তানদের কোরআনের আলোকে আলোকিত করছে। আমরা কাজী হাসানুজ্জামানের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

কে. এফ. এস. সি শিশুকানন :

মসজিদ, মক্তব, হেফজখানা, স্কুল, কলেজ সবই করলেন। তারপরেও মনে হলো কিছু একটা বাদ আছে। কোমলমতি শিশুদের কথা মাথায় রেখে শিশুশিক্ষার একটি আদর্শ বিদ্যালয় তৈরির চিন্তা মাথায় নিলেন। যেই কথা, সেই কাজ। অবশেষে প্লে গ্রুপ হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত একটি আদর্শ শিশুকানন তৈরি করলেন– ১ জানুয়ারি ২০১৪। কে এফ. এস. সি শিশুকাননের সকল শ্রেণিতে ক্লাস চলছে। অত্র এলাকায় শিশুদের আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব দূর হয়েছে।

প্রফেসর কাজী শামছুন নাহার ফারুকী। শিক্ষকতার পেশায় ছিলেন লালমাটিয়া মহিলা কলেজে। চাকুরী হতে অবসর নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু দেশে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরীর চিন্তা হতে অবসর নিতে পারেন নি। ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পোষ্টার লাগানোর ময়দা বানানো, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আপ্যায়ন থেকে অমানবিক পরিশ্রম, এমনকি প্রিয় স্বামীকে খুব কাছে থেকেও না পাওয়া এবং ছেলে, মেয়েদের একাই মানুষ করার দায়িত্ব নেওয়া। যাতে প্রিয় কাজী ফারুকী স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন, তাঁর দানে আজ ঢাকা কমার্স কলেজ ও BUBT সারা বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছে। ভেবেছেন ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ প্রিয় স্বামী অবসর গ্রহণ করেছেন– বেশ ভালো। কাছ থেকে খেদমত করা যাবে। কিন্তু না আবার শুরু হলো কঠিন চ্যালেঞ্জ– গ্রামের বাড়িতে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, হেফজখানা, মক্তব, শিশুকানন তৈরি করা। মহান সৃষ্টি কর্তার নিকট আকুল আবেদন 'হে আল্লাহ, প্রিয় ফারুকী স্যারকে ও কাজী শামছুন নাহার ফারুকীকে সুস্থ, সবল রাখো– মনে প্রাণে এবং তাঁদের নেক হায়াৎ বাড়িয়ে দাও– সমাজের জ্ঞানের আলো গতিময় রাখার জন্যে'।

ফারুকী স্যারের পূর্বের বাড়িটি প্রিয় বাবার নামে 'নূর মহল' ছিল। মসজিদে বায়তুল মামুর কমপ্লেক্স নির্মাণের পর পূর্বের বাড়িটি সংস্কার করে বসবাসের জন্য নিজের এবং অতিথিদের ডাক বাংলো করা হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! ফারুকী স্যারের অপরাহ্নের সৃষ্টির বিশালতাকে এই ক্ষুদ্র পরিসরে উপস্থাপন করা যাবে না। আমার জ্ঞানের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। হয়তো উপযুক্তভাবে উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছি। আশা করি বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। প্রার্থনা করি, আল্লাহ যেন প্রিয় ফারুকী স্যারকে সু-স্বাস্থ্য দেন– শিক্ষার আলো সমাজের সকল স্তরে পৌছানোর জন্য।

---o---

বাবা
আলবেয়ার কামু

অনুবাদঃ মনসুর আলম
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

চলিশ বছর পার হয়ে গেছে। সেইন্ট ব্রিউক ট্রেনের করিডোরে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। অননুমোদনের চাহনি নিয়ে সে বসন্ত বিকেলের ফ্যাকাশে আলোয় প্যারিস থেকে চ্যানেল পর্যন্ত বিস্তৃত সমতল আবদ্ধ পলী এলাকার গ্রাম-গঞ্জ আর কুৎসিত বাড়িঘরগুলোর পেছনের দিকে ধাবিত হওয়া দেখছে। তার দৃষ্টির সামনে দিয়ে পালাক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে তৃণভূমি আর শত শত বছর ধরে প্রতি ইঞ্চি কর্ষিত হয়ে আসা আবাদি জমি। ছোট করে ছাঁটা চুলের খালি মাথা, লম্বা মুখাবয়বের কোমল চেহারার লোকটার নীল চোখের দৃষ্টি সোজাসাপটা। মাঝারি উচ্চতার লোকটার বয়স চলিশ হলেও ওভারকোট পরিহিত অবস্থায় তাকে দেখাচ্ছে বেশ পাতলা ছিপছিপে। হাত দুটো রেলিঙের ওপর শক্ত করে ছড়িয়ে দিয়ে শরীরের ভর রেখেছে সে এক পাশের নিতম্বের ওপরে। গোটা কবন্ধ আয়েশি ভঙ্গিতে সোজা হয়ে অছে। চেহারায় ফুটে উঠেছে যোগ্যতা আর ওজস্বিতার ভাব। তারপর ট্রেনটা ধীর লয়ে আস্তে আস্তে একটা মলিন চেহারার স্টেশনে থামল। এক মুহূর্ত পরে অভিজাত চেহারার এক অল্প বয়সী মহিলা তার পাশের জানালার পাশ দিয়ে চলে গেল। তার স্যুটকেস এক হাত থেকে আরেক হাতে বদল করতে ওখানে হঠাৎ থেমে যায় মহিলা। ঠিক তখনই তার নজরে পড়ে লোকটা। মহিলার দিকে তাকিয়ে সে হাসে। মহিলাও না হেসে পারে না। লোকটা জানালা নামিয়ে দেয়। ততক্ষণে ট্রেন চলতে শুরু করেছে। লোকটা বলে ওঠে, খুব খারাপ। মহিলা তখনও তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

লোকটা তার তৃতীয় শ্রেণির কম্পার্টমেন্টে নিজের আসনে বসতে চলে যায়। ওখানে তার আসনটা জানালার পাশে। তার সামনের আসনে আরেকটা লোক, মাথায় গুচ্ছ গুচ্ছ লাগানো চুল। অবশ্য তার ফোলা ফোলা দাগভরা মুখে যতটা বোঝায় তার বয়স তত বেশি নয়। গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে লোকটা। চোখ বন্ধ করে জোরে জোরে নিশ্বাস টানছে। মনে হয় হজমের জন্য তার শক্তি ক্ষয় করতে হয়। থেকে থেকে দ্রুততার চাহনিও ফেলছে লোকটা এই ভ্রমণকারীর ওপরে। একই আসনের করিডোরের পাশটাতে একজন কিষাণী মহিলা তার মতো মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব ভালো পোশাক পরার চেষ্টা করেছে বলে মনে হয়: মোমের তৈরি একগুচ্ছ আঙুর খচিত একটা অদ্ভুত হ্যাট তার মাথায়। পাশে বসা মলিন আর ফ্যাকাশে মুখের একটা বাচ্চা ছেলের নাক মোছাতে ব্যস্ত সে। ভ্রমণকারীর হাসি মিলিয়ে যায়। পকেট থেকে একটা ম্যাগাজিন বের করে পড়া শুরু করে সে। ম্যাগাজিনের লেখাটা পড়তে পড়তে তার হাই উঠছে বার বার।

একটু পরে ট্রেনটা থামল। সেইন্ট ব্রিউক লেখা একটা প্যাকার্ড জানালা পথে চলে এল। সে উঠে পড়ে কোনো রকমের তাড়াহুড়া না করে মাথার ওপরের র‍্যাক থেকে পেটমোটা স্যুটকেসটা তুলে নিল। পাশের যাত্রীদের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে দ্রুত তিন ধাপ নেমে গাড়ির বাইরে চলে এল। বের হওয়ার সময় তার সহযাত্রীরা বিস্ময়ের সঙ্গে হলেও তার মাথা ঝাঁকানির জবাব দিয়েছে একই কায়দায়। প্যাটফর্মে নেমে বাম দিকে তাকিয়ে দেখে একটু আগে যে রেলিংটা ধরেছিল সেখানেই কালিঝুলির ময়লা। একটা রুমাল বের করে সযত্নে ময়লা মুছে ফেলল। তারপর প্রস্থান পথের দিকে এগিয়ে গেল সে। যেতে যেতে দেখতে পেল তার মতোই আরো যারা এগিয়ে যাচ্ছে তাদের বেশির ভাগেরই মুখে দাগদাগালি আর পরনে ভাবগম্ভীর পোশাক আশাক। লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট দেখানোর জন্য নিজের সময় আসা পর্যন্ত চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল সে। একজন অতি বাকবিমুখ কেরানি টিকিট দেখে ফেরত দিলে সে ওয়েটিং রুম পার হয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেল রুমটার দেয়াল পুরোপুরি নোংরা; এমন কি দেয়ালের একমাত্র পোস্টারে ভূমধ্যসাগরীয় সৈকতের চিত্রও কালিঝুলিতে মাখামাখি। বিকেলের তীর্যক আলোর মধ্য দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে শহর অভিমুখি রাস্তায় নামল।

হোটেলে গিয়ে আগে থেকে রিজার্ভ করে রাখা রুমের কথা জিজ্ঞেস করতেই পেয়ে গেল। গোলআলু মার্কা মুখের পরিচারিকা তার ব্যাগটা রুম পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চাইলে সে রাজি হল না। বরং রুম দেখিয়ে দেয়ার জন্য সে পরিচারিকাকে বকশিশ দিল। মহিলার বিস্ময়বোধ হতে লাগল এবং তার চেহারা জুড়ে বন্ধুত্বসুলভ ভাব ফুটে উঠল। আবার হাত ধুয়ে দরজা তালাবদ্ধ না করেই সে নিচে নেমে এল। লবিতে পরিচারিকার সঙ্গে দেখা হলে কবরস্থানের কথা জিজ্ঞেস করল সে। মহিলা অনেক ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত করে সব কিছু বুঝিয়ে বলল তাকে। সেও মনোযোগী শ্রোতা হয়ে শুনল। তারপর পা বাড়াল মহিলার নির্দেশনা অনুযায়ী।

এখন সে রাস্তায় নেমে পড়েছে। রাস্তা খুব চাপা; দুপাশে অতি সাধারণ বাড়িঘর কুৎসিত লাল টালির তৈরি। এখানে সেখানে চোখে পড়ছে পুরনো দিনের কাঠের অযত্নে তৈরি পড়ে থাকা ভাঙা ফলক। দোকানগুলোর খোলা জানালায় দেখা যাচ্ছে কাঁচ, পাস্টিক এবং নাইলনের তৈরি সব জিনিসপত্র এবং পশ্চিমের যে কোনো শহরে পাওয়া যায় এমন সব সিরামিকের তৈরি জিনিসপত্র। তবে পথচারীরা কেউ থামছেই না দোকানগুলোর সামনে। খাবারের দোকানগুলোতে শুধু প্রাচুর্যের লক্ষণ চোখে পড়ছে। কবরস্থানের চারপাশ উঁচু দেয়াল ঘেরা। মূল ফটকের সামনে ফুল আর মর্মর পাথর কাটার দোকান খুলে আছে। দোকানগুলোর একটার সামনে সে দাঁড়ায়। একটা ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে সেখানে এক কোণে মর্মর পাথরের একটা বড় খন্ডের ওপর বসে বাড়ির কাজ করছে। পাথর খন্ডতে এখনো কিছু খোদাই করা হয়নি। কবরস্থানের ভেতর ঢুকে সে তত্ত্বাবধায়কের ঘরের দিকে গেল। লোকটা সেখানে নেই। অতি সাধারণভাবে সাজানো অফিস রুমটাতে সে অপেক্ষা করতে থাকে। দেয়ালে একটা মানচিত্রের দিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে ছিল সে। ঠিক তখনই লোকটা ঢুকল। চেহারায় লম্বা লোকটার শরীর প্যাঁচানো গ্রন্থিযুক্ত, নাক লম্বা। লোকটার উঁচু কলারঅলা জ্যাকেটের ভেতর থেকে ঘামের গন্ধ ভেসে আসছে। ১৯১৪ সালের যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের কবরের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চায় সে।

তত্ত্বাবধায়ক বলল, হ্যাঁ, আছে। তাদের কবরস্থানকে বলা হয় 'ফরাসি স্মৃতির স্থান'। আপনি কী নাম খুঁজছেন?

হেনরি করমারি।

তত্ত্বাবধায়ক একটা বাঁধাই খাতা বের করল। নামের একটা তালিকা বরাবর তার নোংরা আঙুল চালাতে লাগল। তার আঙুল একটা নামে এসে থেমে গেল। সে বলল, করমারি হেনরি, মার্নের যুদ্ধক্ষেত্রে আশঙ্কাজনকভাবে আহত হয়েছিলেন, ১৯১৪ সালের ১১ অক্টোবর, সেইন্ট ব্রিউকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হ্যাঁ, এই নামই।

খাতাটা বন্ধ করে তত্ত্বাবধায়ক বলল, আসুন। কবর ফলকের প্রথম সারির দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সে। কয়েকটা সাধারণ; বাকিগুলোর অবস্থা ভগ্ন, কুৎসিত। সবগুলোকে আচ্ছাদন করে রাখা হয়েছে এমন সব মূল্যহীন আবরণে যাতে পৃথিবীর যে কোনো জায়গাকেই সম্মানে না তুলে বরং নিচের দিকে নামিয়ে আনতে পারে।

তত্ত্বাবধায়ক জিজ্ঞেস করল, তিনি কি আপনার আত্মীয় হতেন?

তিনি আমার বাবা।

তা হলে তো খুব কষ্টের কথা।

না, তেমন নয়। তিনি যখন মারা যান আমার বয়স এক বছরেরও কম। বুঝতেই পারছেন বোধশক্তিই তখন হয়নি আমার।

তবু কষ্টেরই কথা। কত মানুষ মারা গেছেন।

জ্যাক করমারি কিছুই বলল না। অবশ্যই যারা মারা গেছেন তাদের সংখ্যা বিরাট। তবে মনের মধ্যে বাবার প্রতি সন্তানের যে টান সেটা ফিরিয়ে আনতে পারছে না সে। এত দিন সে ফ্রান্সে ছিল: তার মা অনেক দিন ধরে যে কাজটা করার কথা তাকে বলে আসছেন সেটা করার ব্যাপারে নিজের কাছেই সে বহুবার প্রতিজ্ঞা করেছে। মা আলজেরিয়ায় থাকেন। এতো বছর ধরে তিনি জ্যাকের বাবার কবর দেখে আসতে বলেছেন। মা নিজেও দেখতে পারেননি। তার মনে হল এই কবর দেখতে আসার কোনো মানে হয় না। প্রথমত তার নিজের কথা বলতে গেলে– সে তো বাবাকে কখনও দেখে নি; বাবা দেখতে কেমন ছিলেন সে সম্পর্কে তার কোনো রকম ধারণাই নেই। আর পুরনো দিনের এই সব অচল আবেগী ব্যাপার-স্যাপারও তার পছন্দ নয়। আর মায়ের কথা বলতে গেলে– মা তো বাবা সম্পর্কে তেমন কিছু বলেননি, বাবার কী দেখতে যেতে হবে। তার চেহারার কোনো ধারণা নেই। তবে যেহেতু তার পুরনো পরামর্শদাতা সেইন্ট ব্রিউকে অবসর গ্রহণ করেছেন তাকেও

দেখে আসা যেতে পারে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। একই সঙ্গে তার মৃত অদেখাজনকেও দেখে আসতে পারে। বৃদ্ধ বন্ধুকে দেখতে যাওয়ার আগেই বাবার কবরস্থানে এসেছে যাতে মনের ভেতরে হালকা বোধ হতে পারে।

এই যে এইটা, তত্ত্বাবধায়ক বলল। তারা একটা উচু করে বাঁধানো জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। ধূসর রঙের ছোট ছোট পাথর দিয়ে জায়গাটাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। পাথরগুলোর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে কালো রং করা একটা ভারী শিকল। কবর ফলকগুলো সংখ্যায় অনেক, দেখতে একই রকম; সারি সারি সাধারণ চেহারার নাম খচিত চার কোণাকার ফলক। প্রত্যেকটা কবর একগুচ্ছ করে তাজা ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক বলল, বিগত চলিশ বছর ধরে এই কবরগুলো এভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই যে, দেখুন আপনার বাবার কবর, লোকটা প্রথম সারির একটা কবর দেখিয়ে দিল। কবর থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল জ্যাক করমারি। তত্ত্বাবধায়ক বলল, আপনি দেখুন, আমি কাজে ফিরে যাচ্ছি।

জ্যাক কবর ফলকটার দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। হ্যাঁ, এটাই তার বাবার নাম। ওপরের দিকে চোখ মেলে জ্যাক দেখল ছোট ছোট সাদা আর ধূসর মেঘ ভেসে যাচ্ছে আকাশময়। আকাশ যেন কিছুটা বেশি ফ্যাকাশে। আকাশ থেকে একবার উজ্জ্বল আরেকবার ছায়াচ্ছন্ন আলো পতিত হচ্ছে। তার চারপাশে মৃতদের জগতে শুধুই নীরবতা বিরাজ করছে। উঁচু দেয়াল পার হয়ে দূরের শহর থেকে মৃদু কোলাহল ভেসে আসছে; এছাড়া আর কোনো সাড়াশব্দ নেই কোথাও। দূর প্রান্তের কবরগুলোর ওপরে মনে হয় ছায়া ছায়া কী যেন থেকে থেকে ভেসে বেড়াচ্ছে। ভেজা ফুলগুলোর গন্ধের বাইরে ওপরের দিকে তাকিয়ে জ্যাক করমারি বাইরের কিছু একটা ধরতে চাইছে কল্পনায়: দূরের নিশ্চল সমুদ্র থেকে লবণাক্ত একটা সুগন্ধ ভেসে আসছে। ঠিক তখনই পাশের একটা কবর ফলকের সঙ্গে একটা বালতির ঠোকা লাগার শব্দে তার ধ্যানমগ্নতা কেটে যায়। তখন তার বাবার কবর ফলকের ওপর লেখা বাবার জন্ম-মৃত্যুর বছর দেখতে পায়। এত দিন সে জানতেই পারেনি এই তথ্যটা: ১৮৮৫– ১৯১৪। সঙ্গে সঙ্গে পাটীগণিতের হিসাব তার পরিষ্কার হয়ে যায়: মৃত্যুর সময় বাবার বয়স হয়েছিল উনত্রিশ বছর। হঠাৎ একটা বিষয় বুঝতে পেরে তার শরীর পর্যন্ত কেঁপে ওঠে: তার নিজের বয়স এখন চলিশ বছর; কবরে শুয়ে থাকা মানুষটা, তার বাবা, বয়সে তার চেয়ে ছোট।

কোমলতা আর করুণার যে তরঙ্গ তার হৃদয়কে তাৎক্ষণিকভাবে ভরে দিয়েছে সে তরঙ্গকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া বাবার স্মৃতির প্রতি ছেলেকে টেনে আনার মতো আত্মার তাড়না বলা যাবে না। এই তরঙ্গ হল অন্যায়ভাবে নিহত একজন সন্তানের প্রতি বয়সী একজন মানুষের তরফ থেকে সমবেদনা। এখানে কিছু একটা আছে যেটা স্বাভাবিকতার ক্রমকে মানে না। সত্যি বলতে কী এখানে আসলে বিন্যাসের আদৌ কোনো ক্রমই নেই। বরং এখানে রয়েছে পাগলামি আর বিশৃঙ্খলা: বাবার চেয়ে ছেলের বয়স বেশি। তার চারপাশে সময়ের আবর্তন ভেঙ্গে যাচ্ছে। তবে কবর ফলকগুলো আর তার বাহ্য দৃষ্টিতে নেই; এ গুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে নিজে অনড়। আর যে নদী শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে তার মধ্যে বছরগুলো নিজস্ব স্থানে নেই। বছরগুলো যেন ঢেউ, তট এবং জলাবর্তের বেশি কিছু নয়। এই জলাবর্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জ্যাক নিদারুণ যাতনা আর করুণার কবলে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আশপাশের আরো কয়েকটা কবর ফলকের দিকে দৃষ্টি ফেলে জ্যাক বুঝতে পারল এখানে ছড়িয়ে আছে যে বালকেরা তারা বেদনাক্লিষ্ট প্রাপ্তবয়স্কদের বাবা। এই প্রাপ্তবয়স্করা মনে করে এই বর্তমান সময়ে তারা জীবিত আছে। জ্যাক যেমন নিজেই বিশ্বাস করে সে এই সময়ে জীবিত আছে; সে নিজেই নিজেকে এই অবস্থায় তৈরি করেছে; নিজের শক্তি এবং ওজস্বিতা সম্পর্কে তার পরিষ্কার ধারণা আছে; নিজের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা তার আছে এবং নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে সক্ষম সে। কিন্তু এই মুহূর্তের এই অদ্ভুত বিবমিষায় দেখতে পাচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষ একটা করে প্রতিমূর্তি তৈরি করে, বছরগুলোর আগুনের মধ্যে কাঠিন্য তৈরি করে, তার মধ্যে সে নিজেই প্রবেশ করে সেটার পতনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এখন সে দেখতে পাচ্ছে সেই প্রতিমূর্তি ভেঙে যাচ্ছে, ধ্বসে পড়ছে। অবশিষ্ট আছে শুধু এই যাতনাক্লিষ্ট হৃদয়; চলিশ বছর ধরে তার নিজের সঙ্গে রয়ে গেছে পৃথিবীর যে ভয়ঙ্কর বিন্যাস তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বেঁচে থাকতে অধীর এই হৃদয়। সমগ্র জীবনের গোপনীয়তা থেকে তাকে যে দেয়াল আড়াল করে রেখেছে সেই দেয়ালের বিরুদ্ধে চলছে হৃদয়ের সংগ্রাম। আরো দূরে যেতে, সীমানার বাইরে যেতে, আবিষ্কার

করতে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শেষ বারের মতো এক সেকেন্ডের জন্য এবং চিরকালের জন্য নিজের অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে অধীর এই হৃদয়।

নিজের জীবনের দিকে দৃষ্টি ফেরায় জ্যাক: তার এই জীবন বোকামিপূর্ণ, সাহসী, কাপুরুষসুলভ এবং স্বেচ্ছাচারী। যে গন্তব্য সম্পর্কে সে কিছুই জানে না সেই গন্তব্যের দিকেই সব সময় ধাবিত হয়েছে তার জীবন। সে জীবন শেষ-অতীতের জীবন; তাকে ওই জীবন দানকারী সেই মানুষটি তাকে ওই জীবন দান করার পরই চলে গেছেন সমুদ্রের অন্য পারে; বিদেশ বিভূইয়ে তার মৃত্যু হয়েছে– সেই অতীত জীবনে আসলে সে কল্পনায় আনার চেষ্টাই করেনি ওই মানুষটির পরিচয়। উনত্রিশ বছর বয়সে সেই মানুষটিও কি পলকা, পীড়িত, চাপা, একগুঁয়ে, ইন্দ্রিয়-পরবশ, স্বপ্নবাজ, নৈরাশ্যবাদী এবং সাহসী ছিলেন না? হ্যাঁ, অবশ্যই। এই সব বৈশিষ্ট্যই তার ছিল। আরো বেশি যা কিছু তার ছিল সেগুলো হল তিনি তখন ছিলেন জীবিত, তিনি ছিলেন একজন ব্যক্তি মানুষ। যেখানে তার জন্ম সেখানে ওই মানুষটি জীবিত অবস্থায় ঘুমিয়েছেন; একজন অচেনা মানুষের মতো চলে গেছেন। তার সম্পর্কে জ্যাকের মা তাকে জানিয়েছেন, তিনি দেখতে জ্যাকের মতোই এবং তিনি যুদ্ধের ময়দানে মারা গেছেন। যে রহস্যকে জ্যাক বইপত্রের মধ্যে, মানুষের মাঝে ব্যাকুল হয়ে অনুসন্ধান করেছে সে রহস্য এখন মনে হচ্ছে খুব নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে এই মৃত মানুষটির সঙ্গে, এই অল্প বয়সী বাবার মধ্যে। তার অস্তিত্বের চারপাশে, তার নিজের বেড়ে ওঠার মধ্যে সেই রহস্যের অবস্থান। আর এখন মনে হচ্ছে সময়ের মধ্যে এবং রক্তের মধ্যে যে জিনিসটি খুব নিবিড়ভাবেই ছিল সেটাকে খুঁজতে সে বহু বহু দূর ঘুরে ফিরেছে। সত্যি বলতে গেলে, সে আসলে এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় কারো সাহায্য তেমন পায়নি। যে পরিবারে তার বেড়ে ওঠা সেখানে সবাই খুব কম কথা বলে। সেখানে কেউ পড়াশোনা জানে না। দুঃখী আর হতোদ্যম মায়ের ওই পরিবারে আর কে আছে? তার মা ছাড়া আর কেউ তাকে চিনতই না। মাও তার অনেক কিছুই ভুলে গেছেন– এ ব্যাপারে জ্যাক নিশ্চিত। ওই মানুষটি অচেনা থেকেই মারা গেছেন। এই পৃথিবীতে তিনি অচেনা মানুষের মতোই বিচরণ করেছেন একজন ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তি হয়ে। জ্যাকের নিজেরই দায়িত্ব ছিল তার সম্পর্কে নিজেকে জ্ঞাত করানো– তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু জ্যাকের মতো ব্যক্তি যার কিছুই নেই অথচ যে গোটা পৃথিবীকেই চায় তার সর্বশক্তি দিয়েও নিজেকে তৈরি করা এবং পৃথিবীকে জয় করা কিংবা বুঝতে পারা যথেষ্ট নয়। মোটের ওপরে খুব দেরি হয়ে গেছে তাও নয়; এখনও অনুসন্ধান করতে পারে; এখনও জানার চেষ্টা করতে পারে এই মানুষটি কে ছিলেন। পৃথিবীতে আর যে কোনো মানুষের চেয়েই বেশি আপন মনে হচ্ছে এই মানুসটিকে। সে চেষ্টা করে যেতে পারে।

বিকেল শেষ হয়ে যাচ্ছে। স্কার্টের খসখস শব্দ, একটি কালো ছায়া তাকে এই কবরস্থান এবং চারপাশ ঘিরে থাকা ওই আকাশের বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনে। তাকে এখন চলে যেতে হবে। এখানে আর কিছু করার নেই। কিন্তু এই নামটা থেকে, কবর ফলকে খোদাই করা ওই বছরগুলো থেকে কিছুতেই নড়তে পারে না জ্যাক। ওই বাঁধাই করা কবরের নিচে ছাই আর ধূলি ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু তার মনে হয় বাবা আবার জীবিত হয়েছেন। বাবার জীবনটা একটা অদ্ভুত নীরবতার জীবন। জ্যাকের মনে হতে থাকে সে আবারো বাবাকে ত্যাগ করে চলে যাবে বুঝি। বাবাকে পিছে ফেলে সে আগের মতোই আরেকটা রাতের অশেষ নিঃসঙ্গতার কাছে ফিরে যাবে। এই নিঃসঙ্গতার মাঝেই এতকাল তাকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে। সেখানেই সে একাকী পড়ে থেকেছে। শূন্য আকাশে আকস্মিক বিকট প্রতিধ্বনি উঠছে: একটা অদৃশ্য উড়োজাহাজ বোধ হয় শব্দের সীমা অতিক্রম করে গেল। কবরের দিকে পেছন ফিরে জ্যাক করমারি তার বাবাকে ফেলে চলে যাচ্ছে।

একটি সিগারেটের আত্মকাহিনী

জান্নাতুল ফেরদাউস এশা
রোল: ২৭৫৯২, শ্রেণি: দ্বাদশ

আমার নাম সিগারেট। আমি পৃথিবীর সব দেশেই থাকি। দেখতে সাধারণ হলেও নেশা হিসেবে আমি বড় ভয়ংকর। আমি এক বিধ্বংসী মাদক।

মাত্র তিন থেকে চার দিনেই আমি পরিণত হই ভয়ংকর এক নেশায়। আমার দেহের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষতিকারক দ্রব্যটির নাম হলো "নিকোটিন"। আমি রক্তের প্রধান উপাদান আরবিসি অর্থাৎ লোহিত রক্ত কণিকাকে ধ্বংস করে দেই। এতে দেহে রক্ত তৈরি হওয়ার পরিমাণ কমে যায় ফলে ধীরে ধীরে মানবদেহ হয়ে পড়ে দুর্বল। আমি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে করে ফেলি বৃদ্ধ মানুষের মতো। যারা আমার ওপর আসক্ত হয়ে যায় তারা আমাকে বন্ধুর মতো, ছায়ার মতো আমাকে সাধারণ পাশে রাখে। কিন্তু আমি বন্ধু হিসেবে খুব ক্ষতিকর। আমি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করি ফুসফুসকে।

শ্বসনতন্ত্র অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্য সবচেয়ে জরুরি যে অঙ্গটি, সেটিই হলো ফুসফুস। যারা দীর্ঘ বছর ধরে প্রচুর পরিমাণে ধূমপান করে তাদের ফুসফুসে নানান রকম ক্ষতিকর অসুখ তৈরি করি আমি।

আমি সিগারেট বলছি। আমি এত বেশি শক্তিশালী যে, আমি একজন শক্ত সামর্থ্য যুবককেও দুর্বল করতে পারি। আমি ক্যানসার পর্যন্ত তৈরি করতে পারি। আমি মানুষের আয়ু কমিয়ে ফেলি। কেউ সিগারেট না খেয়ে শুধু ধোঁয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি বাসায় একজন ধূমপান করলে, সেই ধোঁয়া তার বাসায় এবং তাদের কাছের সবাইকে ক্ষতি করে। তাই আমাকে বলা হয়– "ধূমপানে বিষপান।" যারা সিগারেট খায়, তারা এ্যাকটিভ স্মোকার বা ধূমপায়ী। আর যারা ধূমপায়ীর পাশে বসে থাকে তারা প্যাসিভ স্মোকার।

আমি ভয়ংকর ও নিষ্ঠুর সিগারেট বলছি। তোমরা আমার চেয়ে হাজার মাইল দূরে থাকো। আমি ঘুণে ধরা পোকার মতো দেহের ক্ষতি করি। তাই তোমরা আমায় গ্রহণ করো না। আমার থেকে দূরে থাকো। তোমরা সুস্থ ও সুন্দরভাবে বাঁচো। আর আমাকে ঘৃণা কর। কাছের মানুষগুলোকে নিয়ে সুন্দর ও সুখী থাকো। তোমাদের সবার জীবন হোক মাদকমুক্ত ও চিরসবুজ।

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

বিশ্বাস ঘাতকদের করুণ পরিণতি

মাহামুদুল হাসান নাবিল
রোল: ৩২২২৬

কী ঘটেছিল মীর জাফরের ভাগ্যে?

পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতার সাক্ষী হয়ে আছে পলাশির যুদ্ধ। এর মূল কুশীলবদের প্রায় সবার অস্বাভাবিক ও করুণ মৃত্যুর কথা জানা গেলেও দুই বিশ্বাসঘাতক রায় বল্লভ এবং ইয়ার লতিফ খানের শেষ পরিণতির বিষয়ে ইতিহাসে স্পষ্টত কিছু উল্লেখ নেই। তবে জানা গেছে, মীর জাফরের মৃত্যুর কথ। পলাশীর যুদ্ধের পর প্রচুর ঘুষের বিনিময়ে রবার্ট ক্লাইভ এর হাত ধরে মসনদে আরোহণ করেন নবাব মীর জাফর আলী খান। তবে তাকে পুতুল বানিয়ে মূল ক্ষমতা পরিচালনা করেন ইংরেজরা। এক পর্যায়ে বনিবনা না হওয়ায় মীর জাফরকে সরিয়ে তারই জামাতা মীর কাশেমকে ক্ষমতায় বসানো হয়। মীর কাশেম এর সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হলে ইংরেজরা মীর কাশেমকে সরিয়ে দেন। এ সময় বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর নির্লজ্জের মতো আবারও ইংরেজদের আজ্ঞাবহ নবাব হিসেবে মসনদে বসেন। নামে নবাব থাকলেও মূলত মীর জাফরকে ইংরেজদের অবজ্ঞা আর দেশীয়দের ঘৃণার পাত্র হিসেবে বাকি জীবন কাটাতে হয়। ১৭ জানুয়ারি ১৭৬৫ সালে ৭৭ বছর বয়সে মীর জাফরের জাগতিক মৃত্যু ঘটলেও আসলেই কি মরেছেন মীর জাফর? এর উত্তর জানা যায় মুর্শিদাবাদের মীর জাফরের ধ্বংস প্রায় প্রাসাদের সামনে গেলে। মীর জাফর এর প্রাসাদে ঢোকার প্রধান ফটকটি ইতিহাসে সরকারি দলিলে এবং ট্যুরিস্ট গাইড বইয়ে নেমক হারাম দেউর বা 'বিশ্বাসঘাতকের গেট' নামে পরিচিতি পেয়েছে। আর যে কোনো বেঈমান বা বিশ্বাসঘাতককে গালি দিতে ব্যবহৃত হয় মীর জাফর শব্দটি। তাই বলা হয় মরেও বেঁচে আছেন মীর জাফর মানুষের মুখে মুখে তবে একটি জঘন্য গালি হিসেবে।

বজ্রপাতে মৃত মীর মিরণ

পলাশীর যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতাকারী সেনাপতি মীর জাফরের জ্যেষ্ঠ সন্তান মীর মিরণ। পুরো নাম সাদিক আলী খান বাহাদুর। ক্লাইভের প্রতিনিধি ওয়াটসনের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে মীর জাফরের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন মীর মিরণ। এমন কি মীর জাফরের প্রাসাদে ওয়াটসনের সামনে মীর জাফর মাথায় পবিত্র কোরআন নিয়ে যখন ব্রিটিশদের পক্ষে কাজ করার প্রতিজ্ঞা করেন তখন মীর জাফরের আরেক হাত ছিল তারই পুত্র মীর মিরণের মাথায়। নিজ মাথায় পবিত্র কোরআন শরিফ

আর নিজ পুত্র মিরণের মাথায় হাত রেখে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার পরিণতি দেখতে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয় নি বাবা মীর জাফরকে। পলাশীর যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষ পার হয়েছে মাত্র। সেদিন ছিল ১৭৬০ সালের ৩ জুলাই। বর্ষকাল। পুত্রের যে মাথায় হাত রেখে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন, সেই মাথায় অর্থাৎ মীর মিরণের মাথায় বজ্রপাত নেমে আসে। বজ্রপাতে মীর মিরণের অস্তিত্ব পাওয়া-গিয়েছিল কি না তা জানা যায় নি। মিরণের বয়স তখন মাত্র ২১ বছর। এই যুবক পুত্রের লাশ বহনের ভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য পিতা মীর জাফরের হয়েছিল কি না তাও জানা যায় নি। জানা গেছে শুধু একটি কথা-প্রকৃতি কাউকে ক্ষমা করে না।

কপালে কবর জোটেনি ঘষেটি বেগমের :

কালের বিবর্তনে যুদ্ধ এবং নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয় ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মীর জাফর ইংরেজদের হাতের পুতুল হয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। এতে ক্ষমতার প্রভাব বিস্তারের যে স্বপ্ন ঘষেটি বেগম দেখেছিলেন, তা কার্যত অপূর্ণ থেকে যায় ইংরেজ আধিপত্যের কারণে। প্রতিশ্রুত অর্থ না দেয়া সহ নানা কারণে এক পর্যায়ে ঘষেটি বেগম দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন মীর জাফর এবং তার পুত্র মীর মিরণের সঙ্গে। পরিণতিতে ঘষেটি বেগমকে বন্দি করে পাঠিয়ে দেয়া হয় ঢাকার (বর্তমান পুরান ঢাকায়) জিঞ্জিরা প্রাসাদে। এখানে বন্দি থাকা সত্ত্বেও ঘষেটি বেগম নতুন চাল শুরু করেন মীর জাফর ও মিরণের বিরুদ্ধে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে এবং ভবিষ্যতে বিপদ হতে পারে ভেবে মিরণ ঘষেটি বেগমকে বন্দি অবস্থায় নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদে ফেরত পাঠানোর আদেশ দেন। নৌকা ঘষেটি বেগমকে নিয়ে জিঞ্জিরা প্রাসাদ ছেড়ে গেলেও মুর্শিদাবাদে পৌঁছে নি কোনো দিন। পথেই নৌকা ডুবিতে ঘষেটি বেগমের সলিল সমাধি ঘটে বলে ধারণা করা হয়। ফলে বলা যায় বাংলা - বিহার - উড়িষ্যার মাটিও ঠাঁই দেয়নি কুচক্রী ঘষেটি বেগমকে। সাড়ে তিন হাত মাটিও জোটে নি এই বিশ্বাসঘাতকিনীর কপালে। অঢেল ধন-সম্পদ তার কোনো কাজেই আসে নি।

ঢাকা কমার্স কলেজে আমার প্রথম দিন

নূরজাহান ইসলাম সূচি
রোল: ৩০৩৯২, শ্রেণি: একাদশ

মানব জীবন ঘটনা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু এগুলোর সবই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় নয়। আর এই স্মরণীয় ঘটনাগুলো হাসি-কান্না, বেদনা, বিস্ময় নিয়ে গঠিত। যেগুলো আমাদের হৃদয়ে চিরসবুজ হয়ে রয়ে যায়।
সময়ের সাথে সাথে আমাদের অনেক সুন্দর সময়কে অতিক্রম করে চলে আসতে হয় এবং সেই সময়কে আর কখনো ফিরে পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতেও হয়তো বা সুন্দর সময় আসতে পারে কিন্তু তার মধ্যে আর পেছনে ফেলে আসা সময়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে এবং সেই স্মৃতি আমাদের পেছনে টেনে ধরে বারবার। আমাদের এসএসসি পরীক্ষার পর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ভালো কোনো কলেজে পড়া। এজন্য অনেককে আব্বু-আম্মুকে ছেড়ে এসে দূরে ভালো কলেজে ভর্তি হতে হয়। শত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পার করে আমরা পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের চেষ্টা করি যেন জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারি। আর সেই লক্ষ্য নিয়ে আজ আমি বাংলাদেশের সেরা কলেজ ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হয়েছি। কলেজের প্রথম দিন আজও আমার স্মৃতিতে অমলিন হয়ে আছে।

স্কুল জীবন শুরু করা থেকেই আমাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। আর কলেজ জীবনের নিয়ম-শৃঙ্খলা অবশ্যই স্কুল জীবনের চেয়ে ভিন্নতর। ছোটবেলায় আমরা যা খুশি তাই করতে পারি কিন্তু এখন পারি না। আর তাই হঠাৎ করে নতুন পরিবেশকে মানিয়ে নেয়া একটু কষ্টকর হয়ে পড়ে।

আমি ছোট বেলা থেকেই ঢাকা কমার্স কলেজের কথা শুনে আসছি। কারণ আমার ভাইয়াও এই কলেজেই পড়েছে। ভাইয়ার মুখে আমি কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা, পড়াশোনা ও ফলাফল সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছি। গতবছর কমার্স কলেজের এক ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। আর এসব কিছুই আমাকে ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমি আগে থেকেই স্বপ্ন দেখতাম এই কলেজের ছাত্রী হব। আর আল্লাহ আমার স্বপ্নটা পূরণ করে দিয়েছেন।

১ জুলাই, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে, সকাল ৮ টার কিছুক্ষণ আগে আমি কলেজে ছাত্রী হিসেবে প্রথম পদার্পণ করি। অবশ্য ভাইয়াকে দেখতে আমি, আব্বু, আম্মু কলেজে আগেও এসেছি। ঐদিন আমি আমাদের কলেজের নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পরে গিয়েছিলাম। দিনটি ছিল শিক্ষক-শিক্ষার্থী পরিচিতি অনুষ্ঠান। আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল সকাল ৮টা। প্রথম দিন কলেজে যাব তাই তার আগের রাত থেকেই আমি প্রস্তুতি শুরু করে দেই। আমি কমার্স কলেজের ছাত্রী হোস্টেলে থাকি। রাতে ঘুমানোর আগে আমার মনে হচ্ছিল আব্বু, আম্মু ও ভাইয়ার স্বপ্ন যেন আমি পূরণ করতে পারি। সকাল সকাল আমি ও আমার বান্ধবী সুচিত্রা রেডি হয়ে কলেজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। যদিও আমরা কলেজের হোস্টেল থেকে সরাসরি কলেজে প্রবেশ করতে পারতাম কিন্তু তা না করে আমরা নিয়ম-শৃঙ্খলা মানার জন্য গেট দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম। একটু

ভয় ভয় লাগছিল।

কলেজের গেটে গিয়ে দেখি অনেক ছাত্র-ছাত্রী। আমরা সবাই শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কলেজে প্রবেশ করলাম। একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক আমরা কলেজ ইউনিফর্ম পড়েছি কি না তা যাচাই করে দেখছিলেন। আগেই আমি নোটিশ বোর্ড থেকে খুঁজে নিয়ে আমার রোল নম্বর কোন রুমে তা দেখেছিলাম। কিন্তু উত্তেজনায় ভুল হতে পারে এ জন্য আবার দেখে নির্দিষ্ট ক্লাস রুমে গিয়ে বসলাম এবং সেখান থেকে একটি ফাইল, অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্ল্যান এবং একটি কলম পেলাম। তার পর সেগুলো নিয়ে আমরা সবাই অডিটোরিয়ামে পৌছালাম। সেখানে আমাদের ঢুকতেই লাল গোলাপ দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছিল। তার পর BNCC এর আপু এবং ভাইয়ারা আমাদের সারিববদ্ধভাবে নিয়ে গিয়ে জায়গায় বসিয়ে দিয়েছিলেন। তার পর দ্বাদশ শ্রেণির বড় আপুরা আমাদের ভালোবেসে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং আমাদের উদ্দেশ্য একটি শ্রুতিমধুর বক্তব্য রেখেছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের আলাদাভাবে orientation করা হয়েছিল। প্রথমে ছাত্রীদের, তার পর ছাত্রদের।

কোনো কলেজের যে নিজস্ব কলেজ সঙ্গীত থাকতে পারে এটা আমার ধারণার বাইরে ছিল। তার পর আমরা কলেজ সঙ্গীত গাইলাম শিক্ষকের সাথে। আমাদের কলেজ সঙ্গীত এর গীতিকার মোঃ হাসানুর রশীদ স্যার এবং সুরকার সাইদ হোসেন সেন্টু।

কলেজে গাওয়া সঙ্গীতটি ছিল–

ঢাকা কমার্স কলেজ
আমরা একটি জাগ্রত পরিবার,
শিক্ষাঙ্গনে জ্বালবো প্রদীপ
এই আমাদের অঙ্গীকার॥

তার পর আমাদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয় এবং আমি এই বাক্যগুলো নিজের লক্ষ্য হিসেবে মনে নিয়ে পাঠ করি।

আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে একজন ছাত্রী তার অভিব্যক্তিগুলো প্রকাশ করে। নিয়ম-শঙ্খলা নিয়ে এবং বর্জনীয় কার্যাবলি, পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে আমাদের শিক্ষকেরা তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। আরও আমাদের এখানে আসার লক্ষ্য, স্বপ্ন উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন। এভাবে আরো প্রয়োজনীয় নানা বিষয় নিয়ে শিক্ষকেরা বক্তব্য রাখেন। কলেজের অনারারি প্রফেসর-কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী স্যার, মোঃ আবু সাইদ স্যার দিনের পর দিন কাজ করে গেছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

প্রত্যেকের জীবনেই স্মরণীয় দিন আছে। কলেজের সব কিছু আমার কাছে আনন্দময়, বিস্ময়কর ও নতুন মনে হয়েছিল। কলেজের প্রথম দিনে আমার নতুন অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই দিনটি আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং সারা জীবন হৃদয়ে নাড়া দিয়ে যাবে।

কলেজের প্রথম দিন

আল-আমিন আহমেদ সোহাগ

রোল : ৩১১৫৩, শ্রেণি : একাদশ

ভূমিকা: স্কুল জীবন পেরিয়ে আজ আমি কলেজ জীবনে অগ্রসর হয়েছি। এসএসসি পরীক্ষা পাসের মাধ্যমে আমি আমার জীবনে এক নতুন পর্যায়ে পা রেখেছি। আমার মনে এক নতুন আশা আর চোখে এক নতুন স্বপ্নের হাতছানি নিয়ে পা রাখলাম "ঢাকা কমার্স কলেজ" -এ এক সুশৃঙ্খল পরিবেশ আর জ্ঞানের ভাণ্ডার "ঢাকা কমার্স কলেজ" এ।

কলেজে প্রবেশকালীন আমার মনোভাব : আজ জীবনের প্রথম কলেজে পা রেখেছি। তাই মনে নানা ধরনের ভাবনা জমে আছে। কলেজে পৌঁছা মাত্রই দেখতে পেলাম কলেজে অসংখ্য মানুষের ভিড়। কত ছাত্র-ছাত্রী, তারা সকলেই আমার মতো এক নতুন লক্ষ্য নিয়ে এই দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সবাই অচেনা-অজানা। খুব কম শিক্ষার্থী একে অপরকে চেনে। আমি কাউকেই চিনতাম না। খুব উত্তেজিত ছিলাম আমি কলেজে প্রবেশ করার সময় এবং খুব ভয়ও কাজ করছিল মনের মধ্যে। কেমন হবে সবাই? কী করবো? অজানা এক অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল তখন। তারপর মনকে সান্ত্বনা দিলাম যে হতে পারে আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

কমার্স কলেজের পরিবেশ : "ঢাকা কমার্স কলেজ" এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশের অধিকারী। কলেজে পা রাখা মাত্রই কলেজটি আমার মন কেড়ে নিয়েছে। বিশাল বড় দালান বিশিষ্ট ঢাকা কমার্স কলেজ। ঢাকা কমার্স কলেজের নাম শুনেছি আগে যে, এর পরিবেশ নাকি চমৎকার। আজ চোখে দেখাও হয়ে গেল। যা শুনেছি তার চেয়ে অনেক বেশি দেখেছি ঢাকা কমার্স কলেজে প্রবেশের পর। যা কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে। ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ : কলেজে প্রবেশের পর আগমণ হল শ্রেণিকক্ষে যে কক্ষে বসে আমি শিক্ষার্জন করবো। যেখানে বসে আমি আমার লক্ষ্যের দ্বার উন্মোচন করবো। যেখানে দাঁড়িয়ে আমার শিক্ষক-শিক্ষিকা আমাকে শিক্ষা দান করবে, আর আমি মানুষের মতো মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারবো। সেই কক্ষে প্রবেশের পরই মনে আনন্দের এক আবেগ সৃষ্টি

হল। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল কেউ কাউকে চিনি না কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এরাই আমার বন্ধু আমার পথ চলার সঙ্গী। এদের সাথে চলেই তো জীবনের এক এক ধাপ পাড়ি দিব। তাপের অনেকের সাথেই পরিচিত হলাম। সেখানে আমাদের সকলকে একটি কলম, ফাইল, আর সিলেবাস বিতরণ করা হয়েছিল।

অডিটোরিয়ামে প্রবেশ : শ্রেণিকক্ষ থেকে বের হয়ে আমরা সকলে অডিটোরিয়ামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না কোন দিকে যাব। কী করবো, কাকেই বা জিজ্ঞেস করবো? তারপর অজানা বন্ধুদের সাথে হাঁটতে শুরু করলাম। সকলেই লাইন ধরে যাচ্ছিলাম। খুব ভাল লাগছিল আমার তখন। সেখানে প্রবেশকালে আমাদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়েছিল। আজ আমাদের নবীনবরণ, এ কথা ভেবেই খুব আনন্দ হচ্ছিল। তারপর সেখানে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট স্থানে বসলাম আর ভাবছিলাম কি হবে এখানে? প্রতিটি মুহূর্ত আমি খুব উত্তেজিত ছিলাম এটা জানার জন্য যে এরপর কী হবে? এবং অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অডিটোরিয়ামে পরিবেশ : অডিটোরিয়ামের পরিবেশটা আমার সব থেকে বেশি ভালো লেগেছিল। অসাধারণ একটা জায়গা। সামনে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী বসে ছিলেন। তাদের সামনে ফুল দিয়ে সাজানো ছিল। আর আমাদের আশেপাশে ভলেন্টিয়াররা দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ পর অধ্যক্ষ স্যার ও অন্যান্য শিক্ষকগণ বক্তব্য দিলেন। সব মিলিয়ে আমার খুবই ভাল লাগলো।

শিক্ষক-শিক্ষিকার পরিচিতি : এখন আসলো শিক্ষক-শিক্ষিকা আর আমাদের পরিচিতির পালা। আমি তো খুব মনোযোগী ছিলাম তখন। ভাবছিলাম কোন শিক্ষক আমাদের কী পড়াবে? কে কেমন হবে? আমি তাদের সাথে কথা বলতে পারবো তো? কেমন যে এক অনুভূতি! অপ্রকাশ্য! তারপর ভাবলাম শিক্ষক তো শিক্ষক-ই। আমাদের বাবা-মায়ের মতো। কিসের এতো ভয়। তার পর ধীরে ধীরে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে পরিচিতি শেষ হল।

ঢাকা কমার্স কলেজের শপথ সঙ্গীত : শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে পরিচিত হওয়ার পর সকলে সম্মিলিতভাবে শপথ করলাম। শপথ করতে করতে আমি যেন এই কলেজের সাথে পুরোপুরিভাবেই জড়িয়ে গেলাম। তারপর আসলো সঙ্গীতের পালা। অসাধারণ লেগেছিল আমার ঢাকা কমার্স কলেজের সঙ্গীতটি। খুব-ই ভাল লেগেছিল। ভেতর থেকে যেন গেয়ে উঠছিল সঙ্গীতটি। অসাধারণ শপথ আর সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই এ পর্বের সমাপ্তি ঘটলো।

ঢাকা কমার্স কলেজের আদর্শ : আমরা সকলেই জানি যে, একটি সুগঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-ই পারে একটি সুশিক্ষিত নাগরিক গড়ে তুলতে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদর্শই শিক্ষার্থীর আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত কলেজটির মৌলিক আদর্শ হলো শিক্ষা, কর্ম ও ধর্ম। অর্থাৎ প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তার পর অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের জন্য কাজ করতে হবে। আর এটাই হবে ধর্ম। কেন না তারা মনে করেন যে। জ্ঞানহীন কাজ এবং কর্মবিমুখ ধর্ম নিরর্থক। তাদের এই আদর্শ-ই আমাদেরকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিবে।

ঢাকা কমার্স কলেজের রীতি-নীতি, নিয়ম-শৃঙ্খলা :
ঢাকা কমার্স কলেজ ঐতিহ্যবাহী ও ব্যতিক্রমি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ কলেজের প্রাণশক্তি নিয়ম-শৃঙ্খলা। নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়। ধূমপান করা, মোবাইল ফোন আনা সব নিষিদ্ধ এ কলেজে। পরিচয়পত্র ও ইউনিফর্ম ব্যতিত কোনো শিক্ষার্থী কলেজে প্রবেশ করতে পারে না। খুব কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা মান্য করে তারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান করে থাকো।

কলেজ থেকে বের হওয়ার অনুভূতি :
আজ প্রথম দিন আমি কলেজে আসলাম। যতটুকু জানতে পেরেছি, দেখতে পেরেছি খুবই আনন্দিত হয়েছি। একে একে সব পর্ব শেষ হয়ে গেল। এখন বিদায় নেবার পালা। কলেজ প্রাঙ্গণটা ছেড়ে আর আসতে মন চাইছিল না। কবে আবার আসবো কলেজে? কবে থেকে এই কলেজে আবার ক্লাস শুরু করবো? এ সব ভাবতে ভাবতে কলেজ থেকে বেড়িয়ে পরলাম।

উপসংহার : এইচএসসি পরীক্ষা প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটুমাত্র অবহেলার জন্য একজন শিক্ষার্থীর জীবন অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে পারে। একটি সুগঠিত ও সু-শৃঙ্খল বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-ই পারে একটি শিক্ষার্থীর জীবনে আলো ছড়িয়ে দিতে। ঢাকা কমার্স কলেজ এমন সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা দ্বারা আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবো। ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র হতে পেরে সত্যিই আমি নিজেকে খুই গর্বিত মনে করছি। কলেজের প্রথম দিন আমার একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে, যা আমি কোনো দিন ভুলতে পারবো না।

৭ মার্চের ভাষণ

মিনহাজুল করিম বাপ্পি
রোল: ২৮৩৪৯, শ্রেণি: দ্বাদশ

ভূমিকা : বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ৭ মার্চের ভাষণ

যেমন তাৎপর্যবহুল তেমনি সুদূরপ্রসারী। পৃথিবীর ইতিহাসে যে সব ভাষণ বিভিন্ন জাতির মুক্তিসংগ্রামের প্রেরণার মন্ত্র হিসেবে কাজ করেছে তার মধ্যে ৭ মার্চের দেয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করে। এ ভাষণে যেমন যুদ্ধের দিক নির্দেশনা ছিল, তেমনি ছিল মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনলবর্ষী বাণী। এ ভাষণ আকস্মিকভাবে দেয়া হয় নি। এ জন্য পূর্ব থেকেই গড়ে উঠেছিল আন্দোলনের একটা ধারাবাহিক পটভূমি।

ঘটনা প্রবাহ ১৯৭১ এর ৭ মার্চ : ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম যখন তুঙ্গে তখন ৪ মার্চে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সভা এবং স্বাধীনতার শপথ নেয়ার মধ্য দিয়ে দিনটি অতিবাহিত হয়। সারা পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক শাসনব্যবস্থা পুরোপুরি স্থবির হয়ে পড়ে। ঢাকা শহর জুড়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়। সরকারি বেসরকারি অফিস, আদালত, সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্টিমার, লঞ্চ, বাস, ট্যাক্সি, ব্যাংক, ইনসুরেন্স/স্টক এক্সচেঞ্জ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঐদিন বন্ধ থাকে।

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবি : ৪ মার্চ সর্বাত্মক হরতাল এবং চট্টগ্রামে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন সংগ্রাম, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বহ্নিশিখা দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। ঐ দিন খুলনায় বিশাল প্রতিবাদ শোভাযাত্রা বের হয় এবং তাতে পাকসেনারা গুলিবর্ষণ করে অনেককে হত্যা করে। এমতাবস্থায় মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানী এক বিবৃতিতে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সাত কোটি বাঙালির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবি জানান। ঐ বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন কংগ্রেস, খেলাফত, মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের মাধ্যমে বহু আন্দোলন তিনি করেছেন কিন্তু তার ৮৯ বছর বয়সে এবারকার মতো গণজাগরণ ও সরকারের অগণতান্ত্রিক ঘোষণার বিরুদ্ধে এমন উত্তাল বিক্ষোভ ও সংঘবদ্ধ সংগ্রাম আর দেখেন নি।

৪ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর বিবৃতি : ১৯৭১ সালের ৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে শোষণ ও ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য বাংলার আপামর জনসাধারণকে অভিনন্দন জানান। ঐ বিবৃতিতে তিনি বলেন, "বাংলাদেশের নিরস্ত্র বেসামরিক জনগণ তাদের অধিকার কেড়ে নেয়ার বিরুদ্ধে যে সাহস দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে, বিশ্বের জনগণের তা জানা দরকার।

স্বাধীনতার প্রত্যাশা : ৪ মার্চ শহীদ ফারুকের পিতা আফসার উদ্দিন শহীদ ফারুক ইকবালের স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে গিয়ে বলেন, "ফারুককে তিনি হারিয়েছেন কিন্তু বাংলার ৭ কোটি সন্তানকে তিনি পেয়েছেন, তাঁদের স্বাধীনতার আন্দোলনের সাফল্যের মধ্যেই তিনি ফারুককে খুঁজে পাবেন।" ঐ দিন সাংবাদিকরা গণআন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। শিল্পীরাও বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠান বন্ধ করে আন্দোলনে সামিল হন।

ঘটনাপ্রবাহ ৫ মার্চ : ১৯৭১ সালের ৫ই মার্চ টঙ্গী শিল্প এলকায় সেনাবাহিনীর গুলিতে অনেক শ্রমিক হতাহত হয় এতে সমগ্র টঙ্গী শিল্প এলাকা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিক্ষুব্ধ জনতা টঙ্গীর কংক্রিট ব্রিজের পাশের কাঠের ব্রিজটি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। রাস্তা বন্ধ করে দেয়। চট্টগ্রামে নিহতের সংখ্যা দুইশ ছাড়িয়ে যায়। রাজশাহী ও যশোরে সংগ্রামী জনতার উপর পাকসেনারা গুলিবর্ষণ করে অনেককে হত্যা করে। ঐ দিন ঢাকার লেখক ও শিল্পীরা জনতার সঙ্গে সংগ্রামে একাত্মতা ঘোষণা করে। শহীদ মিনারে একত্রিত হয়ে তাঁরা ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে এক সভায় মিলিত হয়ে স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করেন।

ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ: ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্য এক বেতার ভাষণ দেন। তা নিচে লেখা হল:

"প্রিয় দেশবাসীগণ, আস্সালামু আলাইকুম। আমার ১ মার্চের বিবৃতিতে আমি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ উল্লেখ করেছিলাম। একই বিবৃতিতে আমি এ কথাও বলেছিলাম যে, আমি আমার পক্ষ থেকে আমাদের সাধারণ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার অর্থাৎ একটি গণতান্ত্রিক জীবনধারার দিকে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি সাধনের ব্যাপারে আমাদের নির্বাচিত নেতাদের সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য করব। আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে, এই উদ্দেশ্যে আমার সর্বশেষ পদক্ষেপ হচ্ছে ১০ মার্চ ঢাকায় সকল পার্লামেন্টারি গ্রুপের নেতাদের সম্মেলন আহ্বান। দুর্ভাগ্যবশত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ব্যবধান দূর করার এই আন্তরিক ও অকৃত্রিম প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করা হয় এবং আমার আমন্ত্রণে উৎসাহজনক সাড়া মেলে না। অথচ, বেতারের ঐ ঘোষণা প্রচারের আগে তিনি আমাকে ধারণা দিয়েছিলেন যে, তিনি অনুরূপ সম্মেলনের ধারণার বিরোধিতা করবেন না। সুতরাং তার সরাসরি প্রত্যাখ্যান বিস্ময়কর ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক। আপনারা জেনেছেন যে, জনাব নূরুল আমিনও সম্মেলনে যোগ দিতে অসম্মতি জানিয়েছেন। এর অর্থ হল প্রস্তাবিত সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো প্রতিনিধি থাকবেন না। আপনারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, নির্বাচন নিষ্পন্ন হবার পর থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য আমি যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি আমাদের কোনো কোনো নেতা কোনো না কোনভাবে তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন। এই পর্যায়ে আমি এ কথাও উল্লেখ করতে পারি যে, ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন নিষ্পন্ন হওয়ার

পর এবং দু'টি প্রধান দলের নেতাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ও ঢাকায় নেতাদের নিজেদের মধ্যে সাক্ষাতের পর লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়ার একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি বের করার উদ্দেশ্যে আমার সাথে আলোচনার জন্য আমি তাদের একাধিকবার আমন্ত্রণ জানিয়েছি।

আমি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আওয়ামী লীগের সভাপতি আমার আমন্ত্রণে সাড়া দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এর ফলে আমরা একটি সমঝোতাপূর্ণ সমাধানের সুযোগ হারিয়েছি। এর ফলে যে, পরিস্থিতি উৎপত্তি হয় তা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অনুকূল নয়। আমি অধিবেশনের তারিখ স্থগিত রেখে পরিস্থিতিকে বিপদমুক্ত করার চেষ্টা করি। এর দ্বারা আমি দু'টি উদ্দেশ্য পূরণের আশা করছিলাম। প্রথমত পরিষদকে ও পরিষদ গঠনের জন্য ব্যয়িত জাতীয় উদ্যমকে রক্ষা করা এবং দ্বিতীয়ত উত্তেজনা প্রশমন করে ফলপ্রসূ আলোচনা অনুষ্ঠানের সুযোগ দেয়া। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই অবস্থায় কোনো সরকার নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না। সুতরাং নিরীহ জনসাধারণের জানমাল রক্ষার জন্য ন্যূনতম অপরিহার্য ব্যবস্থা গ্রহণ আমার নৈতিক কর্তব্য। আমি অবশ্যই দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, পূর্ব পাকিস্তান অরাজকতার স্থানে পরিণত হয়েছে। কয়েকটা কারণে পরিষদের অধিবেশন উদ্বোধনের তারিখ মুলতাবি রাখার সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি ভুল বুঝা হয়েছে। এ ভুল বুঝাবুঝি দুষ্কৃতিকারীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ঐ ধরনের লোকেরা যখন সুযোগ পেয়ে থাকে, তখন নিরীহ জনসাধারণই সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহায়। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার পশ্চাতে আমার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পরিষদকে টিকিয়ে রাখা। এই উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। অপর সমান গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল ফলপ্রসূ আলোচনার ব্যবস্থা করা। সেটা অর্জিত হয় নি। ইতোমধ্যে অনেক নিরীহ লোকের জীবনহানি ঘটেছে। তাদের শোকার্ত পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রয়েছে। আমি আগেই দেখেছি যে, রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলোচনা করে জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনের একটা তারিখ নির্ধারণের ব্যাপারে আমার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে।

তাই আমি নিজেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে এই দুর্ভাগ্যজনক অচল অবস্থা দূর করা কর্তব্য বলে মনে করছি। আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আগামী ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নে নেতাদের মধ্যে ব্যাপক ভিত্তিক মতৈক্য প্রতিষ্ঠায় আমার প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে যে সব রাজনৈতিক নেতার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তাদের আমি বলতে চাই যে, আইনগত কাঠামোর বিধিবিধান অপেক্ষা আর কোনো নিশ্চয়তার দরকার নেই। পরিশেষে আমি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে চাই যে, যাই ঘটুক না কেন, আমি যতক্ষণ পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর ও রাষ্ট্রের প্রধান থাকব, ততক্ষণ আমি পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ অখণ্ডতার নিশ্চয়তা বিধান করব।

যারা এটি আমার কাছে আশা করে তাদের আমি হতাশ করব না। পাকিস্তানের সংহতি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার নিশ্চয়তা বিধান পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর কর্তব্য এবং এই কর্তব্য পালনে তারা কখনই ব্যর্থ হয় নি। গণতান্ত্রিক জীবনধারার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন ও জাতির আশা অনুযায়ী জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে তাদের কর্তব্য পালনে সক্ষম করে তোলার কাজে আমরা পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সাথে আল্লাহর উপর আস্থা রেখে এগিয়ে যাব। পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।

সংগ্রামী জনতার দুর্বার আন্দোলন : ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান এ ভাষণে বাংলার বিক্ষুব্ধ ও মুক্তিকামী মানুষকে দুষ্কৃতিকারী অ্যাখ্যা দেন। তিনি ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের কথা বললেও আসলে এটা ছিল তার কৌশল ও ভাঁওতাবাজি। এ দিকে ৬ মার্চেও অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণ গতিতে চলতে থাকে। অলি আহাদের সভাপতিত্বে পল্টন ময়দানে জনসভা হয়। ঐ দিন সাংবাদিক ইউনিয়ন, শিক্ষক সমিতি, মহিলা পরিষদ, ছাত্র ইউনিয়ন, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদি দল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান প্রতিবাদ সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করে। টঙ্গীতে শ্রমিক সভা ও বিক্ষোভ মিছিল হয়। ছাত্রলীগ ৬ তারিখ সন্ধ্যায় বের করে মশাল শোভাযাত্রা।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ : ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসে অত্যুজ্জ্বল একদিন। ঐ দিন রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর এ বক্তৃতা বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা দিয়েছিল। যুদ্ধ চলাকালে এ ভাষণ ছিল বাঙালির শক্তি সঞ্চয়ের হাতিয়ার ও প্রেরণার মূলমন্ত্র। ৭ মার্চের জনসভা সম্পর্কে 'দৈনিক পাকিস্তান, পত্রিকায় বলা হয়, স্লোগানের ঢেউ একের পর এক আছড়ে পড়ছে। লক্ষ কণ্ঠে এক আওয়াজ। বাঁধ না মানা দামাল হাওয়ায় সওয়ার লক্ষ কণ্ঠের বজ্র শপথ। হাওয়ায় পত পত করে উড়ছে পূর্ব বাংলার মানচিত্র অঙ্কিত সবুজ জমিনের উপর লাল সূর্যের পতাকা। জাগ্রত বীর বাঙালির সার্বিক সংগ্রামের প্রতীক সাত কোটি মানুষের সংগ্রামী হাতিয়ারের প্রতীক বাঁশের লাঠি মুহুর্মুহু স্লোগানের সাথে সাথে উত্থিত হচ্ছে আকাশ। এই ছিল গতকাল রোববার রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমানের ঐতিহাসিক সভার দৃশ্য। বঙ্গবন্ধু মঞ্চে আরোহণ করেন ৩ টা ২০ মিনিটে। স্লোগানে স্লোগানে সভাস্থলে ক্রমে বেড়ে গেছে সংগ্রামের উদ্দীপনা, শপথের প্রাণবহ্নি। স্লোগানের ভাষা ছিল: জয় বাংলা - জয় বাংলা, আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম, সংগ্রাম, আমার দেশ তোমার দেশ - বাংলাদেশ বাংলাদেশ, পরিষদ না রাজপথ-রাজপথ রাজপথ, ষড়যন্ত্রের পরিষদে - বঙ্গবন্ধু যাবেন না। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়, বাংলাদেশ স্বাধীন কর ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল প্রকৃতপক্ষেই বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণামন্ত্র। বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেন।

"আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে। আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এ দেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলব, এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি বাংলাদেশের করুণ ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, মুমূর্ষু মানুষের করুণ আর্তনাদ - এদেশের করুণ ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস ১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি।

১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয় লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খাঁ মার্শাল ল জারি করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনের সময় আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুব খাঁর পতনের পর ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল। নির্বাচন হল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করেছিলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসব। আমি বললাম এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করব, এমন কি এও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনের মতও যদি তা ন্যায্য কথা হয়, আমরা মেনে নেব। ভুট্টো সাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তিনি বললেন পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বার যদি আসে, তা হলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যে যাবে তাদের মেরে ফেলে দেয়া হবে, যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম এসেমব্লি চলবে। আর হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হল।

আমি বললাম, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। আমি বললাম, আমরা জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরিব দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি।

আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরিবের উপর বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কিভাবে মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, আপনি দেখুন, তিনি বললেন আমি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকব। আমি বলেছি কিসের এসেমব্লি বসবে। কার সঙ্গে কথা বলব? আপনারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছেন। তাদের সঙ্গে কথা বলব? পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমাদের উপর, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন। দায়ি আমরা? ২৫ তারিখ এসেমব্লি ডেকেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। রক্তে পা দিয়ে। শহীদের উপর পাড়া দিয়ে এসেমব্লি খোলা চলবে না। সামরিক আইন মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক লোকদের ব্যারাকের ভিতর ঢুকাতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তাদের তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তার পর বিবেচনা করে দেখব, এসেমব্লিতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে এসেমব্লিতে আমরা বসতে পারি না। আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই।

আমি পারিষ্কার অক্ষরে বলে দিতে চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে 'কোর্টকাচারি আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য যে সমস্ত অন্যান্য

জিনিস আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, শুধু সেক্রেটেরিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, ওয়াপদা কিছু চলবে না। ২৮ তারিখ কর্মীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, এরপর যদি একটা গুলি চলে, এর পর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয় তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব, সৈন্যরা তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাক, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলি করার চেষ্টা করবে না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবে না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন আমাদের কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যাঁরা পারেন আওয়ামীলীগ অফিসে সামান্য টাকাপয়সা পৌঁছে দেবেন। আজ ৭ দিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে। প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারিদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, তত দিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়া হলো। কেউ দেবেন না। শুনুন, মনে রাখুন শত্রু পেছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই, বাঙালি, অবাঙালি তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর। আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন কর্মচারীরা; রেডিও যদি আমাদের কথা না শুনে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয় তা হলে টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারে। পূর্ব বাংলা হতে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম, আমাদের পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে। এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে। বাঙালিরা বুঝে-সুঝে কাজ করবেন, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য : বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অন্যতম মাইল ফলক। এ ভাষণ নানা কারণে তাৎপর্য বহন করে। এই ভাষণের মাধ্যমে তিনি সমগ্র পূর্ব বাংলার মানুষকে সংগ্রামে ও মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন; ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বোপরি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিপুল বিজয় প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামের অগ্রভাগে ছিলেন বঙ্গবন্ধু '৭০ এর নির্বাচনে জয় লাভ করার পরেও পাকসরকার আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে নানা ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এতে বাংলার মানুষ ফুঁসে উঠে এবং পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমে পড়ে রাজপথে। বাংলার আকাশ-বাতাস যখন শুক্রুর বিনাশ সাধনের জন্য উত্তাল জনতা স্লোগানে সংগ্রামে মুখরিত; তখন বঙ্গবন্ধু প্রদান করেন তার ৭ মার্চের ভাষণ। এ ভাষণে তিনি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তাই বলা হয়, ৭ মার্চের গুরুত্ব অপরিসীম।

উপসংহার: এমন বজ্রকণ্ঠ বাংলার মানুষ কোনো দিন শোনে নি। এমন উদাত্ত আহ্বানে কেউ স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বলে নি। ফলে ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক বজ্রনির্ঘোষ বাণী। এ ভাষণ শুনে লক্ষ লক্ষ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের প্রেরণামন্ত্র ছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। এ ভাষণের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রাম শুরু হয়। বাঙালির চেতনায় বিদ্রোহ ও সংগ্রামের আগুন প্রজ্বলনে এ ভাষণের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম।

মেলা

আকিল মেহের লিয়ান
রোল : ৩১৭৬০, শ্রেণি : একাদশ

দুপাশে দুইটি নদীর মাঝে একটি গ্রাম। গ্রামের নামটা জানানোর দরকার নেই বলে নামটা বললাম না। দুই নদীর মাঝখানে হওয়াতে গ্রামটাকে দেখতে অনেকটা ছোট দ্বীপের মতো লাগে। গাছপালা ঘেরা এই গ্রামটাতে যখন মেলা বসে তখন এর চেহারাটাই বদলে যায়। সবচেয়ে বেশি খুশি হয় গ্রামের কিশোর কিশোরীরা 'মেলা বসেছে' এ কথাটা শুনলেই

তারা সবাই ছুটে যায় মেলায়।

১৪ বছরের কিশোর আনোয়ার। বন্ধুদের সাথে ঘুড়ি উড়াচ্ছে। হঠাৎ তাঁর ঘুড়ি কেটে ফেলে তারেক। আনোয়ার বুঝে উঠতে পারে না তারেক এত ভাল ঘুড়ি কিভাবে উড়ায়? তাঁর সুতা কেটে যাওয়া ঘুড়িটা উড়ে পাশের শালবনের দিকে গেল। তাঁর ঘুড়ি যেন অন্য কেউ না আনতে পারে সে জন্য সে দৌড়ে সেটা আনতে গেল। এমন সময় কোথা থেকে যেন দক্ষিণ পাড়ায় ফিরোজ এসে বলল- কিরে তোরা মেলায় যাবি না? জানোস না আইজকা মেলা বইছে। আমি যাইতাছি তোরা আয়। এক বেটায় ময়না আনছে জলদি চল। ফিরোজ ফিরে গিয়ে তাঁর অন্য বন্ধুদেরকে খবরটা দিল। ফিরোজের মুখে একথা শুনে সবাই নদীর ঘাটের দিকে দৌড় দিল। যার পকেটে যা পয়সা ছিল তা দিয়ে ঘুড়ি, লাটিম ইত্যাদি কিনল, চরকিতে চড়ল। আর যাদের পকেটে কিছুই ছিল না তারাও পুরো মেলা জুড়ে ঘুরে ঘুরে সময় কাটালো।

বাড়িতে ফিরল আনোয়ারের মা আনোয়ারকে বলল, “সারাদিন কনে ছিলি? খালি বনেবাদারে ঘুরছ। যা পড়তে বস আনোয়ারের মনে পড়ল যে ফিরোজ তাদেরকে মেলায় যাবার জন্য ডাকতে এসেছিল। এ কথা মনে পড়তেই তার সারা শরীর শিউরে উঠল। রাতে মনের ভিতর ভীষণ ভয় নিয়ে সে ঘুমাতে গেল। কিন্তু সে ঘুমাতে পারল না। পরদিন সকালে সে তার সব বন্ধুদেরকে কথাটা বলতে চাইল, কিন্তু সে কথাটা বলে কাউকে আর দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাইল না।

আসল ঘটনাটি এ রকম, কয়েক মাস আগে এ রকমই এক মেলার সময় চরকি থেকে আছড়ে পড়ে মৃত্যু হয় তাঁদের বন্ধু ফিরোজের। তার পর গ্রামবাসীরা মেলা বন্ধ করে দেয়। যদিও দুই মাস পর আবার বসা শুরু হয়। সবাই ফিরোজের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। আর তাই হয়তো ফিরোজ তাঁর অভাব জানান দিতে আবার এসেছিল...।

মাতৃ স্নেহ

কবুতরগুলোকে খড়কুটা খোপে জমা করতে দেখে মনটা আনন্দে নেচে উঠল শোভনের। তাই সে একবার চতুর্ভুজ আকুতির খোপটা উঁকি দিয়ে দেখেছিল। “হ্যাঁ” উপরের ডান পাশের খোপটাতে তার গিরিবাজের জোড়াটা ডিম পাড়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই আশপাশ থেকে শুঁকনো গাছের ডাল, খড়, এমন কি অন্য পাখির পালকও খোপের ভিতর এনে জমা করছে।

শোভন খোপটা বাইরে কিছু খড়কুটা ফেলে রাখল যাতে তার প্রিয় কবুতরগুলোকে বেশি কষ্ট করতে না হয়। এমনকি খাবারের পরিমাণও বাড়িয়ে দিল। বাজার থেকে পাঁচ মিশালি ও ভাল মানের গম কিনে আনল। এই প্রথম তাঁর কোনো কবুতর বাচ্চা দিচ্ছে। তাই তাঁর আগ্রহের কোনো সীমা নেই। প্রতিদিন স্কুলে যাবার সময় একবার আবার ফিরে এসে আরেক বার নিজে গিয়ে খাবার দেয়। এর মাঝে আরও কয়েক বার তাদের খেতে দেয়া হয়।

সেদিন বিকেলে খেলার মাঠ থেকে ফিরে শোভনের মনটাই খারাপ হয়ে গেল। হঠাৎ করেই তাঁর মা অসুখে পড়ে গেছে। শোভন বারান্দায় দাড়িয়ে আছে। হঠাৎ... শুনতে পেলো তাঁর মা তাকে ডাকছে। সে দৌড়ে তাঁর মার কাছে যায়। মায়ের সত্যিই খুব অসুখ। মা শোভনকে তাঁর কাছে ডেকে মাথায় আর গালে হাত দিয়ে আদর করেন, আরও দেন রাজ্যের উপদেশমালা। মা কাছে ডেকে এভাবে আদর করলে নিজেকে কচি খোকা মনে হয় শোভনের। কিন্তু মা’র দেয়া এসব উপদেশ তাঁর একটুও ভাল লাগে না। মায়ের সব উপদেশ, আদেশ তাঁর নিজের সাজানো দুনিয়ার নিয়ম এর বিপক্ষে।

এরই মধ্যে কবুতরগুলো ডিম পেড়েছে। শোভন যখনই খোপের মুখে উঁকি দিতে যায়, ডিমের উপর বসা কবুতরটা তখনই তাঁর পা’টা বেলুনের মতো ফুলিয়ে ফেলে। এই কাজটা বেশি করে মাদি কবুতরটা। আর বাসার ভিতরে হাত ঢুকাতে গেলে তো কথাই নেই। বিশেষ এক কায়দায় ডানা দিয়ে সজোরে ঝাপটা মারে। অবাক হয়ে যায় শোভন। এই কবুতরটার সাথে সে কত খেলা করেছে। কতবার তাঁর হাতের উপর বসে খাবার খাইয়েছে। অথচ আজ কবুতরটা তাকে চিনছে না, শুধুমাত্র কবুতরটার নতুন আসা বাচ্চাগুলোর কারণে। সন্তানের প্রতি মায়ের আবেগটা এমনই হয়। শুধু মানুষের বেলায় নয়, জগতের সব প্রাণীর বেলায়ও এটি আছে। আর তাই তাঁর কবুতরগুলো সন্তানের জন্য মনিবকেও শত্রু ভাবছে!

মা হাসপাতালে ভর্তি আছে প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে। শোভন দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। তাঁর মাকে আজ হাসপাতাল থেকে আনা হবে। সম্ভবত তাঁর মায়ের অসুখ সেরে গেছে। তা হলে তো সবার খুশি হবার কথা। কিন্তু বাসার সবাই নিশ্চুপ কেন? আজ কেন তাঁর মায়ের কথা বেশি মনে পড়ছে। অনেকদিন না দেখার কারণে বোধ হয়। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। কবুতরগুলো সব খোপের ভিতরেই আছে। বৃষ্টির কারণে আজকে আগেভাগেই খোপে ঢুকে গেছে। ঐ তো অ্যাম্বুলেন্স। অ্যাম্বুলেন্সে ভিতরটা ধোয়াটে। তার যাওয়া উচিত হবে কি? আসলে শোভনের যাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে না। তাই সে এখানেই তাঁর মায়ের জন্য অপেক্ষা করবে। মা এলে নিশ্চয়ই আবার তাকে জড়িয়ে ধরে থাকবে আর কাঁদবে। কিন্তু সে জানে না তাঁর মা আর কোনো

দিনও তাকে ডাকবে না। কোনো দিনও আর তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করবে না, কোনো উপদেশও দিবে না......।

অপেক্ষা

ফাহাত বিন আমিন সিক্ত
রোল : ৩২৩৬৭, শ্রেণি : একাদশ

ছোট থেকেই চিন্তা-ভাবনা কিছুটা এমন ছিল যে কবে বড় হব? আগে অনেক ইচ্ছে করত ভাইয়ার সাথে বাণিজ্য মেলায় যাব, ছোট খালার সাথে বৈশাখে রমনার বটমূল-এ যাব, বন্ধু বানাবো, তাদের সাথে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাসা থেকে সেই ১০ নাম্বার কি একটা ব্রিজ আছে! ঐ খানটায় যাব। বৃষ্টির সময় ঐখানে নাকি অনেক পানি জমে। সাতার না জানলেও সাতার কাঁটা যায়। আম্মু বলত, আগে বড় হ। ভাইয়া বলত, তুই এখনো অনেক ছোট। আমার মতন হ, তারপরে যাস্ । ছোট খালা বলত আরেক দিন!! এভাবেই জিদ ধরে বসে বাড়তে থাকি। স্কুলে যখন যেতাম আর মনে করতাম এই তো একা একা স্কুলে যাচ্ছি আর আসছি। হয়ত আমি বড় হচ্ছি। পরে মনে হল নাহ্। আরো কিছু হয়ত বাকি। বানালাম এত্তগুলো বন্ধু যারা নাকি নিজেদের বন্ধু বলে গণ্য করে, কিন্তু স্বার্থপরের দল। কাটলো ওদের সাথে পুরো স্কুল জীবনটা এই দশ বছরকে মনে হচ্ছিল তুচ্ছ। কিন্তু এখন মনে হয় সেই দশ বছর সোনার ডিমের থেকে কোনো অংশ কম ছিল না। সেই জীবনটাতে অনেক কিছু দেখেছি, করেছি, বুঝেছি। পেয়েছি এবং হারিয়েছিও বটে। বন্ধুরা মিলে স্কুল বাদ দেওয়া। এটা সেই ক্লাস তিন থেকেই দিতাম। ভালই মজা লাগত। লাইফটাই ছিল অন্য রকম। এখনও অনেকে আছে আমার লাইফ স্টাইল নকল করে। শুনতে আসলে ভালই লাগে। আব্বু প্রায়ই বলে, "তোর বড় ভাই মেট্রিক (এস,এস,সি) পরীক্ষা দিয়ে সাড়া ঢাকা শহরের অর্ধেকটা চিনত না। আর তুই মাত্র আট পাশ করেই পরিবার ছাড়া টাঙ্গাইল ভ্রমণে যাস"। যতবার বলে ততবার ভাল লাগে।

আজ আমি কলেজ জীবনে পদার্পণ করেছি। কিন্তু এ কোন বিচ্ছিরি অনুভূতি? আজো মনে হয় আমি সেই ছোট্ট বালকটি। যে ঈদের সকালে গোসল করে মায়ের হাতে এক চামচ পায়েস খেয়ে বাবার হাত ধরে ঈদগাহ মাঠে নামাযের জন্য ছুটে যেত এই মনে করে, আজ সবার আগে তার বাবার কাছ থেকে সে তার ঈদের সালামীটা নিবে। এ কিসের অপেক্ষা যা আজো আমায় ছোট করে রেখেছে?

বোরকা পড়া মেয়েটি

ফিহির হোসাইন
অর্থনীতি বিভাগ (ফাইনাল ইয়ার), রোল : ইকো-২৭৬

প্রায় নয়টা বেজে গেছে। কুমিলা বিশ্বরোডে দাঁড়িয়ে আছি। অহেতোক আধাঘণ্টা সময় পার করেছি-তা কিন্তু নয়। আসার পর থেকে দাঁড়িয়ে থাকা বাসগুলো যে তাড়াহুড়া দেখালো-তাতে মনে হলো বাসগুলো এখনি ছেড়ে যাবে। অথচ একটি বাসও ছেড়ে যায় নি। উপায় না পেয়ে উঠে বসলাম দাঁড়িয়ে থাকা সেমি লোকাল গাড়িতেই। তখনো অনেক সীট পড়ে আছে খালি। ভাবটা জমিদারের হলে কি হবে-ফকিরের স্বভাব কি আর মুছে যায়। মোটেই না। হাত পাতার অভ্যাস জন্মগত পেলে-তা থেকেই যায় মৃত্যু অবধি। একে তো লোকাল তার পর ভাড়া নিচ্ছে জমিদারি স্টাইলে। সাথে এক ঝুঁড়ি বাহানা-রাত অনেক, কোথাও দাঁড়াবে না, রাস্তা ফ্রি থাকলে... আরো কতো মোলায়েম কথা! অথচ রাস্তায় লোকের উঁচু হাত দেখলেই তুলে নিতে আর দেরি হয় না। কিছু বললে, বলবে-মামা, খামু কী? গরিব মানুষ। আপনাদের সদয় পেলেই বাঁচি...

মন মতো সীট নিয়ে বসে আছি জানালার পাশে। বাতাসে ঠান্ডা বইছে। দুপুরের উনুন গরম ভাবটা এখন একদমই নেই। সবুজ গাছের সাথে বৃষ্টি সংযোগটা এভাবেই ঘটে। গ্রামের কাদা মাটিতে সেই টান অনুভব হয়। শহর ছেড়ে গ্রামে গেলেই খালি পায়ে নেমে পড়ি উঠোনে। খালের পাড়ে বসে বাতাসে আড্ডায় মেতে থাকি-রাতের কোলে। খুব ইচ্ছে ছিলো থাকার। ফুটবল ম্যাচ ছিলো। ফসলি ক্ষেতে খেলার মজাটা এখনো পায়ে জমে আছে। শরীরে মাটির গন্ধ মেখে যখন সাঁতরে পুকুরে পার হতাম-বেশ আনন্দ বয়ে যেতো। মনে হতো সব ক্লান্তি স্বচ্ছ পানিতে মিশে গেছে। মাঝে মাঝে পানিতে খেলা হতো। বলি খেলা- ডুব দিয়ে অন্যকে ছুঁয়ে দেয়ার খেলা। কত জোর হলো রাখার জন্য-কিন্তু চলে এলাম। বেশ মিস হলো খেলাটা। তাড়া বলতে-সকালে পরীক্ষা আছে। টিউটোরিয়াল মার্ক আটকে দেবার হুমকি না হলে- যাওয়া হতো না।

চলিশ মিনিট পর গাড়ি চলতে শুরু করে। অর্ধখোলা জানালা। হুড়হুড় করে বাতাস ঢুকছে ভেতরে। চুলগুলো আনন্দে উড়ছে। অদূর আকাশকে মায়ায় ভরিয়ে রাখে সাদা মেঘের কোণে চন্দ্রালোর লুকোচুরি। বন্ধ চোখে শিতল পাটির ঠান্ডা আরাম অনুভব করি। খুব ইচ্ছে করছিলো ফিরে যেতে মাটির ঘ্রাণে, ফেলে আসা সময়ের কোলে। বড্ড মিস করি সেই বেলাগুলোকে। এখনো বেজে উঠে কর্ণের পাতায় মিতালির কণ্ঠস্বর। অথৈ জলের রুপালি ঝিলিকের সেই মিষ্ট হাসি-মেঘ হয়ে আজো উড়ে নয়নসীমায়। হঠাৎ করেই সব পাল্টে গেল।

রোদে ঢাকা আকাশে হঠাৎ বৃষ্টির মতো। সময়ের ব্যবধানে হয়তো আমার কথা মনেই নেই মিতালির। কিন্তু তার স্মৃতিরা আজো রয়ে গেছে আমার কাছে। প্রত্যেহ দেখা হয়-ঘুমের ঘরে, নাস্তার টেবিলে, দুপুরের খাবারে, সন্ধ্যা তারায়, বইয়ের পাতায় আর দেখা হয় ১৫ সেপ্টেম্বরের রাত ১১টায়।

সময়গুলো হেলে পড়েছিলো শরতের বুকে। কাশফুল বাগিচায়। কোচিং শেষ করে বাসায় ফিরছি। মাথায় অন্য চিন্তা। সন্ধ্যা নেমে পড়েছে আরো খানিক আগে। গ্রামীণ সুইটস থেকে লেনসি কিনে একটা রিক্সায় চেপে বসলাম। প্রিয় রিংটোন বেজে উঠে। সেবার রাজশাহী যাবার পথে বন্ধুর সেট থেকে নেয়া। এক সময় এই টোনটি একজনের জন্য স্পেশাল ছিলো। এখন সবার জন্য। রিং টোনের সাথে সেই মানুষটির অহেতোক ভুল বুঝে চলে যাবার স্মৃতিটি-আজো জড়িয়ে আছে। এখনো রিং হয়। সেই টোন বাজে। শুধু বাজে না তাসফির কণ্ঠ। মোবাইল স্কিনে হাবীব স্যারের নাম ভেসে উঠে। বই মেলায় স্যারের একটা কবিতার বই এসেছে। নজরুলের ছাড়াও জীবনানন্দ দাস, জসিম উদ্দিন, এ সময়কার কবি নির্মলেন্দু গুন, মহাদেব সাহা এদের সব ধরনের বই তার পড়া। মজার বিষয় হচ্ছে তিনি রবীন্দ্র ভক্ত। মেলার এই বইটি রবীন্দ্রাঙ্গীয়ভাবে লেখা। শরীরে ক্লান্তি চেপে আছে। তাই না যাবার আকুতি করে ফোন রাখলাম। তার খানিক পড়েই পরিচয় হলো মিতালির সাথে। আমি রিক্সায়। আর সে বাসার ছাদে। অন্য বিভাগের বাসিন্দা মিতালি আর তাসনিমের সাথে আড্ডা জমে উঠার আগেই বাসায় চলে আসি। রাত ১১টায় মিতালি কণ্ঠ আবার বেজে উঠে। কাশফুলের মাঠ ছেড়ে হেমন্তবালিকারা তখন যাত্রার অপেক্ষায়...

শক্ত হাতের ধাক্কায় স্বপ্নজড়ানো ঘুম ভাঙ্গে। বাসের লাইটগুলো জ্বলে আছে। বাসটাও থেমে আছে। কিন্তু বুঝে উঠার আগেই টর্চ লাইটের আলোর সাথে কর্কশ কণ্ঠ ভেসে এলো কানে-ব্যাগে কী আছে? দেশীয় কামরাঙ্গা, আমড়া আর কয়েকটা নারিকেল। ব্যাগটা খুলুন। আর কী করেন? ছাত্র। আইডি আছে। তবে মেয়াদ নেই। মানে? অনার্স করছি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। চার বছরের কোর্স ছয় বছর পার হতে চলেছে। তাই আইডি কার্ডের মেয়াদ নেই। ও স্যারদের বলে সময় বাড়িয়ে নিতে পারতেন। ১০ সালের অনার্স পরীক্ষ ১২ সালে দিচ্ছি। প্রশ্নপত্রে ১২ নয়, ১০-ই লিখা থাকে। কোর্সটা চার বছরের, ছয় বছর নয়। ব্যাগটা খুলে দেখানোর আগেই চলে গেলেন। মাথাটা হেলান দিয়ে আবার চোখ বন্ধ করি। বহুদিন পর চেকিং-এ পড়লাম। বেহুদা সময় নস্ট। সত্যি-ই যদি এভাবে চেকিং হতো-তা হলে দেশ অনেক উন্নত হতো। সন্ত্রাস কমতো। দুর্নীতি হ্রাস পেতো। মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত হতো। অন্তত, একটি রাত শান্তিতে ঘুমুতে পারতো। সবকিছু অভিনয়। লোক দেখানো। ধোঁকাবাজি। প্রবাদে বলে-বেড়া ধান খেলে রক্ষক হবে কে?

লোকগুলোর নেমে যাবার শব্দে চোখের দৃষ্টি পড়লো সামনের সীটগুলোর দিকে। কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। এলোমেলোভাবে। পরিচিত একটি কণ্ঠে বারবার বেজে উঠে-ভাই, আপনারা বসেন। যে যার সীটে বসেন। লোকগুলোর কানাঘুষায় রহস্য জন্মে। 'ইয়াবা'র শব্দ শুনতে পেলাম। ভালভাবে কথাটি কানে তুলতে একটু নড়ে বসি। বাইরে তখনো কালো মাইক্রোবাসটি দাঁড়িয়ে আছে। চেকিংয়ের লোকগুলো গাড়িটা চলে যাবার জন্য হাতে ইশারা করে। গাড়ি চলছে। মেঘনা নদীর উপর দিয়ে। নদীর বুকে পানি নেই। চড় পড়েছে বেশ খানিকটা জুড়ে। সেখানে কেউ বসতি তুলেছে। কেউ ফসলি ক্ষেত। গাছের আঁড়ালে ছোট টিনের ঘরে হারিকেনের আলো মিটমিট জ্বলছে। জানালার পাশে বসা, দু'বেনি তোলা মেয়ের ঝাপসা মুখ চোখে পড়ে। দূর থেকেও বেশ আদুরে মনে হলো সেই চেহারাটি। কানে আবার ভেসে এলো 'ইয়াবা'র শব্দ। কৌতুহল? না অন্য কিছু? তবে পাশের লোকের কাছে কথাটা শুনে বেশ চমকে উঠলাম। বিষয়টা শিউর হতে আবার প্রশ্ন করি-সত্যিই কি? এত সাহস? বেশ ভদ্র মনে হলো। বাস ছাড়ার আগে কন্ডাকটরের সাথে দু'এক কথা কাটাকাটিও হয়েছিলো। পরে তো দুই সীট নিয়ে যাচ্ছিলেন। কী করে সম্ভব হলো? আর তারাও তো বুঝে গেছে কিভাবে যেন। না হয় কি করে সেমি বোরকা পড়া

মেয়ের কাছ থেকে এগুলো উদ্ধার করবে? পাশের জন বলে উঠলেন, ফেনী দিয়ে ভারত থেকে এসেছে মনে হয়। সে যাই হোক, তাই বলে একজন মেয়ে এ কাজটি করবে। তাও বোরকা পড়ে! বোরকা এখন ফ্যাশন হয়ে উঠেছে, বুঝলেন ভাই... লোকগুলো বকবক করেই যাচ্ছে। ধীরে ধীরে রাজনীতির ২য় মঞ্চে রূপ নেয়। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠে সকলে। অথচ নিজের দিকে কেউ একবার ফিরে তাকায় না। যে দোষটা আজ অন্যে করেছে বলে অন্যায় ভাবছি, সে দোষটা যদি কাল আমার দ্বারা না হতো কিংবা হলেও দোষ ভাবতাম, তা হলে এ দেশ সত্যি বদলে যেতো। যাগগে, সে নিয়ে ভাবছি না। ভাবছি-একটু আগে যাকে মাইক্রোবাসে করে ইয়াবাসহ তুলে নিয়ে যাওয়া হলো, তার কথাও ভাবছি না। ভাবছি সেই বোরকা পড়া মেয়েটির ছোট্ট শিশুর কথা। এখনো দু'বছর হয়নি-শিশুটির। গাড়িতে উঠতেই নজর পড়েছিলো। পাশের সীটেই আরেকজন মহিলা ছিলেন। তার সাথে বসতে বলা হয়েছিল এই বোরকা পড়া মেয়েটিকে। রাজি হন নি। উল্টো

ঝেড়ে দিলেন কনডাকটরকে। কী হবে ভবিষ্যৎ এই ছোট্ট ছেলেটির? আদৌ কি থাকবে এই মায়ের কোলে সেই ছেলের জন্য ভালবাসা? তা হলে কী করে সম্ভব হলো?-অবুঝ ছেলেকে সাথে নিয়ে ইয়াবার জগতে নিজের নাম তুলে নিতে...

গাড়ি চলছে আপন বেগে। লোকগুলোর তর্ক ধীরে ধীরে থেমে পড়ে। অর্ধ খোলা জানালা দিয়ে গুড়ি বৃষ্টির ফোটা গায়ে এসে মাখে। রাত তখন এগারোটা ত্রিশ মিনিট। রিং টোনের প্রিয় গানটি বেজে উঠে-'কবিতায় বলেছিলে, চন্দ্র রাতে তুমি আসবে কাছে, এর পর কেটে গেছে-কত না- ভরাপূর্ণিমা, স্বপ্নেতে বলেছিলে, বৃষ্টি এলে ডাকবে কাছে, এর পর বয়ে গেছে, কত না বরষাধারা...

এই তো আমি

ফরহাদ হোসেন

রোল : ৩১৫৩৯, শ্রেণি : একাদশ

* কিরে প্রিয়তা, বাংলার পাঁচ এর মতো মুখ গম্ভীর করে রেখেছিস কেন? কী হইছে তোর?

* কিছু না এমনি।

* আবার বলে কিছু না, পেঁচার মতো মুখ করে রেখেছিস, গালে হাত দিয়ে বসেছিস, ক্যাম্পাসের ফুলের দিকে তাকিয়ে আছিস, তার সাথে আবার গান ও শুনতেছিস,

'মাঝে মাঝে তোমায় ভেবে, এলোমোলো লাগে সবই
মাঝে মাঝে তোমার চোখে, কে আঁকে অন্য ছবি।'

তাও বলছিস কিছু না। আরে বল বল এই তো আমি, আমাকেই তো বলবি তাই না কারো প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছিস নাকি। তোকে কত বার আমি ছাড়া আর কারো প্রেমে পরিস না, তাও কি না তুই....

* চুপ করবি তুই।

* ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে, এই চুপ করলাম। এই ছোট্ট ভাই একটু এদিক আসতো।

* জি ভাই বলেন, কী বলবেন?

* এই নাও ১০ টাকা, দোকান থেকে একটা ললি পপ কিনে নিয়ে আসো তাড়াতাড়ি।

* ঠিক আছে ভাইয়া।

* তুমি ললি পপ দিয়ে কী করবি?

* তুই না বললি চুপ থাকতে, তাই ললি পপ চুষব আর তার কথা শুনবো।

* দেখ ফাজলামির একটা সীমা আছে।

* যা বাবা, কথা বললেও দোষ আবার ললি পপ চুষলেও দোষ।

* ওফফফ আবার শুরু করলি সুহান।

* এই দিকে তাকা, এই দেখ কান ধরলাম। ধরছি না, বল ধরছি না।

* হ্যাঁ, তো।

* তোর সাথে আর ফাজলামি করব না। বল তোর কী হইছে?

* আচ্ছা বলতাছি, তার আগে কানটা তো ছাড়।

* ও তাই তো। বাচাইলিরে, তা না হলে সবাই আমাকে চিড়িয়াখানার প্রাণী মনে করত।

* হি হি হি.... তুই পারিসও বটে, মানুষকে হাসাতে।

* হিম, জানি জানি সবই জানি, শুধু তোকেই বুঝতে পারি না।

* কী?

* কিছু না। তা বল, তুই কি ভাবতেছিলি?

* জানিস সুহান, আমি একজনকে ভালবেসে ফেলেছি।

* না না না... এ হতে পারে না।

* মানে কি সুহান, কী হতে পারে না?

* কিছু না। ওমর সানি হওয়ার চেষ্টা করছিলাম।

* সুহান তরে যদি কষাইয়া একটা চড় মারতে পারতাম....

* তুই কি ভেবেছিস, আমি বসে থাকব। তুই কষাইয়া দিবি, আর আমি চুলায় রান্না করে খেয়ে ফেলব।

* সুহান.....

* ভাইয়া, এই নেন আপনার ললি পপ।

* ভাই, তুই সঠিক সময়ে এসে আমার জীবন বাঁচাইলি। তার বিনিময়ে ললি পপ তুই খেয়ে ফেল।

* আমারে কি আপনার মতো বাবু পাইছেন? আপনারটা আপনিই নেন।

* ঠিক আছে, একসময় ঠিক আছে। আমি খুব খুশি হইছি। এইবার ললি পপ চুষ, আর আমি দেখি কী ভাবে বাবুরা ললি পপ খায়।

* প্রিয়.....

* সুহান, ঐ নীল কালারের শার্ট পড়া ছেলেটাকে দেখছিস। ঐ ছেলেটাকেই আমি ভালোবাসি। ছেলেটা দেখতে অনেক সুন্দর তাই না। কিরে, চুপ করে আছিস কেন? কিছু তো বলবি নাকি।

* আচ্ছা তোরা মেয়েরা এ রকম কেন?

* কী রকম?

* তোরা সুন্দরের মাঝে কী পাস, যেটা আমার মতো শ্যামল মানুষের মাঝে খুঁজে পাস না। মানলাম আমি তোর চেয়ে সুন্দর না, তাই বলে কি আমার মনটাও সুন্দর না। কাউকে

ভালবাসতেও পারি না।

* দেখ সুহান, তুই আমার বন্ধু। আমি তোকে বন্ধুই ভেবেছি।

* কিন্তু আমি তো তোকে ভালবেসেছি।

* সুহান একটা কথা ভাল করে শুনে রাখ, বন্ধু হয়ে পাশে থাকলে থাক, আর না থাকলে চলে যা। আমার সামনে আর আসবি না।

* ঠিক আছে, আমি তোকে ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু যাবার আগে তোকে অভিশাপ দিয়ে গেলাম, তুই কোনো দিনও আমাকে ভুলতে পারবি না। এই তো আমি হয়েই পাশে থাকবো চিরদিন।

"সুহান দাঁড়া....... তোর রাগটা আজও কমলো না সেই কলেজ থেকে এ রকমই করে আসছিস। জানি তুই কালকে আবার আগের মতো কথা শুরু করবি।"

দশ দিন পর–

* রিফাত শুনো, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।

* হ্যাঁ আমি জানি তুমি কী বলবে।

* তুমি জানো!

* আমিও তোমাকে কিছু বলব। যেগুলো শুনা তোমার খুব জরুরি।

* হ্যা বলো, কী বলবে আমি শুনবো।

*তুমি ভালবাস আমাকে, আর আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে তোমার বন্ধু সুহান। যে কি না তোমার ভালবাসাকে মরতে দিলো না। গত ছয় দিন আগে আমার মার দুটি কিডনি নষ্ট হয়ে যায়। তাকে বাঁচানোর একটাই পথ ছিল। একটি কিডনি তাকে দিতেই হবে। আমি জানি না, সুহান কিভাবে সে সংবাদ পেল। আর সে এসে বললো, 'এই তো আমি' তোমার মার কিছু হবে না। আমি তোমার মাকে কিডনি দিব। সুহানের কিডনিতে আজও আমার মা বেঁচে আছে। এখানেই শেষ না, তোমাকে আসল কথাটাই বলা হয় নাই। সুহান যাবার আগে বলে গিয়েছিল, আমার কিছু চাই না। শুধু প্রিয়তাকে তুমি সুখে রেখো। যে তোমাকে অনেক ভালবাসে। কিন্তু আমি এত স্বার্থপর হতে পারব না। যেখানে আমি কিডনি দিলে সুস্থ থাকব না, সেখানে তোমার জন্য আমাকে ভাল রেখে সুহান তার নিজের কিডনি দিলো। আমি জানি তার থেকে বেশি ভাল কেউ তোমাকে বাসতে পারবে না। আর একটা কথা মনে রেখ, "একটা সুন্দর মেয়ে যখন একটা সুন্দর ছেলেকে ভালবাসে তখন মেয়েটির ভয় থাকে ছেলেটিকে হারানোর। কারণ ছেলেটি ভাবে এর চেয়েও সুন্দর মেয়ে পাব। কিন্তু একটা সুন্দর মেয়ে যখন একটা শ্যামলা ছেলেকে ভালবাসে তখন মেয়েটির ছেলেটিকে হারানোর কোনো ভয় থাকে না। কারণ ছেলেটি জানে তার জীবন থেকে যদি এই মেয়েটি হারিয়ে যায় তা হলে এর চেয়ে ভাল মেয়ে আর পাব না। ছেলেটি মেয়েটিকে এত ভালবেসে ফেলে যে, মেয়েটিও জানে না।"

- প্লিজ রিফাত। তুমি থাম, সুহান এখন কোথায়?

- আজই হাসপাতাল থেকে বাসায় যাবার কথা।

কিছুক্ষণ নীরব হয়ে যায় চারপাশ। প্রিয়তা আপন মনে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। রিফাত দেখতে পায় প্রিয়তার গাল বেয়ে পানি মাটিতে পরছে। রিফাতের অনেক কষ্ট হয় কিন্তু কিছুই বলতে পারে না। হঠাৎ প্রিয়তা যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ায়। রিফাত তাকে আর আটকাতে চায় না, নিজের বুকের সমস্ত কষ্ট চেপে রেখে ভাবে এই পানিই যেন তার চোখের শেষ পানি হয়।

হঠাৎ কলিংবেলের আওয়াজ দরজা খুলে দিলেন সুহানের মা। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। কিছুটা অন্য রকম লাগছে তাকে, আগের দেখা সেই ছটফটে মেয়েটার সাথে কিছুতেই মিলাতে পারছেন না তিনি এই প্রিয়তাকে।

- তুমি হঠাৎ। কাঁদছো কেন?

- আন্টি, সুহান কোথায়?

- ও তো মা ওর মামার বাসায় চলে গেছে। এখন থেকে নাকি ও সিলেটেই থাকবে। কিন্তু কেন তা কিছুই বলেনি।

- আন্টি আমাকে একটু ওর কাছে নিয়ে যাবেন প্লিজ।

অঝর ধারায় চোখ থেকে পানি পরছে প্রিয়তার। শত চেষ্টা করেও কেন যেন সে তার পানিকে আটকে রাখতে পারছে না।

- তুমি কাঁদছ কেন? কী হয়েছে তোমার?

- আমার কিছুই হয় নি। প্লিজ আন্টি, আমাকে নিয়ে চলুন ওর কাছে।

- আমি তো এখন যেতে পারব না তবে আমি শিমুলকে বলছি, ও তোমাকে নিয়ে যাবে।

ট্রেনে চলতে শিমুলের ভালই লাগে। কিন্তু আজ একটু কেমন যেন, সামনে থেকে এভাবে কোনো মেয়েকে কাঁদতে দেখে নি সে। কলেজ পড়া তার এই ছোট্ট মাথায় যেন কিছুতেই ঢুকছে না এই বিষয়টা। আগ-বাড়িয়ে কিছু বলতেও সাহস হচ্ছে না। হঠাৎ মনের অজান্তেই বলে ফেলল সে "কী হয়েছে আপু?" একটু যেন ঘাবরে গেছে শিমুল।

- তুমি বুঝবে না। তোমার মামার বাড়ি আসতে আর কতক্ষণ?

- এই তো চলে আসছি। স্টেশন থেকে নেমে দু'মিনিট লাগবে। প্রিয়তা জানে স্টেশন আসতে আর বেশি সময় নেই, তবুও কেন যেন এই সময়টুকু তার অপেক্ষা করতে ইচ্ছা করছে না। সুহানের মুখে সে প্রায়ই শুনতো অপেক্ষার মুহূর্ত নাকি যন্ত্রণার হয়। স্টেশন থেকে নেমে একটু বাম দিকে মোড় নিয়ে তিনটা বাড়ি পরই একটা দোতলা বাড়ি। সামনে নামে মাত্র বাগান। মাঝ-বয়সী এক ভদ্রলোক প্রায় মরে যাওয়া গাছটার দিকে তাকিয়ে আফসোস করে যাচ্ছে। শিমুলের ডাকে হকচকিয়ে ফিরে তাকাল ভদ্রলোক।

- মামা, সুহান ভাইয়া কই?

- ও তো শুয়ে আছে। বেচারার উপর যে ধকল গেল। ওই রকম অবস্থায় এতটা জার্নি।

- মামা কোন রুমে আগে সেটা বলো না আপু ঢাকা থেকে আসছে ভাইয়ার সাথে দেখা করতে।

অপু সাহেব এতক্ষণে খেয়াল করলেন শিমুলের সাথে একটা মেয়েও এসেছে। এমন সুন্দর মুখের মেয়ে খুব কমই দেখেছেন তিনি। মুখে আর কিছু বলতে পারলেন না। আঙ্গুল দিয়ে দোতলার উত্তর পাশের ঘরটা দেখিয়ে দিলেন। সাথে সাথেই শিমুলের হাত ধরেই মেয়েটা ছুটন্ত পরীর মতো বাড়ির ভিতর চলে গেল। অপু সাহেব আবার তার গাছটার দিকে নজর দিলেন।

সুহান আসার পর থেকেই শুয়ে আছে। একটু একটু ঘুম লাগছে, হঠাৎ তার ঘরে কেউ ঢুকল। চোখ মেলে দেখল, 'প্রিয়তা'। মনে মনে হেসে উঠল সে। ট্রেনে ঘুমের মাঝেও সে কয়েকবার প্রিয়তাকে স্বপ্ন দেখেছে। ভাবছে জেগে জেগে ভালই স্বপ্ন দেখা যায় তো। পাশ ফিরে শুতে চাচ্ছে, কিন্তু ব্যথার জন্য মুখ থেকে একটু শব্দ বেরিয়ে গেল। সাথে সাথেই একটা মেয়ে কণ্ঠে কেউ বলে উঠল "আস্তে"।

- নিজের খেয়াল কবে রাখতে শিখবি।

- তুই....ই। এখানে !!!

- তুই আমাকে ফেলে চলে এলি কেন?

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রিয়তা সুহানের চোখের দিকে। সুহানের সামনে আজ যে প্রিয়তা তাকে সে আগে কোনো দিন দেখে নি। কিছুই উঠতে পারছে না সুহান। প্রিয়তার দিকে তাকিয়ে আগোছালো কথায় বলেই ফেলে সে, 'ভালবাসবি আমায় এমন করে আজীবন।' প্রিয়তা কিছু বলে না, শুধু চোখ থেকে তার পানি গড়িয়ে পরে। সুহান আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না। প্রিয়তার চোখের জল মুছে দিয়ে কাছে নিয়ে বলল, "কাঁদছিস কেন? এই তো আমি।"

সেই দশ টাকা আর দেয়া হলো না, বেলা ১২:৩০

মোঃ গোলাম রাব্বানী
রোল : ২৯২৪১, শ্রেণি : দ্বাদশ

ঘণ্টা পড়ল কমার্স কলেজের। কলেজের করিডোর অতিক্রম করে বাইরে বেড়িয়ে আসলাম। রীতিমত আমরা পাঁচ বন্ধু–আমি, ইমা, সাদিয়া, তানভীর ও শোভন কিছুক্ষণ গল্পগুজব করলাম। তার পর আমি ওদের বললাম, আমি আজকে নানার বাসায় যাব। তোরা থাক আমি চললাম। বলাবাহুল্য, কমার্স কলেজের ছাত্র বলে, কোথাও বেড়াতে গেলেও ক্লাস শেষ করে যেতাম। AC খাওয়ার ভয়ে!! রাইনখোলা বাজারের সামনে বাসস্ট্যান্ড এ গেলাম।।

গন্তব্য "রাইনখোলা বাজার–সদরঘাট"

সেই অনুযায়ী লাল, হলুদ, সাদা রং দিয়ে ডিজাইন করা নীল রং এর তানজীল বাসে গিয়ে ওঠলাম। যাত্রীতে গমগম করছিল বাসটা। কিন্তু বাসটি সনি হলের সামনে যেতেই খালি হয়ে গেল। মিরপুর ১ নম্বর বাসস্ট্যান্ড এ গিয়ে বাসটি যাত্রী বোঝাই করা শুরু করল। খুব বিরক্ত লাগছিল কারণ, সকাল ৮টা থেকে কলেজ করার পর শরীরটা অনেক ক্লান্ত ছিল। আর বাসায় গিয়ে একটা ঘুম দিব, তবু বদলে করছি লোকাল বাস জার্নি। ১৫ মিনিট পর যাত্রীদের চাপে পড়ে ড্রাইভার ধীরগতিতে বাসটি চালাতে আরম্ভ করল। ভালই চালাচ্ছিল বাসটি। তাই হালকা হালকা নিদ্রা আসতে শুরু করল। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা নিজেও জানি না। হঠাৎ করে শোরগোলে আচমকা ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। দেখি বাসটি আসাদ গেট এ জ্যাম এ বসে আছে। আর আমার পাশের সিট এ একটি মেয়ে এসে বসেছে। তার সাথে কন্ডাকটারের ভাড়া নিয়ে শোরগোলের কারণেই আমার ঘুম ভেঙ্গেছে। তার পর অনেক চেঁচামেচি করে মেয়েটি হাফ ভাড়া দিল, কিন্তু কন্ডাকটার যখন বললো, "আপনার আইডি কার্ডটি দেখান"। মেয়েটি জবাব দিল যে, "আইডি কার্ড কি সাথে নিয়ে ঘুরব?" কন্ডাকটরে আর কথা না বাড়িয়ে সামনে চলে গেল। সিগন্যালও ছেড়ে দিল আমি ভাবতে ছিলাম যে, ক্ষমতার জোর মেয়েরা এখন যেভাবে বাসেও দেখানো শুরু করেছে নিশ্চয়ই কয়েকদিন পর বাইক আর হকি স্টিক নিয়ে তারা মাঠেও নামবে মারামারি, করতে চাঁদা তুলতে। বাস চলছে, খামারবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতে আর কোনো সিগন্যাল এ পড়তে হলো না। কিন্তু খামার বাড়ির সড়কে ঢুকতেই বিশাল সিগন্যাল মনে

হলো। ৩০-৪০ মিনিটের মধ্যে এ সিগন্যাল ছাড়বে না। গরমে খুব ঘামছিলাম, প্যাকেটের শেষ টিস্যুটিও শেষ হয়ে গেল। পানির খুব তেষ্টা পেয়েছে। তাই খুঁজছিলাম কোনো ফেরিওয়ালা পানি বিক্রি করছে নাকি। কিন্তু আমার চোখ গেল একটি শিশুর দিকে যার বয়স ৮-১০ বছর। কালো বর্ণের, চুলগুলো এলোমেলে কিন্তু চেহারাটির মধ্যে অন্যরকম এক লাবণ্য আছে। তবে তার হাত-পাগুলো ছিল পাটকাঠির মতো চিকন। পেট আর পিঠ একসাথে লাগানো ছিল। আর কাঁধের দুপাশের হাড় বের হয়ে আছে। খালি গায়ে, পড়নে একটি ছেড়া হাফ প্যান্ট। পায়ে নেই কোনো জুতা। কোলে রয়েছে ২-৩ বছরের একটি উলঙ্গ শিশু। আর হাতে রয়েছে কিছু গোলাপ ফুল। যেই ফুলগুলো ছিল আকারে খুব ছোট, ছড়ানো-ছিটানো। আর সেই লাল গোলাপগুলোর মধ্যে পড়েছে কালো আবরণ।

গোলাপগুলো আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, "ভাই গোলাপগুলো নিবেন? ১০ টাকা। আফা খুশি অইবো।"

আমি বিব্রতবোধ করলাম, কে আফা। পরে বুঝলাম ঐ বাচ্চাটি আমার পাশে বসা মেয়েটিকে বুঝিয়েছে। তখন আমি বললাম, "না, নেব না।" আর না বলার সাথে সাথে বাচ্চা ছেলেটি আমাকে একটা অশীল কথা বলে দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি কিছুটা অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু অতটা গায়ে নিলাম না ব্যাপারটা। কিন্তু যেতে না যেতেই বাচ্চা ছেলেটি আবার আসল। এসে আমাকে বলতেছে, "ও ভাই ফুলগুলো নেন। টাহা না লইয়া গেলে মায়ে খাইতে দিবো না।" হঠাৎ করে আমি একটু নড়ে বসি, জানালার বাইরে মাথা বের করে ছেলেটার সাথে একটু কথা বলতে ইচ্ছে হলো।

প্রথমে আমি একটু নরম সুরে ছেলেটিকে বললাম, "নাম কী তোমার? ছেলেটি বলল, "নয়ন"। ওর কথা বলা দেখে অবাক হলাম। কারণ কিছুক্ষণ আগে যে ছেলেটি আমাকে অশীল একটা গালি দিয়ে চলে গেল, তার তখনকার সাথে এখনকার রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি ওর সাথে কথা বলছিলাম–

আমি ঃ বাড়ি কোথায় তোমার?

নয়ন ঃ বাড়ি নাই, রাস্তায় থাকি।

আমি ঃ তোমার কোলে ওইটা কে?

নয়ন ঃ আমার ভাই।

আমি ঃ তোমার মা-বাবা কোথায়?

নয়ন ঃ কামে গেছে।

আমি ঃ তোমার মা-বাবা কী কাজ করেন?

নয়ন ঃ আব্বায় মাইনষের গাড়ি মোছেন আর মায় ভিক্ষা করে।

আমি ঃ তা তুমি তোমার ভাইরে নিয়ে বের হইছ কেন?

নয়ন ঃ আব্বায় কইছে আমার আর ভাইয়ের খাওনের টাকা লইয়া গেলে খাইতে.....

বাকি কথা আর শুনতে পারলাম না। বাসটি চলতে শুরু করল। নয়নের সাথে কথা বলার মাঝেই পকেট থেকে দশ টাকা বের করে রেখেছিলাম। কিন্তু তা আর দেয়া হল না!

ওর শেষ কথাটুকুতে বুঝতে পারলাম যে, যদি সে টাকা জোগাড় করে নিয়ে যেতে পারে তবেই ওর দুইটা খাওয়া জুটবে। শুধু তাই নয়, ওর ভাইয়েরটাও জোগাড় করতে হবে। আসলে শিশু বয়সে বাচ্চাদের মনটা অনেক ভাল থাকে। তা না হলে বাবা-মা ছেলেকে খাবার দেয় না। অথচ ভাই ভাইকে নিয়ে খাবারের টাকা জোগাড়ের জন্য রাস্তায় বের হয়েছে। তাই সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যে বাসটা সদরঘাট এসে পৌঁছিয়েছে বুঝতেই পারি নি।

বাস থেকে নামলাম, সেখান থেকে নানার বাসা ত্রিশ টাতা রিক্সা ভাড়ার পথ। কিন্তু রিক্সা না নিয়ে হেঁটে গেলাম ভাবছিলাম এই বাচ্চাটির কথা। দশ টাকাটা (যেটা ঐ বাচ্চাটাকে দেবো বলে বের করেছিলাম) এখনো সেটি খুব যত্নে রেখে দিয়েছি। সেদিন আমিও আর খেতে পারলা না। রাতে বসে চোখের সামনে ঘটা এই ঘটনাটা লিখতে বসে চোখের দুগন্ড বেয়ে জল এলেও তা ঝরতে দেই নি। কারণ যে দিন আমরা এই বাচ্চাদের জন্য কিছু করতে পারবো সে-দিনই চোখের আনন্দের জল ফেলব। আসুন আমি আপনি, আমরা প্রতিদিন না পারি সপ্তাহে। সপ্তাহে না পারি মাসে, বেশি দূর নয় আমাদের কলেজের সামনেই এই রকম শিশুদের আমরা দেখে থাকি। আসুন আজ একটা পিজা না হয় নাই খেলাম, বিভিন্ন প্রসাধনী নাই কিনলাম। এসব খরচ না করে কিছু টাকা দিয়ে তাদের একবেলা অন্তত মুখে অন্ন তুলে দেই। তবেই আমরা বলতে পারবো যে, আমরা কিছু শিখতে পেরেছি। বইয়ের সাদার উপর কালো লেখার জ্ঞানেই আমরা সীমবদ্ধ নই। আর এই কমার্স কলেজের উদ্যোগে আমরা এদের কিছু সহায়তা করতে পারি। ধীরে ধীরে সমগ্র দেশের মানুষের সহায়তা নিয়ে আমরা একটি সুন্দর গোলাপ ফুটতে সহায়তা করি। যেই গোলাপে থাকবে না কোনো কালেঅ আবরণ। ফুল যেমন গাছে দেখতেই সুন্দর ঠিক সেই শিশুগুলো দেখতে সুন্দর স্কুলে।

রাস্তায় নয়।

আমার অপ্রকাশিত বাবা

কার্নিজ পারভীন অর্থি

রোল : ৩০৩৭০, শ্রেণি : একাদশ

আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় সারা শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে ১০৪-১০৫ ডিগ্রি এর মধ্যে

ছুটাছুটি করা শুরু করে। সাথে যোগ হয় বমি-ইনপুট আউটপুট সেম পাথওয়ে। ডাক্তার চাচা এসে বলল অন্য সিস্টেমে এপাই করা লাগবে মানে ইন্ট্রাভেনাস স্যালাইন দিতে হবে। স্যালাইন আনা হলো এবং পুশ করা হলো। এরপর আমি চুপ করে ঘুমিয়ে পড়ি। হঠাৎ দেখি আমার রুমে লাইট জ্বলছে ঘড়িতে রাত ৩টা। আমার বাবা খাটের উপর বসে হাত দিয়ে স্যালাইনের ব্যাগটা উঁচু করে ধরে আছে আর ঝিমাচ্ছে। আমি কল্পনাও করিনি যে কেউ একজন এই ধরনের কাজ করবে? অনেস্টলি..... আমার বাবা এই কাজ করে আমি ভাবিও নি। যার কাছ থেকে কোনো কিছু পেতে হলে ৫/৬ দিন ঘ্যান ঘ্যান করতে হয়েছে। যাই হোক বাবাকে ডাক দিয়ে একটা কথাই বললাম.... স্যালাইন তো শেষ যাও ঘুমাও গিয়ে। বাবার সাথে কিছু সময় ক্যাচক্যাচানির পর সে চলে যায়। এরপর যে মনে মনে কী ভেবে ছিলাম সেটা আর মনে নাই। তবে চোখ দিয়ে পানি পড়ে ছিল। সেই থেকে বাবার প্রতি চিন্তাভাবনা পুরো পাল্টে যায়। আসলে বাবার ভালবাসা সহজে দেখা যায় না। খুব কম সময়ের জন্য মাঝে মাঝে ধরা পড়ে। নিজের মতো করে এটা অনুভব করে নিতে হয়।

হুমায়ুন আহমেদ একটা কথা বলেছিলেন, "পৃথিবীতে অনেক খারাপ মানুষ আছে কিন্তু খারাপ বাবা একটাও নাই।" আসলে তাই, আজ বাবা কথা দিচ্ছি তোমায়, তোমার সকল চাওয়া পাওয়া ও স্বপ্ন পূরণে আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

কলেজ মানিয়ে নেওয়ার ম্যানুয়েল

নিজেকে নিয়ে ভাবতে ভালবাসে না এমন মানুষ জগতে খুঁজে পাওয়া যাওয়াই বেকার। কিন্তু দুনিয়ার অধিকাংশ ভাবনাই গঠনমূলক হয় না। কী পেলাম আর কী পেলাম না, এ-নিয়ে যাতে আমরা সময় নষ্ট না করি। বরং নিজেকে নিয়ে ভাবতে গেলে ইতিবাচক ভাবনাটা ভাল নয় কি? স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে আর কাটখোট্টা দারোয়ানি পড়াশোনা ছাড়িয়ে বড় হওয়ার প্রথম স্বাধীনতা দেয় কলেজ। তারুণ্যের প্রথম উচ্ছ্বাসে শিহরণের বর্ণিল সময়ের অনুসন্ধান দেয় কলেজ। উচ্চ শিক্ষায় এই প্রথম যেমন থাকে আনন্দের স্বাধীনতা তেমনি থাকে হাজারটা সমস্যা। অনেকে সহজে সামলে নিতে পারে। কিন্তু কারো কাছে ব্যাপারটা হয় জটিল কোনো গোলক ধাঁধা। জীবনে পথ চলতে গেলে বন্ধুর প্রয়োজন আছে। কলেজেও তার ব্যতিক্রম নয়। কলেজে যে ছেলেটি, মেয়েটির সাথে আপনার পরিচয় হয় সে কিন্তু কখনো আপনার প্রেমিক প্রেমিকা নয়। এই ধারণার বাইরে এসে ছেলে মেয়েদের তফাৎ না করে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলুন। মন প্রাণ সঁপে চোখের জলে না ভেসে খোলা মনে বন্ধুর দিকে হাতে হাত দিন। আর ছেলেরা কখনো সুপিয়রিটি কমপেক্সে ভুগবেন না। মেয়েরা কখনো কোনো ক্ষেত্রে আপনার চেয়ে কম যোগ্য নয়। আর একটা কথা মনে রাখা জরুরি, প্রতিভার মূল্যায়ন পরিবার থেকে অঙ্কুরিত হয়। মেধা থাকা এবং তা পারিবারিক ভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে বাড়ানোর মূল্যায়নের আওতায় পড়ে। মেধা প্রতিভায় মূল্যায়ন করার অর্থ হচ্ছে যোগ্যতাকে মূল্যায়ন করা এবং জাগিয়ে তোলা সর্ব প্রথম পিতা-মাতা ও পরিবারের কাছে মেধার প্রকাশ হয়। উৎসাহ উদ্দীপনা পেলে তা বাড়তে থাকে আর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও অন-উৎসাহিতো করলে তা দমে বা কমে যায়। পৃথিবীতে পরিচর্যা ও উৎসাহ উদ্দীপনার রাস্তায় যে যত বেশি এগিয়ে চলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তত সৃজনশীল শিক্ষিত নামি দামি হিসেবে গড়ে ওঠে।

এখন অনেক রাত

জাহিদ হাসান শুভ

রোল : ২৮২৮৪, শ্রেণি : একাদশ

ঐ অন্ধকার রাতটা যখন ঘুমিয়ে পরলো; অন্ধকার রাতে আকাশের ঐ চাঁদটা যখন ঘুমের পরশ আবেশে আকাশের বুকে মুখ লুকানো এখন আকাশের তারাগুলো ক্লান্তির ছায়া ঝিক্‌মিক্ করে জ্বলে চলছে অবিরাম। যখন শহরের কোলাহল থেকে মানুষসহ সমস্ত প্রকৃতি ছুটি নিয়েছে যখন সকল আলো একে একে নিভে গিয়েছে, তখন একাকী হয়ে তারা জেগে আছে।

যখন অনেক রাত তার বিছানায় শুয়ে আছে। বিছানার ঠিক পাশেই বড় একটা জানালা। জানালা খুললেই দেখা যায় রাতের আকাশ। সারা তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। সারা এবার এস.এস.সি পরীক্ষার্থী। এস.এস.সি পরীক্ষার আর মাত্র পঁচিশ দিন বাকি। বিছানায় শুয়ে সারা তার মা এর কথা চিন্তা করছে। আর চোখ থেকে অনবরত বৃষ্টি ধারা তার বালিশ ভিজিয়ে দিচ্ছে। সারার মা রেবা মারা গেছেন মাত্র ছয় মাস হল। বাড়ি থেকে শোকের ছায়া এখন ভালভাবে কাটে নি। সারার মানসিক পরিস্থিতি ও তেমন একটা ভাল না। অথচ তার পরীক্ষার আর মাত্র পঁচিশ দিন বাকি। একবার মনে করেছিল এবার এস.এস.সি পরীক্ষা দেবে না। কিন্তু তাকে এই পরীক্ষা দিতেই হবে। কারণ তার মা রেবার বড় সাধ ছিল একমাত্র মেয়ে সারা এস.এস.সিতে খুব ভাল রেজাল্ট করবে। তিনি নিজে মিষ্টির দোকানে গিয়ে মিষ্টি কিনবেন আর পরিচিত সবার বাড়িতে মিষ্টি বিতরণ করে সেই সুখবর দেবেন। সারা খুব ভাল ছাত্রী।

বরাবরই ক্লাসে প্রথম হয়ে আসছে। এর পেছনে অবশ্য মুখ্য ভূমিকা ছিল ওর মায়ের। রেবা সারাকে খুব স্নেহ করতেন। সারাকে সব সময় পড়াশুনায় মনোযোগী হওয়ার জন্য পরামর্শ দিতেন। সারা যখন পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যেত তখন রেবা সারার টেবিলে এক গাস দুধ নিয়ে হাজির হতেন। সারা খেতে চাইতো না আবার মাকে নাও বলতে পারত না। রোজ রাতে সারাকে রেবা নিজ হাতে ভাত খাইয়ে দিতেন। সারার পড়াশোনার প্রতিটি ধাপে ধাপে রেবা প্রেরণা যুগিয়েছেন। এস,এস, সিতে ভালো একটা রেজাল্ট করার জন্য সব সময় উৎসাহ দিয়েছেন। অথচ ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস হঠাৎ একটা রোড এ্যাক্সিডেন্ট এলোমেলো করে দিয়ে গেল সারার সবকিছু। মা চিরবিদায় নিলেন সারার কাছ থেকে। আজ সকালে সারা নাস্তা খেয়ে তার পড়ার টেবিলে বসেছে। মনে মনে চিন্তা অবশ্যই তাকে ভাল রেজাল্ট করতে হবে। এক এক করে দিন কেটে যেতে থাকে তার পড়ার প্রতি মনোযোগ সারা ও তীব্র হতে থাকে। এভাবে ঘনিয়ে আসে তার এস.এস.সি পরীক্ষা। প্রথম পরীক্ষায় সারা খুব নার্ভাস হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে তা কেটে যেতে থাকে। প্রতিটি পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরে এসে সারা ভাবে। আজ আর মা বেঁচে থাকলে তাকে কতই না উৎসাহ দিতেন। সারা যতক্ষণ পড়ত ততক্ষণ পর্যন্ত রেবা জেগে থাকতেন। আর পরীক্ষা দিতে যাবার সময় রেবা মনে মনে কি যেন সব দোয়া পড়ে সারার মাথায় ফুঁ দিয়ে দিতেন। পরীক্ষার ফলাফলের প্রকাশের দিন ঘনিয়ে আসছে। যেদিন রেজাল্ট বেরুলো সারা সেদিন বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা রিক্সা নিল স্কুলে যাবার জন্য। আজ তার মা বেঁচে থাকলে কতই না টেনশন করতেন? সারার চেয়ে যেন মায়ের টেনশন বেশি হতো। এক সময় সারা স্কুলে পৌছে যায়। রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে এগিয়ে যায় স্কুলের ভেতরে রেজাল্ট দেখতে। সারাকে ওর বান্ধবীরা এগিয়ে এসে অভিনন্দন জানায়। সে এবার এ + পেয়েছে। দৌড়ে যায় রেজাল্ট দেখতে। নিজ চোখে সে দেখল সত্যিই সে এ+ পেয়েছে। রেজাল্ট দেখার পর সারা এতটাই আনন্দিত হল যে, ক্ষণিকের জন্য সে ভুলে গেল যে তার মা আর নেই। দ্রুত বাড়িতে ফিরে গিয়ে চিৎকার করে তার মাকে ডেকে বলল, মা, মা শুনে যাও তোমার আশা পূর্ণ হয়েছে। আমি এ+ পেয়েছি। সত্যিই আমি এ+ পেয়েছি। তাড়াতাড়ি চলো মিষ্টির দোকানে। চিৎকার করতে করতে হঠাৎ তার চোখ পরে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা বড় ফ্রেমে বাঁধাই করা রেবার ছবিটার দিকে। সম্বিত ফিরে পেয়ে মুহূর্তেই নীরব হয়ে যায় সারা। শুধু দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে কয়েক ফোঁটা জল। আজ সারাদিন সারাকে নিয়ে অনেক মাতামাতি হল। সবাই অভিনন্দন জানালো সারাকে। এক সময় বাসায় সাংবাদিক এল তার সাক্ষাৎকার নেবার জন্য। সাক্ষাৎকারে সারা বলল, আমার এই রেজাল্ট এর পেছনে আমার মায়ের ভূমিকাই মুখ্য। হয়তো মা আজ বেঁচে নেই। কিন্তু আমি আমার প্রতিটি কাজেই আমার মায়ের অস্তিত্ব অনুভব করি।

সারার এই সাক্ষাৎকার প্রায় সকল পত্রিকায় ছাপা হল। টেলিভিশনে দেখানো হল। আজ মানুষ সারাকে দেখতে পেল। শুধু দেখতে পেল না সারার মা রেবা। সারাদিন পর প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই রাত্রি ঘনিয়ে এল। বিছানায় যাওয়ার আগে সারা তার টেবিলের একটি ড্রয়ার খুলে বের করল মায়ের সেই নীল ডায়েরিটা। যেখানে সারাকে উৎসর্গ করে তার মা একটি কবিতা লিখেছিলেন।

পদ্ম পাতার জল

তার পর একদিন আমি চলে যাব তোকে ছেড়ে
আমাকে খুঁজে নিস্ তুই তোর হাজার কাজের ভীরে।
আমি যখন চলে যাব ঐ দূরাকাশে
ওপারে তাকালেই দেখতে পাবি আমি আছি ঐ তারার দেশে।
আমাকে অনুভব করিস তুই ঐ দু'চোখ বুজে
স্মৃতির পৃষ্ঠা উল্টালেই পাবি তুই তখন আমাকে খুঁজে।
অশ্বত্থ শাখার মত তুই যখন আনন্দে আন্দোলিত হতে থাকবি
তখনও তোর পাশে তুই শুধু আমাকেই খুঁজে পাবি।
জীবনের চরম বিপর্যয়ে তুই যখন হয়ে যাবি একাকি
তখন ও জেনে রাখিস আমি হব চলার পথে তোর একমাত্র সাথী
এভাবে তোর হাসি আর কান্নায় প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে,
আমি থাকবো শুধু তখন তোর অন্তরের মাঝে,
তার পর একদিন
আমি এসে বলবো মেঘে মেঘে হল অনেক বেলা, এবার
আমার সাথে চল কারণ
জীবন সে তো ক্ষণিকের জন্য শুধুই পদ্ম পাতার জল।

কবিতাটি পড়ার পড় সারা তারা অশ্রুসিক্ত নয়ন নিয়ে চলে গেল বিছানাতে। সারা এখন তাকিয়ে আছে আকাশের ঐ তারগুলো দিকে। হঠাৎ ঐ দূরাকাশের একটি তারা অতি উজ্জ্বলভাবে জ্বলে উঠল। সে দেখতে পেল সেই তারার দেশ থেকে মা তাকে হাতছানি দিয়ে বলছে সারা সোনামনি আমার আমি তোর সাথে আছি সব সময়।

আমার দোয়া সব সময় তোর সানে আছে এবং থাকবে।

এরপর হঠাৎ করে। তারাটি মিনিয়ে পেল আকাশের বুকে। চারিদিকে বিরাজ করছে নমে নমে নীরবতা।

মুমূর্ষু রূপকথা

মাহামুদুল হাসান
রোল : ৩২২২৬, শ্রেণি : একাদশ

দুপুর একটা। চতুর্থ তলা, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। বারান্দায় আছি আমি। দাঁড়িয়ে নয়, শুয়ে আছি। একটা ট্রলিতে শুইয়ে রাখা হয়েছে আমাকে। কেন? কর্তব্যরত চিকিৎসক খানিক আগে আমাকে মৃত ঘোষণা করেছে। হ্যাঁ! ভুল পড় নি, মৃত এবং শারীরিকভাবেই। ঘটনা তো এখনো বলা হয় নি। এবার একটু পিছনে ফিরে যাই।

সকাল দশটা। গ্রামের বাজার মোড়, সোনা টাওয়ারের বিপরীতে এক লাইব্রেরির সামনে মোজোর বোতল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বোতলে চুমুক দিচ্ছি আর ভাবছি। ভাবছি জীবনের এত বড় সময় পার করে আমি কিছুই করতে পারি নি। শুধুই লাঞ্ছনা ভোগ করেছি। আব্বুর বকা, বন্ধু মহলের তুচ্ছ ভাব, রেজাল্ট খারাপ করা ইত্যাদির। আব্বু প্রায়ই বলত, 'দ্বীপ তোকে দিয়ে কিছুই হবে না। বাবলাম এই জীবন রেখে কী লাভ? তাই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার নিদ্ধান্ত নিলাম। তবে আমি চাই কেউ যেন বলতে না পারে যে আত্মহত্যা করেছি। এজন্য ঘিরে লোকজনের ভিড়। বুঝতে বাকি রইল না আমি মরে গেছি। আবার হাসপাতাল এ ফিরে আসি। আমার লাশের পাশে আমার বন্ধু রিসালাত। বেচারাকে খুব ভীতু বলে মনে হচ্ছে। তাও সে আমার মৃত্যুর খবর সবাইকে বলতে লাগল মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। অনেকে বলে মৃত মানুষ নাকি দেখতে পায় না। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার বাবা-মা গাড়ি করে হাসপাতালে আসছেন। বাবা-মা আসার আগে দাদু, নোমান, নোবেল, সায়মা, মৃদুল এরা চলে আসল। সবাই আমার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে। সায়মা আর বর্ষা এরা জোরে কাঁদছে। দাদুকে বললাম তাদের থামাতে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির কথা কি আর কেন যায়। দুর্ঘটনা আমার মাথা ও মস্তিষ্ক আলাদা হওয়ার কারণে মুখ ঢেকে রাখা হয়। তাই বাবা-মা যখন আসে তখন তারা বলে, এটি আমার ছেলের লাশ নয়। আম্মু আমার বন্ধুদের কাউকে দেখলে বলছে, 'তুমি আমার দীপুকে দেখেছ। দুপুর একটায় আমার সব বন্ধু চলে এল। দুপুর দুইটার দিকে আমার লাশ এক লাশ বহনকারী গাড়িতে উঠানো হয়, আমার নিজ বাড়ি শরিয়তপুরে কবর দেওয়ার জন্য। বিকাল পাঁচটায় বাড়ি পৌঁছে যাই। সেখানে গোসল করানো হয়। কাফনের কাপড় পড়ানো হয় সবাইকে আমার শেষ মুখ দেখানো হয়। এবার অনেকে মিলে আমার খাটিয়া ধরে কবরের কাছে নিয়ে যায়। আমাকে কবর দেওয়ার হচ্ছে। সবাই আমার জন্য কান্নাকাটি করছে। অনেকক্ষণ পর এবার তাদের জন্য মায়া হতে লাগল। যারা আমাকে তুচ্ছ ভাবত তারাই এবার কাঁদছে। আর সেই কাঁদাটা আমার জন্য। তাদেরকে একটু ছুয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু পারছি না। বলতে ইচ্ছে করছে আমি আবার তোমাদের মাঝে ফিরে আসতে চাই। মনে একটি ভয় ঢুকে গেছে। আর কখনো বন্ধু বান্ধব, মা-বাবার সাথে কথা বলতে পারব না। মধুর 'মা' বলে ডাকতে পারব না। কথাটা মনে করে আমার বুক যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত এক যন্ত্রণা কাজ করছে। মনে হচ্ছে মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। যে ভুল কখনো মিটানো যায় না। সবাই আমার মাগফিরাতের জন্য। কালিমা শাহাদৎ পড়ছে। আমি কবরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি আর শুধু আর্নেস্ট হেমিংয়ের বিখ্যাত বাণীটির কথা মনে পড়ছে–

"আজ যে কারণে তুমি আত্মহত্যা করলে,
কাল সে চাহিদা মিটে গেলে
তুমি আর আত্মহত্যা করতে না।"

পিছুটান

মাহতাব উদ্দিন আহমেদ (মাহিন)
রোল : ৩১৪৪৮, শ্রেণি : একাদশ

বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে নিহাম। দ্রুত পেছনে ছুটছে রাস্তার পাশের ঘরবাড়ি, গাছপালা, অপরিচিত মানুষ। ঝাপটা হয়ে আসছে চারিপাশ। চশমাটা খুলে নেয় সে। দৃষ্টি খোলাটে হয়ে আছে। পরিষ্কার করার ইচ্ছা বা তাড়া কোনটাই নেই। কিছুটা গড়িয়ে গাল ভেজাচ্ছে, ঘুকিয়ে যাচ্ছে। আবার ভরে উঠছে চোখের পাতা। বাস জোরে জোরে সামনে যাচ্ছে। পেছনে পড়ে থাকছে পথ। অনেক পথ। আরও কিছু জিনিস পড়ে থাকছে পেছনে। একটা পুরনো শহর, কিছু পুরনো মুখ। অশ্রু ভেজা মুখ। নিহাম ছুটছে নতুন শহরে, নতুন সব অপরিচিত মানুষের ভিড়ে।

"ভাইয়া! ভাইয়া!" ছোট কচি হাতে দরজা ঠেলে ভেতরে আসল আদিবা। "জী আপু!" সাথে সাথে জবাব দিল নিহাম। আদিবা ওর দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। ওর চোখে মুখে উচ্ছ্বাস ভরা হাসি। অবুঝ নিষ্পাপ হাসি। খিল খিল শব্দ করছে সেটা। "আসেন, আসেন" হন্টু গেঁড়ে দুহাত বাড়িয়ে বলল নিহাম। আদিবা আরও জোরে ছুটে আসছে ওর দিকে। কাছে

এসে ঝাপিয়ে পড়ল ভাইয়ার বুকে। ভাইয়া দুই হাতে উপড়ে ছুড়ে দিল। ওর হাসি যেন দশগুণ বেড়ে গিয়ে প্রতিধ্বনি হলো চার দেয়ালে। বুকে শক্ত ভাবে জড়িয়ে কপালে চুমু দিল নিহাম। "আদুমনি আমার। সোনা আপুটা" জড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আধো-আলোছায়ায় ঘরটা অপূর্ব লাগছে। "আদু? আদুমনি কই?" ভাইয়া" আদিবা ছুটে আসল। এখন ওর খাওয়ার সময়। ভাইয়ার কাছে সুজি খাবে। আম্মু জোর করে খাওয়ায়। আর ভাইয়া আদর করে ধীরে ধীরে। তাই সুযোগ পেলেই ভাইয়ার কাছে খায় সে। কোলে করে জানালার পাশে নিয়ে গেল নিহাম। আদিবা খুব শান্ত। একটু পর পর হা করছে আর নিহাম ওর গালে তুলে দিচ্ছে। নিহাম বাইরে তাকিয়ে আছে আনমনে। পুকুরের পানিতে লাল সূর্যের আলোটা কেমন রক্তের মত দেখাচ্ছে "ভাইয়া তুই কাঁদছিস! নাবিলার কণ্ঠে সম্বিত ফিরে পেল ও। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, কি বলিস? কই?- ভাইয়া তোর চোখ ভেজা কেন?

- আরে ধুর পাগলি! ভুল দেখছিস তুই। এই দেখ? কিছু নেই। ভাইয়া আমি বাচ্চা মেয়ে না।

- হুম জানিরে। আমার পাগলিটা কত বড় হয়ে গেছে! এই তোর না কয়দিন পরে পরীক্ষা! যা পড়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

- ভাইয়া......

কথা শেষ করতে দিল না ওকে। আদিবাকে নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল নিহাম।

শহরের রাজপথগুলো সব সময়ই তার প্রিয়। নিহাম রাজ পথে হাটতে ভালবাসে। গোধূলি বেলায় ধুলোর ঘ্রাণটা তার খুব প্রিয়। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো সে। রাস্তাগুলো একবার হাটতে ইচ্ছা করছে। বড় ব্রিজটার রেলিংয়ে বসে সূর্যাস্ত দেখতে ইচ্ছা করছে খুব। রক্তিম আভায় রাঙা হতে ইচ্ছা করছে আর একটা বার। বাবু খেতে আয়। দেখ কি রান্না করেছি!" আম্মু ডাকল। অনেক উচ্ছ্বাস নিয়ে। নিহাম দেরি না করে ছুটে গেল ডাইনিংয়ে।

বিরিয়ানির ঘ্রাণে ময় ময় হয়ে আছে ঘরটা। সাথে ইলিশ ভাজা। দুটোই ওর খুব প্রিয়। তাড়াতাড়ি খেতে বসল। আম্মু পাশে দাঁড়িয়ে। "খাইয়ে দিব?" আম্মু এমনি দিন জোর করলেও খাইয়ে দেয় না। কিন্তু আজ কেন যেন চাচ্ছে। নিহাম মুচকি হেসে হা করল। আম্মু খাইয়ে দিচ্ছে। আজ অনেক সময় নিয়ে খাচ্ছে সে। খাওয়ার পর আম্মুর আঁচলে মুখ মোছা তার প্রতিদিনের অভ্যাস। আজ কেন যেন অনেক সময় নিয়ে আঁচলটা মুখে ধরে রাখল সে। এরপর হঠাৎই নিজের ঘরে চলে গেল কিছু না বলে।

আজ বাড়িতে নিহামের শেষ রাত। কাল ঢাকায় চলে যেতে হবে স্থায়ীভাবে। বহুদিনের জিদ ঢাকায় পড়ার। কাল সেই জিদ পূরণ হচ্ছে। তবুও খুশি লাগছে না ওর। আজ পুরনো শহরটা হঠাৎ মায়ায় টানছে। আর কবে বাড়িতে আসা হয় সেটা ভেবে এটা সেটা নেড়ে দেখছে ও। "ভাইয়া" দরজা ঠেলে ভেতরে আসল আদিবা। কোলে নিল নিহাম। এখন ওর ঘুমানোর সময়। প্রতি রাতেই ভাইয়ার কোলে ঘুমায় ও। ভাইয়া গুন গুন করে গান শোনায়। চুপ করে শোনে। বুকে মাথা রেখে এক সময় ঘুমিয়ে যায়। আজ আকাশে এত্ত বড় চাঁদ উঠেছে। উঠানটা রুপালি আলোয় ঝলমল করছে। কিন্তু আজ গান গাইতে ইচ্ছা করছে না নিহামের। আদিবা ছাড়ছে না। গান না শোনালে ঘুমায় না সে। কাঁপা কাঁপা স্বরে গান গাচ্ছে নিহাম। গাল বেয়ে নোনা জ্বল গড়িয়ে পড়ছে আদিবার মাথায়। আদিবা ও গালে হাত নেড়ে খেলা করছে। নাকে-মুখে আঙ্গুল গুজে দিচ্ছে। নিহাম ওকে শক্ত করে জড়িয়ে থাকল। অনেকক্ষণ। আদিবা ঘুমিয়ে গেছে। চাঁদটা এখন মাথার উপরে। নিহাম সেভাবেই দাঁড়িয়ে আছে উঠানের মাঝে।

ভোর ছয়টা বাস। নাশতা করে ব্যাগ নিয়ে রেডি নিহাম। নাবিলা ওর থেকে একটু দূরে দূরে থাকছে কেন যেন। ওর চোখগুলো কেমন ফুলে আছে। আম্মু আদিবাকে কোলে নিয়ে হাসছেন। কিন্তু তার চোখ ভেজা। আব্বু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। আদিবা ওর কোলে আসার জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। ওর কোলে নিতে ইচ্ছা করছে না। আম্মুর অনুরোধে কোলে নিল। এখন আদিবা আর কোল থেকে নামছে না। জোর করে আম্মুর কোলে দিয়েই সবাইকে বিদায় জানিয়ে বেড়িয়ে পড়লো। "আসি" শব্দটা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। গলা ধরে আসছিল। তবুও মুচকি হেসে বলল। গেট থেকে বের হবার পর আদিবার গলা শোন গেল। "ভাইয়া! ভাইয়া" নিহাম পিছে ফিরে দেখল না। আদিবা কান্না করছে। সাথে অন্য সবাই। কিন্তু আদিবার গলাটাই কেন যাচ্ছে শুধু।

বাসে হর্নের প্রচন্ড শব্দে ঘুম ভেঙে গেল নিহামের। নিহাম জানালা দিয়ে বাইরে দেখছে। দ্রুত পেছনে চলে যাচ্ছে পথ। পুরনো শহর আর পুরনো মানুষগুলো। ঝাপসা লাগছে চার পাশ। নিহাম ছুটছে নতুন শহরে। নুতন অপরিচিত মানুষের ভিড়ে। সব পিছুটান ছিড়ে.....

সর্বশেষ পৃষ্টা

মাহমুদুল হাসান

রোল : ৩২২২৬, শ্রেণি : একাদশ

আজকের সকলটা অন্যরকম লাগছে। কেমন জানি সারা

শরীরটা ঝিম ধরে বসে আছে। উঠতে মন না চাইলেও জোর করে বিছানা ছেড়ে উঠতে হচ্ছে। কারণ আজ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হবে। যে করেই হোক না কেন শ্রেণিকক্ষে আগে পৌঁছাতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি করে শার্টটা বদলে এবং স্কুলের পুরনো প্যান্টা পড়ে রওয়ানা দিলাম। চাচা-চাচি দু'জনেই অফিসে। ঘরের কাজের বুয়ারও কোন হদিস নেই। তাই নিজের টিফিন নিজেই বানিয়ে নিয়েছি। অবশ্য মা এখানে থাকলে এই কাজটি হয়তো করতে হতো না। আজকে কেন জানি আমার গ্রাম আর মা-বাবার কথা মনে পড়েছে।

শ্রেণিকক্ষে যখন ঢুকলাম তখন দেখি আজ সবাই আগে আগে উপস্থিত। সবাই আজ ফলাফল নিয়ে উদ্বিগ্ন। বিগত পাঁচ বছরের পরীক্ষার প্রশ্নের চেয়ে আমাদের এই বছরের পরীক্ষার প্রশ্ন ছিল অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কঠিন হলেও আমি পরীক্ষাটি নিজের মতোই দিয়েছে। তাই ভাল হওয়ার কথা। শ্রেণি শিক্ষক ক্লাসে যখন প্রবেশ করলেন তার চেহারায় কেন জানি একটা গম্ভীর ভাবের প্রকাশ পাওয়া গেল। যদিও এটি তার চেহারায় সব সময় পাওয়া গেলেও আজ একটু বেশি পাওয়া গেছে। একে একে সকলের হাজিরা ডাকার পর, এখন ফলাফল ঘোষণা করার পালা। এখন সবাই দোয়া দরুদ পড়া শুরু করল। একে একে সকলকেই দেয়া হলো সবাইকে খুব খুশি দেখালো। এবার আমার পালা। খুব ভয় হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বিশ্বযুদ্ধে যাওয়ার আগে সৈন্যরা যে অস্ত্র ঠিক সেই রকম। স্যার প্রথমে আমাকে দেখল এবং বিষণ্ন মনে বলল, তুমি এবার দু'টি বিষয়ে ফেল করার কারণে উত্তীর্ণ নও। শুনেই অত্যন্ত হতোভম্ব এবং কান্নায় ভেঙে পড়লাম। সবাই খবরটি শুনে একে অপরের সাথে ঠাট্টা করা শুরু করল। আমি আর কান্না থামাতে পারলাম না। হঠাৎ করে মনে হলো কী যেন আমার পেছন থেকে ঝাঁপটে পড়েছে। মুহূর্তেই সব কিছু নিশ্চুপ আর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সবকিছুই বাক বোর্ডের মতো কালো হয়ে গেল। পাঁচ-দশ মিনিট পর সকলেই আমাকে অজ্ঞান হয়ে নিচে মেঝেতে পড়ে যেতে দেখে থমকে গেল। কিছুক্ষণ পর আমি চোখ খুললাম। মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। পি,টি, স্যার আমাকে জিজ্ঞেস করলে, তুমি ঠিক আছো তো? স্যারের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে আমি স্যারকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কী হয়েছিল, স্যার? তুমি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। চিন্তা করো না এখন তোমার বিশ্রাম নেওয়া উচিত, বাসায় যাও। স্যারের কথা ঠিক ভেবে বাসায় চলে গেলাম। সব কথা খুলে বললাম, রেজাল্টের কথাও বললাম। চাচা-চাচি সব কথা শুনে অজ্ঞানের চেয়ে রেজাল্টের উপর বেশি রাগান্বিত হলেন। চাচি বললেন তোর পড়াশোনা কোনো জন্মেও হবে না। আর তোর এই ভন্ডামি বাবা বহুত দেখেছি মাইর খাওয়ার ভয়ে আর কত অভিনয় করবি? চাচা-চাচির সাথে একমত, তিনিও অনেকক্ষণ ধরে বকাঝঁকা করলেন, চাচা রাগের মাথায় কয়েকটা কষাঘাতও করলেন। তখন বাবা-মা এর কথা অনেক মনে পড়ল। তারা থাকলে কখনই এমন ব্যবহার করতেন না তারা। আজ অল্প হলেও পরবর্তীতে ভাল করার জন্য আশ্বাস দিতেন।

(দুই মাস পর)

বর্তমানে ক্লাসে সকলেই গোপনে আমাকে নিয়ে অনেক কিছু বললেও তারা এবার গতবারের থেকে অল্প হলেও ভিন্ন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বড় ভাই বলেও ডাকে অবশ্য এই নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যেও তর্ক-বিতর্ক দেখা যায়। আসলে বিষয়টা 'বড়ভাই, ডাকা নিয়ে নয়। তাদের আলোচনার বিষয় হলো আমার বিগত ৪ বছর ধরে পুরো শ্রেণিতে ১ম থেকে ১৫ তম এর মধ্যে থেকে এসেছিলাম কিন্তু হঠাৎ এই বছরে কেন আমার এতটা অবনতি? কোনো কোনো স্যার মনে করেন আমি বোধ হয় নেশাগ্রস্থ বা মাদকাসক্তদের সঙ্গদোষে এরূপ হয়ে গেছি। তবে কয়েকজন তাদের সাথে একমত পোষণ করেন নি। তাদের ধারণা আমি সে রকম হয়ে গেলে সকলের সাথে শুধু আমারই দ্বন্দ্ব লাগত।

অনেক দিন পর হঠাৎ করেই আমার খোজ খবর নিতে বাবা গ্রাম থেকে চিঠি পাঠিয়েছেন। মনে খুব আনন্দ পেলাম, অনেক দিন হলো বাড়ি থেকে কোনো চিঠি আসে না। চিঠির শুরুতে আমার শরীরের অবস্থার কথা জানতে চেয়েছেন, আমার যাবতীয় অন্যান্য সবকিছু আর তাদের অবস্থা। আর সর্বশেষ আমার নতুন ক্লাস ও তাদের চিঠির উত্তর। উত্তরটি মনে হলো আমার জীবনের সবচেয়ে আত্মঘাতী প্রশ্ন। প্রথমে কি লিখব ভাবতে পাড়ছিলাম না। আর কিছু লেখার আছে কিনা সেটাও জানতাম না। মনে হলো নিজের দোষের কারণে নিজের চুল ছিড়ে ফেলি। কতক্ষণ টানা হেচড়া করলে দুমুটো চুল ছিড়ে এসেও যায়।

পরের দিন মাথাটা প্রচণ্ডভাবে ব্যথা করছিল। ভাবছিলাম আজকে স্কুলে যাব না। চাচিকে বললে চাচি বললেন তোমার আবার ফেল করার শখ জেগেছে? আর ন্যাকামো না করে জলদি স্কুল যাও। চাচির কথায় পড়ে ঠিকভাবে রওয়ানা দিলাম। ক্লাসে ঢুকতে মাথার যন্ত্রণা আরো বেড়ে গেল। নাম ডাকার সময় আমার নাম ডাকা হলে আমাকে দেখে স্যার আচমকা থমকে গেলেন, আমার চেহারা আর চুল দেখে তিনি বললেন; ঠিক আছে। তো? মাথার যন্ত্রণা এতই যে বুঝতে পারলাম না কী বলব তা বলার আগে সব কিছুই অন্ধকার। যখন চোখ খুললাম তখন দেখলাম আমার মাথায় ব্যান্ডেজ

করা। সারা জামা-কাপড় কে যেন পাল্টে দিয়েছে। আগে কী ঘটেছিল তা কিছুই মনে পড়ছিল না। তবে চারদিক দেখার পড় মনে হল আমি হাসপাতালে আছি। কিছুক্ষণ পর স্যার আর ডাক্তার আসলে তাদের দু'জনেরই মুখটা খুব বিমর্ষ দেখালো। স্যারকে পুরো ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলে, স্যার কিছু সময় নিয়ে বললেন তোমার, "ব্রেইন ক্যান্সার হয়েছে। শুনে মনে হলো যেন সারা বিশ্বের ভার কেউ যেন আমার বুকের ওপর দিয়েছে। আর ডাক্তার বললেন তোমার বাচার সুযোগ ৫০-৫০তবে তোমার যথাযথ চিকিৎসা করলে একটা সুযোগ রয়েছে। তবে আমার যে কোনো বাচার সুযোগ নেই তা তাদের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

কয়েক দিনেই খবরটা সকলের কাছে ছড়িয়ে গেল। এখন সব সময় আমাকে নিয়ে তালিমে দোয়া পড়া হয়। আজকে আমার স্কুলের পুরনো এবং নতুন সহপাঠীরা দেখা করতে এসেছে তারা সকলেই আমার জন্য কেউ ফুলের তোড়া উপহার, সুস্থ হওয়ার জন্য চিঠি, ইত্যাদি প্রতিদিনই কিছু না কিছু পেয়ে থাকি। আজ হলো সেই ক্যান্সার ধরা পড়ার পর থেকে ৬ষ্ঠ মাস চলছে। প্রতিদিনই আমার অতিবাহিত সময়ের হিসাব কষি। আগের দিনের কথা আর বর্তমানের তুলনা করি। সকলের ভালবাসার মাঝে আমার দুঃখের কথা ভুলে যাই। তবে আমার মনে হয় আমার চেয়ে সবচেয়ে বেশি দুঃখি। আমার মা আর বাবার প্রতিদিন অশ্রু ঝরতে দেখে নিজে অশ্রু আর আটকে রাখতে পারি না। প্রতিদিন আমি চিন্তা করি, আর কত সময় পাড় করতে পারবি? আরও কত কিছু সময় পার করতে পারবে? সব সময় একটা ভয় মনে ঘুরাঘুরি করে। এখন ঘুমাতে খুব ভয় হয়। এই ঘুম কি আমার শেষ ঘুম হবে। পরে কি আবার একটা ভালবাসা পূর্ণ সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল দিন পাব? নাকি এক পলকেই শেষ হয়ে যাবে আমার জীবনের শেষ পৃষ্ঠা?

মহাপুরুষ প্রিয়

মোঃ জায়েদ হোসেন নূর

রোল : ৩২৩৭৫, শ্রেণি : একাদশ

রোজ সকালে পাশের ফ্লাটের মেয়েটা আমাদের বাসার কলিং বেলটা টিপে চলে যায়। সম্ভবত আমাকে জানানোর জন্য যে সে স্কুলে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম দরজা খুলতাম। আমাকে এক ঝলক দেখেই দৌড় দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেত। নিচের তলায় গিয়ে লিফট এ উঠে একদম নিচ তলায় নেমে যেতো।

প্রতিদিন একই কাজ করত মেয়েটা শুধু শুক্রবার ছাড়া। ঘুম থেকে আমার প্রতিদিন ওঠা ওর কলিং বেলের শব্দ শুনেই। ঘটনাটি প্রথম ঘটে যখন আমার আম্মু ওদের বাসায় প্রথম দিন যায়, তার পরদিন থেকে।

আগে ওরা এ বাসায় এসেছিল। আম্মু প্রথম দিন বলেছিল আমার ছোট ছেলে খুব ঘুমায়। সকালে ঘুম থেকে এত দেরি ওঠে। তার পর থেকেই এই অবস্থা। এখন সকালে আর ঘুমাতে পারি না। দুই বছর ধরে ওর কলিংবেলের আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙছে। অথচ ওর সাথে আমার কোনোদিন কথা হয় নি। কয়েকবার ও কথা বলার চেষ্টা করলেও আমি সুযোগ দেই নি। আমি খুব কম মানুষের সাথেই মিশি। যখন পেরেছি ওরা সারাজীবন এই বাসায় থাকবে, তখন থেকে আর কলিং বেলের শব্দে দরজা খুলিনা। প্রতিদিন ও একবারই কলিংবেল দিত। এখন এই কলিংবেলের আওয়াজের সাথে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি।

চারদিকে পাখির হালকা কিচিরমিচির শব্দে ঘুম ভাঙল। জানালা দিয়ে কড়া রোদ আমার গাঁয়ে এসে পড়েছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সকাল ১০টা বাজে। অথচ আমি প্রতিদিন সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে কলিংবেলের শব্দে ঘুম থেকে উঠি। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, আজকে কি কলিংবেল দেয় নি। নাকি আমি ঘুম থেকে উঠতে পারি নি বাথরুম থেকে ফ্রেস হয়ে নাস্তার টেবিলে বসামাত্র আম্মু বললঃ- "সকালে মেয়েটা এসেছিল। একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছে তোমাকে। আমাকে বলেছিল আমাদের কলিংবেলটা নাকি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

আমার আম্মু মেয়েটার কাণ্ডকলাপে খুবই খুশি। সে প্রতিদিন আমাকে ঘুম থেকে তুলে দেয় তাই। আমি চিঠিটা নিয়ে টেবিলে রাখলাম। নাস্তা সেরে রুম এ গিয়ে চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করলাম-"আমি দুঃখিত। আপনাদের কলিংবেলটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমি আপনার রুমে এসেছিলাম। তখন আপনি ঘুমাচ্ছিলেন, তাই সামনের থেকে ডাকতে সাহস পাই নি। আমি স্কুলে যাচ্ছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। আমি সত্যিই দুঃখিত।" আমি ভাবলাম, ও তা হলে আমাকে ঘুম থেকে তোলার চেষ্টা করেছিল। সত্যিই, মেয়েটি খুব ভাল। হঠাৎ করে ফোনটা বেজে উঠল। মহাপুরুষ প্রিয় ফোন দিয়েছে।

আমি : হুম, কি ব্যাপার?

প্রিয় : এইত আছি। আজকে বিকেলে একটা পার্টি আছে। তুই কি আসতে পারবি?

আমি : ঠিক আছে পারব। তবে তাড়াতাড়ি বাসায় পৌঁছাতে হবে।

প্রিয় : আচ্ছা ঠিক আছে। ফোনটা কেটে গেল। প্রিয়কে মহাপুরুষ বলার একটা কারণ আছে। আমার একবার রোড একসিডেন্ট হয়। তখন আমার ডান হাত অনেকটা কেটে যায়। তখন ও রাস্তার মধ্যে তার শার্টটা খুলে আমার হাতে পেঁচিয়ে

মহাপুরুষের মতো আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সবাই তখন ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। এরপর থেকে আমি ওকে এই নামেই ডাকি। দরজা খুলে পাশের ফ্লাটের কলিংবেলটা চাপ দিলাম। অ্যান্টি দরজা খুলেই আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। আমি সালাম দিয়ে অ্যান্টিকে বললাম ঃ অ্যান্টি, এই চিঠিটা। অ্যান্টি"- ও হ্যাঁ, তুমি পড়েছ বাবা? আমার মেয়েতো স্কুলে চলে গিয়েছে। ও আসলে ওর চিঠিটা ওর কাছে দিয়ে দিব।

আমি : অ্যান্টি, আমি তা হলে আজকে আসি।

অ্যান্টি : এস বাবা।

একটু পর কলিংবেল সারানোর লোক বাসায় নিয়ে এসে কলিংবেলটা সারালাম। মেয়েটা নিশ্চয় খুব খুশি হবে। কিন্তু মেয়েটা এত দায়িত্ব পালন করে কেন? আমি তো জীবনেও ওর সাথে কথা বলি নি।

বিকালের দিকে বাসা থেকে বের হলাম। মহাপুরুষ প্রিয় দুপুরের দিকে দিকে ফোন দিয়েছিল। বলেছিল, ২৭ এর বি এফ সিতে আসতে ঠিক ৫টার দিকে। কোনো পার্টিতে যাওয়ার সময় আমি আর প্রিয় এক সাথেই যাই। কিন্তু এবারেরটা একটু আলাদা। এবার আমি একা যাব। এ বিষয়ে প্রিয়কে কিছু বলি নি। হয়তো কাজের ব্যস্ততার কারণে সে একা যাবে। বাহন পরিবহণে করে চলে গেলাম ২৭ এ। সেখান থেকে বি এফ সিতে ঢুকে পরলাম প্রায় ৩/৪ সপ্তাহ পর প্রিয়র সাথে দেখা হবে। হঠাৎ করে দিপু ফোন দিল। গিটারইস্ট দিপু। দিপু খুব ভাল গিটার বাজায়। স্কুল জীবনে আমরা সবাই এক সাথে আড্ডা দিতাম। এখন তা মাঝে বা বিশেষ কোনো দিনে হয়।

আমি : হ্যালো? দিপু"- কিরে জায়েদ, কোথায় তুই?

আমি : বি এফ সির সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

দিপু : ভিতরে ঢুক তাড়াতাড়ি। ফোনটা কেটে দিল সে। আমি দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলাম। সিঁড়ি দিয়ে নিচের গেলাম। একটা বড় টেবিল এর পাশে চোখ পরতেই মহাপুরুষ প্রিয় হাত দিয়ে ইশারায় ডাকল। দিপুকেও দেখতে পেলাম। সাথে দেখলাম কিছু অপরিচিত মানুষ। আমি সামনে গেলাম। এত মানুষের মাঝে ঠিক একটা সিটই খালি ছিল এবং মনে হচ্ছে সিটটা আমার জন্য রাখা হয়েছে। আমি বসলাম দিপুর পাশে। মহাপুরুষ প্রিয় সবার সাথে কথা বলে কিছু খাবারের অর্ডার করল। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে আমি, প্রিয়, দিপু এবং ৪ জন অপরিচিত মেয়ে আছে।

হঠাৎ করেই মহাপুরুষ বলতে লাগল সবাইকে উদ্দেশ করে ঃ "তোমাদের সাথে তো গিটারিস্ট দিপুর পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। দিপুর পাশে যে বসে আছে, ওর নাম জায়েদ। তবে টুইটারে ওকে সবাই মাইরালা সাত নামেই বেশি চিনে। আমার ভাল বন্ধুদের আমি একটা বিশেষ নামে ডাকি। সেটা না জানলেও হবে। জায়েদ আবার একজন লেখক। হা হা, মানে বই লিখে। আসলে বই লিখে নাকি খাতা লিখে সেটা সেই জানে। বই না পড়েই আমরা ওকে বলি, তুমি ফালতু লিখেছ। আমরা খুব মজা করি। যেমন ধর দিপু খুব ভাল গিটার বাজাচ্ছে। তার পরও আমি, জায়েদ ওকে বলি এটা হয় নি। হাহাহা, সত্যি ও খুব চমৎকার ফালতু লিখে" সবাই বুঝতে পেরেছে আমাদের বন্ধুত্বটা।

আমি এতক্ষণ প্রিয়র কথা শুনছিলাম আর ফোনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ফোনটা লক করলাম। প্রিয় আমাকে বলল ঃ জায়েদ, আসল কথায় আসি। ও হচ্ছে ইরা আর ওরা হচ্ছে ইরার বান্ধবী। আমি মাথা তুলে ইরার দিকে তাকালাম। এক মুহূর্তের জন্য ইরার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ইরা আমাদের পাশের ফ্লাটের মেয়েটার মতো দেখতে।

প্রিয় বলল ঃ "ইরা আমার গার্লফ্রেন্ড।" আমি একবার প্রিয়র দিকে তাকালাম। একবার ইরার দিকে।

ইরা আমাকে বলল ঃ "ভাইয়া, কলিংবেল ঠিক করেছেন? আমি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পরেছিলাম। নিজেকে সামলে নিলাম। ইরাকে বললাম ঃ হুম।

মহাপুরুষ প্রিয় আমাকে বলল ঃ "তুই সকালে ঘুম থেকে খুব দেরী করে উঠিস। তাই আমি ইরাকে বলেছিলাম প্রতিদিন যেন তোদের কলিংবেল বাজায়। আসলে তোকে ঘুম থেকে উঠানোর বিকল্প ব্যবস্থা এটা ছাড়া আর কিছুই পাই নি। ইরাকে তোদের ছাদে প্রথম দেখেছিলাম। একদিন ওর নামে ধরে অ্যান্টি ডাকছিলেন। তারপর ইশারায় ওকে পছন্দ করি বলেছিলাম। তারপর ফেইসবুকে কথা হলো তারপর আস্তে আস্তে হয়ে গেল সব কিছু।

আমি একটু অবাক হলাম। দিপু হা করে তাকিয়ে মহাপুরুষের কথা শুনছে। দিপু বা আমি, আমরা কেউ জানি না বেপারটা।

ইরা বললঃ- "জায়েদ ভাইয়া, আপনি যে এত ভাল একটা বন্ধু পেলেন। দেখেছেন, আপনার জন্য কত বড় বন্ধুত্বের পরিচয় দিল।" সত্যিই, আমি আমার জীবনে কিছু ভাল বন্ধু পেয়েছি যা হারানো অসম্ভব। টেবিলে খাবার চলে এসেছে।

মহাপুরুষ বলল ঃ আজকে আমাদের দুই বছর সম্পর্ক পূর্ণ হলো, তাই তোদের ডাকা হয়েছে।

গিটারিস্ট দিপু বলল ঃ "আর একবার খাওয়াতে হবে, প্রথম বার ডাকস নাই তাই। হা হা। আমি হাসলাম হাসল সবাই। সাধারণত আমি খুব কম কথা বলি এবং সহজে সবার সাথে পরিচিতি হই না। কিন্তু সেদিন ওখানে থাকা ইরা এবং এক বান্ধবী এ দুজন ছাড়া বাকিদের সাথে আর তেমন পরিচিতি হলাম না। কথা প্রসঙ্গে ইরার বান্ধবীর সাথে পরিচিত সাথে আর কারণ হলো, গিটারিস্ট দিপুর মেয়েটিকে খুব পছন্দ

হয়েছে। আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হলো। সামনের আরও দুইটি পার্টির দাওয়াত পেলাম।

নাবিল এবং অদ্ভুত বল

রিসালাত জাওয়াদ

রোল : ৩২৪৩৫, শ্রেণি : একাদশ

মাসখ অনেক হল নাবিলরা এই পাহাড়ি শহর বান্দরবানে এসেছে। আসলে নাবিলের বাবা এখানে বদলি হয়ে এসেছেন। সব সময় সে ফ্ল্যাটে থেকে এসেছে, কিন্তু এবার তা বা পাচিল ঘেরা একটা বাংলা টাইপের বাড়ি পেয়েছেন যার সামনে পেছনে বাগানও আছে। নাবিলের তো খুব ভাল লেগেছে জায়গাটা। তার পর কী রকম উচুনিচু রাস্তা আর বাগানওয়ালা বাড়ি। নাবিলের বাবার বদলীর চাকরি। এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে পারে না, কিন্তু এত ভাল নাবিলের কোনো জায়গা লাগে নি। নতুন স্কুলটাও কী সুন্দর। এর আগে যেখানে ছিল সেখানে নাবিলের অনেক বন্ধু ছিল, তাদের ছেড়ে আসতে নাবিলের খুব কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু এখানে এসে মন খারাপ অনেকটাই কেটে গেছে। হলিডে হোমওয়ার্ক আছে ঠিকই, কিন্তু খেলার সময়ও প্রচুর। নাবিল তো সময় পেলেই বাগানে ঘোরাঘুরি করে। নাবিলের মা মাঝে মাঝেই রাগারাগি করেন নাবিলের রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি দেখে কিন্তু নাবিলকে আটকানো যায় না। নাবিল ওর সমবয়সী ছেলেমেয়েদের থেকে বেশ অন্য রকম। খেলার জন্যে যে সব সময় ওর বন্ধুবান্ধব লাগে তা নয়। ও নিজের মনে ঘণ্টার পড় ঘণ্টা খেলতে পারে। আগে তো ফ্ল্যাটের একটা ছোট্ট ঘরকেই একটা রাজপ্রসাদ কল্পনা করে নিজে রাজপুত্র হয়ে কত যে রাক্ষস রাক্ষসীকে মেড়ে রাজকন্যাকে উদ্ধার করেছে তার ঠিক নেই! আর এখন তো বড়ো বাড়ি, তার সঙ্গে আবার বাগান। সেদিন সকাল থেকে ভাল রোদ্দুর ছিল না।

পড়াশোনা শেষ করে নাবিল একটা লাঠি হাতে বাগানে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। লাঠিটা কখনো ওর তলোয়ার হয়, কখনো জাদুকরের জাদুছড়ি কখনো বা শুধুই লাঠি। বান্দরবান থেকে সে যে তখন কোন রূপকথার রাজত্বে কি পরিদের জগতে বিরাজ করেছে তা সে নিজেই জানে। বাগানের সামনের দিকটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ফুল গাছ লাগানো। পেছনে সবজির বাগান আছে এর এক পাশে সবুজ মিয়ার ঘর। সবুজ বাংলার কেয়ারটেকার। সবজি বাগানের চারপাশটা অত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। ঝোপঝাড় আছে কিছু। মা সবুজকে পরিষ্কার করতে বলেছে। নাবিল সারাক্ষণ বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলা যায় না। যদি সাপখোপ থাকে। নাবিল লাঠিটা দিয়ে ঝোপঝাড়গুলো খোচাচ্ছিল হঠাৎ লাঠিটা যেন নরম এটা কিছু লাগল। কী আছে ওখানে নাবিল ভাবল। তার পর আবার খোচাল। এবার আর কিছু বুঝল না। সাপটাপ নয়তো পাখির ছানা? নাবিল আস্তে আস্তে ঝোপটা লাঠি দিয়ে নাড়তে লাগল। এই নাড়ানাড়ির ফলে ঝোপের ভেতর থেকে গড়িয়ে বেড়িয়ে এল একটা ছোটবেল। ক্রিকেট খেলার বলের সাইজে। নাবিল নিচু হয়ে বলটা কুড়ালো, কী সুন্দর বলটা। রঙটাও কী দারুণ, কমলা সবুজ মেশানো, কী উজ্জ্বল বলটা যেন জ্বলজ্বল করছে।মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল নাবিল। কার বল এটা? জাহিদের কি? জাহিদ সবুজের ছোট ছেলে, নাবিলের বয়সী প্রায়। কিন্তু ওরা তো এখন কেউ নেই এখানে, এই গ্রামের বাড়িতে গেছে ওদের মার সঙ্গে।

তাই জিজ্ঞেস করারও উপায় নেই। যাক এখন তা হলে আমার কাছে রেখে দেই পরে জাহিদ ফিরলে জিজ্ঞেস করব, ভাবল নাবিল। আর ঠিক তক্ষণি বলটা নাবিলের হাত থেকে পরে বার তিন চারেক বাউন্স খেয়ে কিছু দূরে গিয়ে থেমে গেল। নাবিলের খুব মজা লাগল। ও বলটা নিয়ে খেলায় মেতে গেল। বলটা এত ভাল বাউন্স করে ঠিক যেন বুঝে নাবিল কী চাইছে। যতক্ষণ না মা গোসল করতে ডাকলেন নাবিল বল নিয়েই পরে রইল। মজার ব্যাপার বলটা যেন বেশিক্ষণ হাতে থাকতে চায় না। ছেড়ে দিলেই খুশি। একবার তো নাবিলের মনেই হল বলটা মনে হয় জ্যান্ত। কিন্তু এই সব কথা তো আর কাউকে বলা যায় না। বিশেষ করে বড়দের তো নায়ই। হেসেই উড়িয়ে দিবে। নাবিলও তাই বিশেষ কিছু বলল না, শুধু মাকে জানাল বাগানে ও একটা বল পেয়েছে। জাহিদের হবে। ওরা ফিরলে দিয়ে দিও, মা বললেন। নাবিল মুখে কিছু বলল না। যদিও দিয়ে দেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ওর নেই। দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর নিয়ম মতো মার পাশে শুয়ে ঘুমাতে হল। বিকালবেলা মা ওকে নিয়ে কাছে একটু ঘুরে এলেন। অন্যদিন নাবিলের বিকালবেলা ঘুরতে ভালই লাগে কিন্তু আজ খালি মনে হচ্ছিল কখন বাড়ি ফিরে বলটা নিয়ে খেলবে। সন্ধ্যাবেলা নাবিল পড়ায় ঘরে ঢুকে তো অবাক। অন্ধকারে বলটার গা দিয়ে অদ্ভুত একটা নরম আলো বেরোচ্ছে। নাবিল তাড়াতাড়ি ঘরের আলো জ্বালাতেই বল আবার স্বাভাবিক। নাবিল বলটা হাতে নিয়ে ভাল করে দেখতে লাগল হঠাৎ মনে হল আরে বলটাতে তো চোখ, নাক, মুখ রয়েছে আর সে মুখ বেশ হাসি হাসি। কেমন বল এটা? এর আবার চোখ মুখ আছে! কই আগে তো ছিল না! আবার আলোও বোরোয়!!! নিজের মনেই বলল নাবিল। বলতে বলতেই দেখল চোখ মুখ কোথায়? কিছু নেই! তার জায়গায় যেন অন্য কিছু দেখা যাচ্ছে। ভাল করে দেখে বুঝল আইসক্রিম। বলের গায়ে আইক্রিমের ছবি? ঠিক তখনই নাবিল বাবার গলা শুনতে পেল। নাবিল শিগগির আয়। দেখ তোর জন্য কী এনেছি। আইসক্রীম, তোর ফেভারিট দেরি করলে কিন্তু গলে যাবে। আইসক্রিম এর নাম শুনলেই নাবিল বলটাকে টেবিলের ওপরে রেখে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। যদি লক্ষ করত তা হলে দেখত বল আবার স্বাভাবিক। আইসক্রিমের ছবি আর নেই। রাতে শুয়ে নাবিল ভাবল বল এ কেন চোখমুখ ছিল? আইসক্রিমের ছবিই বা ছিল কেন? শুতে যাবার আগে যখন দেখতে গেল তখন তো কিছু নেই, আলও বেরোচ্ছে না। এসব ভাবতে ভাবতেই নাবিল তলিয়ে গেল গভীর ঘুখে। নাবিল এখন পড়াশোনা ছাড়া বল নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস বলটা জ্যান্ত। একদম বন্ধুর মতো খেলা করে ওর সঙ্গে। নাবিলের মা, বাবাও ওর এই বল প্রীতি লক্ষ করেছেন। ওনারা হাসেন বলেন বাড়িতে এত ভাল ভাল খেলনা রয়েছে। সে সব ছেড়ে দিয়ে একটা কুড়িয়ে পাওয়া বল নিয়ে মেতে রয়েছে। পাগল ছেলে! একদিন খেলতে খেলতে নাবিল দেখল বলটার গায়ে যেন বিন্দু বিন্দু রক্ত দেখা যাচ্ছে, লাল টুকটুকে কয়েকটা ফোটা। নাবিল এবার ভয় পেল ও হাত থেকে বলটা ফেলে দিয়ে এক ছুটে মার কাছে চলে গেল। দেখল মা ডাইনিং টেবিলে আপেল কাটছেন। নাবিল মার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এই সময় সবুজ কি যেন একটা বলল আর মা তার উত্তর দেবার জন্য মুখ তুললেন। কিছু বোঝার আগেই নাবিল মার ছুড়ি ধরা হাতে আলতো ধাক্কা মারল। মার হাত তো রে গেল কিন্তু নাবিলের আঙ্গুল অল্প নড়ে গেল। নাবিল কি করছিল তুই! আপেল খাবি তো আমাকে বল, আমি দিচ্ছি। ও রকম করে কেউ নিতে যায়? দেখ তো কি হল? ভাগ্যিস বেশি কিছু হয় নি। জ্বালা করছে। চল ওষুধ লাগিয়ে দেই। নাবিল একটু চুপচাপ প্রকৃতির ছেলে শুধু মাথা নাড়ল, বলতে পারল না, 'মা' আরেকটু হলে ছুরিটা তোমার আঙ্গুলের ওপর পড়ছিল। এই ঘটনার পর নাবিলের মনে বিশ্বাস জন্মাল যে বলটা নিশ্চয়ই সব কিছু আগে থেকে জানতে পেরে যা আর ওকে সাবধান করে দেয়। তাই একদিন দুপুরে মা যখন বললেন আজ ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠে পড়বি নাবিল বিকালে মেলা দেখতে যাব। বড় মেলা হয় এখানে, তখন নাবিল বলল না মা আজ যাব না। আজ খুব বৃষ্টি হবে। ও যে সকালে বলের গায়ে বৃষ্টির ছবি দেখেছে! ও বুঝেছি। সবুজের কাছ থেকে গতবারে নদীর বন্যার কথা শুনেছিস তাই না। খুব বৃষ্টি হয়েছিল গতবার। কিন্তু এখনো বর্ষা পড়ে নি। এখন বৃষ্টি হবে না। তোর সব ক'টা ফেভারিট রাইড কিন্তু মেলায় এসেছে। নে এখন চটপট ঘুমিয়ে পড়। নাবিল আর কি করে। বিকাল বেলায় গেল মার সঙ্গে মেলায়। কিন্তু দু একটা রাইড চড়ার পরই আকাশ কালো করে বৃষ্টি এল। সময় থাকতে মা নাবিলকে নিয়ে কাছের একটা বাড়ির বারানদায় উঠেছিলেন তাই ওই অঝোর বর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পেলেন কিন্তু এই হঠাৎ বৃষ্টি তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। তুই তো ঠিকই বলেছিলি নাবিল। কিন্তু তুই জানলি কিভাবে? নাবিল আর কী বলে, বলটার কথা তো আর বলা যাবে না। তাই চুপ করেই রইল। শুধু মনে মনে বলল ছোটরাও যে বড়দের কত হেল্প কতে পারে সেটা যে বড়রা কবে বুঝবে। সন্ধ্যাবেলায় নাবিলের বাবা সব শুনে বললেন পাহাড়ি জায়গায় এরকম হঠাৎ বৃষ্টি হয়। দেখো হয়তো সবুজের কাছে শুনেছে। মেলায় যাবার ইচ্ছে ছিল না, তাই খালি বৃষ্টি বৃষ্টি করছিল। গরমের ছুটিটা ভালই কাটছিল নাবিলের। স্কুল খোলার আর মাত্র সপ্তাহ খানেক বাকি। একদিন দুপুরে নাবিলের কিছুতেই ঘুমোতে ইচ্ছে করছিল না। এক দিকে মা ঘুমিয়ে পড়েছেন।

নাবিল পা টিপে টিপে খাট থেকে নেমে এল। ঘর থেকে বেড়িয়ে গিয়ে বলটা নিয়ে খেলতে হঠাৎ বলটা ওর হাত থেকে ছিটকে মেঝেতে গড়াতে গড়াতে সদর দরজার দিকে যেতে লাগল। নাবিল বলটাকে ধরতে গেল কিন্তু বলটার গড়ানোর স্পিড যেন অন্যদিনের থেকে অনেক বেশি। নাবিল ধরতেই পারছিল না। বাসার দরজাটা অল্প ফাঁক ছিল। সবুজ কি যেন কাজ করছিল বারান্দায়। তখন কাজ ফেলে কোথাও গিয়েছে। বোধহয় নিজের ঘরে। বলটা বারান্দা পেরিয়ে বাগানে নেমে, গেটের ফাঁক দিয়ে রাস্তায় চলে গেল। নাবিলেরও যে কী হল কে জানে ও বলের পেছনে ধাওয়া করল। এমনিতে কিন্তু ও মাকে না বলে একা একা কোথাও যায় না। রাস্তা দিয়ে গড়াতে গড়াতে পেছন পেছন নাবিল। দুপুরবেলা রাস্তাঘাট ফাঁকা তাই নাবিলকে কেই দেখতে পেল না। না হলে এ অঞ্চলে সবাই নাবিলকে চেনে। এ গলি ও গলি উচুনিচু ঢেউ খেলানো রাস্তা দিয়ে গিয়ে বলটা থামল একটা ছোট বাড়ির পেছন দিকে। বাড়িটা খুব দূরে বলে নাবিলের মনে হল না। বল থেমে গেছে। নাবিল ও দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে শুনশান জায়গায়টা। নাবিল ভাবছে এখানে বলটা থামল কেন? কী আছে এখানে? এদিক ওদিক তাকাতে দেখতে পেল একটা জানালার একটা পালা খোলা। বাকি সব দরজা বন্ধ। বাড়িতে কেউ থাকে বলেও মনে হয় না। জানালাটার ঠিক তলায় একটা মাটির টিবির মতো ছিল। নাবিল তার উপরে উঠে জানালা দিয়ে উঁকি মারল দেখল একটা ঘরে পাস্টিক দিয়ে কী যেন একটা চাপা দেয়া রয়েছে আর দুজন লোক ঘুমাচ্ছে। কেমন যেন লোকদুটো, নাবিলের কী রকম ভয় করল। ও তাড়াতাড়ি টিবি থেকে নেমে বলটা কুড়িয়ে দৌড় লাগায় সবুজের সঙ্গে ও এদিক দিয়ে অনেকবার যাতায়াত করছে। তাই বাড়ি ফিরে যেতে অসুবিধে হল না। বাড়ি ফিরে দেখল সবুজ বাগানের কাজ করছে। ও চুপিসারে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে আবার মার পাশে শুয়ে পড়ল। সবুজ বুঝতেও পারল না। ওর আওয়াজ পেয়ে মা চোখ না খুলেই ঘুম ঘুম গলায় বলল "কি করছিল নাবিল? দুপুরবেলায় ঘুরে বেড়ায় না। নাবিল শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল কি করবে। মাকে সব বলবে? বললে তো ভাল মাতা বকুনি কপালে আছে। ভাবতে ভাবতেই দুপুর গড়িয়ে বিকাল হল, সন্ধ্যেও হয়ে গেল। বাবা ও অফিস থেকে ফিরে এলেন। এসে বললেন কী ব্যাপার, আজ নাবিল বাবু কার্টুন দেখছেন যে? কী হয়েছে?" কে জানে। আজ দুপুরে ঘুমায় নি। সারাক্ষণ ঘুরঘুর করে বেরিয়েছে মা বললেন। নাবিল তখনো ভাবছে কি বলবে। বললে ও বলের কথাটা বলা ঠিক হবে না। এমন সময় হঠাৎ বাবার কথা কানে এল। বাবা মাকে বলছেন, দেখো নাবিল যেন একা একা বাইরেনা যায়। বান্দরবান এ কিছু বাজে লোক ঢুকেছে। পুলিশের সন্দেহ এরা টাকা জাল করে। খুবই বিপজ্জনক লোক। "পুলিশ ধরছে না কেন?" "ধরার চেষ্টা চলছে।" সারা শহর অ্যালার্ট করা হয়েছে। কালও মাইক নিয়ে বলবে। এ পর্যন্ত শুনে নাবিল থাকতে পারল না, সোজা বাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, টাকা জাল কী বাবা? কিভাবে করে? টাকা জাল মানে আমাদের টাকার নকল তৈরি করা ওদের মেশিন থাকে যাতে নকল টাকা ছাপায়। অত্যন্ত অন্যায় এবং বেআইনি কাজ। নাবিল ঢোঁক গিলল। ওই লোক দুটো নয় তো? কী করছিল ওরা ওরকম একটা জনঙ্গলওয়ালা বাড়িতে? এবার বোধ হয় বাবা, মাকে সব বলতে হবে। বাবা লক্ষ করছেন নাবিলের ভাবান্তর, জিজ্ঞেস করলেন নাবিল কি হয়েছে? আরো দুবার ঢোক গিলে নাবিল কাঁপা কাঁপা গলায় বলল। আমি আজ দুপুরে একা একা বাইরে গেছিলাম। "কি! মা, বাবা দুজনেই চমকে উঠলেন। সবুজ তো সামনে কাজ করছিল। ও ও আটকাল না? মা খুব বিরক্ত। সবুজ চাচা তখন সামনে ছিল না, তাই আমি বেরোতে পেরেছিলাম। কোথায় গিয়েছিলেন নাবিল? কেন গিয়েছিলে সব বলল নাবিল শুধু বলের কথা বাধ দিয়ে। বলল কিভাবে ঘুরতে ঘুরতে ওই বাড়িটার সামনে চলে গিয়েছিল। কী দেখেছে সব। ও বলল যে সবুজের সঙ্গে ওই রাস্তা দিয়ে ও আগেও গেছে। বাবা তক্ষুণি সুবজকে ডেকে বাড়িটার সঠিক জায়গাটা জেনে নিলেন, তার পর পুলিশে ফোন করলেন। ওই বাড়িটাই ছিল টাকা জাল করার কারবারিদের আড্ডাখানা। পুলিশ মালামালসহ সবাইকে গ্রেফতার করল। এদিকে সব কান্ডের মধ্যে বলটা কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল। নাবিল কত খোঁজল, সবুজ কে দিয়ে পুরো বাগান তন্নতন্ন করে খোঁজল কিন্তু বল পাওয়া গেল না। নাবিলের তো মন খুব খারাপ। সারাক্ষণ মুখ ভার। অবস্থা দেখে নাবিলের বাবা অনেকগুলো নানা রকমের বল কিনে এনে দিলেন কিন্তু নাবিলের মুখে হাসি ফুটল না। সন্ধ্যেবেলা কার্টুন দেখছিল নাবিল, মা এসে ডেকে নিয়ে গেলেন। পুলিশেরা নাকি এসেছেন নাবিলের সঙ্গে দেখা করতে। নাবিল এলে বাবা বললেন এই হচ্ছে আমাদের নাবিল। কিন্তু এখন ওর মন খুব খারাপ কারণ ওর একটা বল হারিয়ে গেছে। সবাই হেসে উঠলেন। একজন পুলিশ নাবিলকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন তুমি এত সাহসী ছেলে আর একটা বল হারিয়ে গেছে বলে মন খারাপ করছ? এই দেখো আমরা তোমার জন্য কি এনেছি। এই বন্দুক, গাড়ি, ভিডিও গেম সব তোমার। নাবিল অল্প হেসে Thank you বলল। কিন্তু মন খারাপ গেল না। মনে মনে বলল, তোমরা তো জানোই না সব কিছু হয়েছে ওই বলটার জন্য ওকেই তো Thank you বলা হল না!

শিক্ষণীয় গল্প ও কবিতা

রিতা ইসলাম

রোল : ৩০৪৭২, শ্রেণি : একাদশ

একবার এক শিকারি শিকার করতে গেল। সে একটি ছোট পাখি ধরল। শিকারির জালে আটকে পড়ে পাখিটি ভাবতে লাগল কিভাবে এখান থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পাখিটি খুবই বুদ্ধিমান ছিল। তাই পাখিটি শিকারির করতে লাগল। তুমি এত বড় শিকারি! জীবনে অনেক বাঘ, ভালুক, হরিণ ধরেছ। আমি একটা ছোট পাখি, আমার ওজন ১০০ গ্রামও হবে না। আমাকে খেয়ে তোমার পেটের এক অংশও ভরবে না। তার চেয়ে বরং আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন তিনটি মূল্যবান বাণী শোনাব যা তোমার সারা জীবন কাজে আসবে। পাখিটি এমন ভাবে কথা বলেছিল শিকারির মন গলে গেল। সে ভেবে দেখল ঠিকই তো এই ছোট পাখিটি মেরে তা কোনো লাভ হবে না। তার চেয়ে ভাল হবে পাখিটি কী বলতে চায় তা শোনা। হয় তো এতে শিকারির লাভ-ই বেশি হবে। শিকারি পাখিটির কথায় রাজি হল। তখন পাখিটি বলল, আমি প্রথম বাক্য বলব তোমার হাতে বসে। দ্বিতীয় বাক্য বলব গাছের ডালে বসে। এবং তৃতীয় বাক্য বলব ঐ গাছের মগডালে বসে। শিকারি বলল আচ্ছা ঠিক আছে। পাখিটি প্রথমে শিকারির হাতে বসে বলল– "কখনো অলৌকিক কল্পনা করো না। যা অবাস্তব তা কখনোই বিশ্বাস করো না।" শিকারি বলল– ঠিক কথা, সত্যিই তাই। কখনো অবাস্তব কথায় বিশ্বাস করতে হয় না। এবার পাখিটি গাছের ডালে উঠে বলল- "যা হাতছাড়া হয়ে যায়, তা নিয়ে কখনো আফসোস করো না। শিকারি বলল, এটাও ঠিক কথা, যা আমার নেই। তা নিয়ে আফসোস করাটাই বোকামি। পাখিটি এবার মগডালে উঠল। শিকারি বলল- এবার তোমার তৃতীয় উপদেশটি বল? পাখিটি বলল-তৃতীয়টি বলার আগে দেখে নিই আগের দুটি উপদেশের শিক্ষা তোমার জীবনে কাজে লাগিয়েছ কি না।

পাখিটি বলল-আমার পেটে ২০০ গ্রাম এর ওজনের মুক্তা আছে। একথা শুনে শিকারি খুব আফসোস শুরু করল। হায়! হায়! এ আমি কি করলাম। ধনী হওয়ার এত সহজ সুযোগটা আমি হাতছাড়া করলাম....! এ কথা বলতে বলতে শিকারি পাখিটিকে ধরার ব্যর্থ চেষ্টায় উপরের দিকে লাফাতে লাগল। কিন্তু তখন সেই ছোট পাখিটি উড়ে চলে গেল বহু দূরে....

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ আমরা কখনোই অবাস্তব কল্পনা করব না এবং হাতছাড়া জিনিস নিয়ে কখনোই আফসোস করব না।

অর্জন

সাবিকা তাসনীম

রোল : ২৮২৬৬, শ্রেণি : দ্বাদশ

চারিদিকে উৎসবমুখর পরিবেশ। সানাই বাজছে। সবাই উপভোগ করছে আনন্দময় অনুষ্ঠান। রিতার বাবা-মায়ের মনেও আনন্দের কোনো কমতি নেই, রিতা বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তার দীর্ঘদিনের প্রতিক্ষীত কায়সারের সাথে আজ তার বিয়ে। তাদের বহু বছরের ভালবাসা আজ প্রণয়ে রূপ নিচ্ছে। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটছে। তিন বছরের প্রবাস জীবনের অবসান ঘটিয়ে কায়সার আজ বৌ করে নিয়ে যাচ্ছে প্রণয়িণী রিতাকে।

বাসর রাত চারিদিকে নিস্তব্ধতা। কায়সার রিতার পাশে বসে, জীবনে প্রথম কোনো নারীর স্পর্শ পূর্ণতা দেবে তার জীবনে। কায়সার দুহাতে রিতার ঘোমটা খুলবে এমন সময় রিতার মনে হচ্ছে জীবনের সব স্বপ্ন যেন সার্থক হতে যাচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। কে যেন অস্থির হয়ে কড়া নেড়ে যাচ্ছে। কায়সার উঠে গিয়ে দরজা খোলে। দেখে তার বাল্যবন্ধু রবি। "কায়সার, পাকিস্তানিরা আমাদের গ্রাম প্রায় দখল করে ফেলছে। ওরা আমাদের দেশকে চিরদিনের জন্য পরাধীন করে রাখতে চাইছে। এক্ষুণি চল ভাই, দেশকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করে তবেই বাড়ি ফিরব"। কথাগুলো প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলে থামে রবি। কায়সারের সমস্ত দেহ কাঁপছে। চোখে অগ্নিশিখা জ্বলছে মাকে মুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয়ে। রিতার হাতে হাত রেখে বলে "আমাকে ক্ষমা করো, মুক্ত দেশের মুক্ত বাতাসেই তোমার আমার দেখা হবে"। বলেই রবির সাথে চলে যায় কায়সার। এ দিকে প্রতীক্ষার শত প্রহর কেটে যায় রিতার। কায়সার আসে না। এদিন বাড়ির পাশ দিয়ে অপারেশনে যাওয়ার সময় একবারের জন্য বাড়িতে ঢুকে কায়সার। দরজা কড়ায় হাত পড়তেই ভিতর থেকে খুলে যায় দরজা। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রিতা কায়সার। রিতা জড়িয়ে ধরে কায়সারকে। কিছু মুহূর্ত পরেই কায়সার বলে "ছেড়ে দাও রিতা, এখনি যেতে হবে। রিতার নারীসুলভ জবাব "আজ না গেলেই কি নয়, একটি রাতই তো কেবল চাইলাম, আজকের এই রাতটি, কাল ভোরেই যেও"। সবার আগে দেশ রিতা, পরাধীন হয়ে বাঁচার চাইতে মৃত্যুও ভাল। আজ যেতে দাও। স্বাধীন দেশের পতাকা নিয়েই তোমার কাছে ফিরব। মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী হবে তুমি, সেই সম্মান?" রিতা বলে "যদি ফিরে না আসো? কী নিয়ে বাঁচব আমি? একটি সন্তান আমায় দিয়ে যাও, যাকে দেখে তোমাকে হারানোর ব্যথা ভুলতে পারব, যাকে কেনতে পারব বাবার গৌরব গাঁথা গল্প।" "আমাকে দুর্বল করে দিও না রিতা, যদি

না-ই ফিরে আসি বিরাঙ্গনা হয়ে বাঁচবে তুমি, শহীদের স্ত্রী হয়ে, স্বাধীন দেশের হাজারো সন্তান মা বলে ডাকবে তোমায় ভরিয়ে দেবে সম্মানে, স্বাধীন বলেই মুহূর্তে বেরিয়ে যায় কায়সার। চিত্তজুড়ে একটাই উন্মাদনা, যে দেশের আলো-বাতাস আমার জন্ম দিয়েছে, যে দেশের মাটি পানি বড় করেছে সেই মাকে শত্রুর কাছে ছেড়ে দিয়ে কী করে নিজের পরিচয় দেবো?

দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। অনেকেই ফিরে আসে যে যার ঠিকানায়। ফিরে না কায়সার। এক দিন রবি এসে জানিয়ে যায় আর ফিরবে না কায়সার। সব প্রতীক্ষার অবসান হয় রিতার। শুরু হয় নতুন জীবন। যে জীবনে তার একমাত্র সঙ্গী রিক্ততা।

দেড়মণ ভূত

আফরা ফারহানা

রোল : ২৭৬০৫, শ্রেণি : দ্বাদশ

বানছা, কেষ্টা, পটলা আর আমি চায়ের দোকানে বসে চা পান করছি। বানছা এমনিতেই হাড় কৃপণ। অন্যের টাকায় পেট ভরার চেষ্টায় থাকে সব সময়। সে জ্বিন, ভূত, প্রেত করে এবং ভয়ও পায় ভিষণ। সেই নিয়েই কথা উঠল। আমি বললাম, "আরে তুই তো বিড়াল ডেকে উঠলেও ভয় পাস।" পটলা বলে, "আর বলিস না, সেদিন মেসোমশাই পটল তুলেছিলেন। এই কথা শুনে বানছাতো এক লাফে খাঁটে উঠে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। আর বলতে লাগল, কখন যেন ঘাড়ে এসে বসে পড়ে মেসোমশাইয়ের আত্মাটা।"

বানছা বলল, "দেখ এসব নিয়ে মজা করবি না। যখন তেঁতুল গাছে এক ঠ্যাং আর বট গাছ আরেক ঠ্যাং চেপে তোর ঘাড় মটকে দেবে তখন বুঝবি।" এই সময় কেষ্টা বলল, "আহা রাগ করে না। বানছার কথা যে একে সত্য নয় এমন কিন্তু না। ভূত আছে। স্বচক্ষে ভূত দেখেছি আমি। সত্যিকারের ঘটনা বলব।"

বানছা কান পর্যন্ত লম্বা হাসি দিয়ে বলল, "সত্যি তবে কেন।"

কেষ্টা বলল," আগে কিছু খাওয়া তার পর গল্প বলি। খালি পেটে কি আর গল্প জমে।" বানছা তখনই এক পেট সিঙ্গারা আর চার কাপ চা এনে সবাইকে খাওয়ালো। কেষ্টা লম্বা ঢেকুর তুলে গল্প শুরু করল," তা হলে শোন, দেড়মাস আগে আমি রাত ১০ টায় খেয়ে দেয়ে বিছানা পেতেছি এমন সময় কানু এসে খবর দিল মড়া পোড়াতে যেতে হবে। আমার পাশের বাড়ির কাকাবাবু বাদলার বিকেলে পটল তুলেছিলেন। বুড়োর আপন বলতে কেউ ছিল না। তাই পাড়ার কয়েকজন মিলে তার শবদেহ পোড়াতে বের হয়ে পড়লাম। মনে মনে বুড়োটাকে গালাগাল দিতে লাগলাম। বুড়োটা বেঁচে থাকতে সবার হাড় জ্বালা করে রেখেছিল। মরার সময়ও একটা খেল দেখিয়ে গেল। তার লাশ নিয়ে যেতে হয়েছিল আমাদেরই। আমরা ছিলাম ৬ জন। আমরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে লাগলাম তখন থেকেই যেন গা কেমন ছমছম করে উঠছিল। ২০ মিনিটে জঙ্গল পার করে পুকুর ঘাটে শবদেহ পোড়াতে নিয়ে যাওয়া হবে। ২০ মিনিট সেই জঙ্গলের রাস্তাকে মনে হচ্ছে যেন গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলাম। পথ আর শেষ হচ্ছে না। যাক বাবা বাঁচা গেল এই তো পুকুর ঘাটে এসে পড়েছি। ১জন বলে উঠল, "আরে -চন্দ্রন কাঠ আর কেরোসিন তেল তো আনাই হয় নি।" তাই ২ জনকে জঙ্গলে চন্দন কাঠ, আর তেল আনতে ২ জনকে পাঠালাম। বাকি রইলাম আমি, কানু আর কাকাবাবুর লাশ। আমরা লাশ নিয়ে ঘাটেই বসেছিলাম। এমন সময় মনে হতে লাগল লাশটা নড়ে উঠেছে আর আস্তে আস্তে পুকুরে নেমে যাচ্ছে। আমি তো ভয়ে লাশটা আর ধরলাম না। কানুকে বললাম, "আরে দেখ লাশটা তো পুকুরে চলে যাচ্ছে। কানু বাবু ছিল সাহসি সে লাশটাকে আনতে পুকুরে নামল। লাশটা তখন হাঁটুজল পর্যন্ত নেমে গেছে। কানু হাটু জল পর্যন্ত নামল লাশটাকে তুলতে। কিন্তু কানু চিৎকার করতে লাগল, "আরে বাঁচা কে কোথায় আছিস, আমাকে লাশটা পানিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।" "এর মধ্যে সেই ৪ জনও এসে এই কান্ড দেখে। লাশটা তখন কানুকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা কানুকে বললাম "ছেড়ে দে ছেড়ে দে লাশটাকে।" কানু বলল, "পারছি না, আমাকে ধরে রেখেছে।" আমরা ৫ জন তখন কানুকে বাঁচানোর জন্য পানিতে ঝাপ দিলাম। আমরা কানুকে ধরে লাশটার কাছ থেকে টেনে আনার চেষ্টা করছি। লাশটা তখন আমাদেরও ধরে ফেলেছে। লাশটা আমাদের ক্রমশই টেনে নিয়ে যাচ্ছে হাটুজল থেকে কোমড় জলে, কোমড় থেকে বুক আর বুক থেকে গলা জল পর্যন্ত। তখন ভাবছিল—এই বুড়োর লাশের গায়ে এ কেমন শক্তি। এই বুড়ো আমাদেরও তার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। আমরা প্রাণপনে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলম, "বাঁচাও বাঁচাও। এ রকম ১৫ মিনিট ধরে চলল। হঠাৎ তখনই পানির নিচ থেকে সেই টানটে কমতে শুরু করেছে। আমরা সবাই তখন ভাবলাম, "বুড়ার লাশটা বোধ হয় আমাদের ছেড়ে দিয়েছে।" আমরা হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। লাশ সহ আমরা পুকুর ঘাটে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। আর তখনই দেখি... । পটলা, বানছা আর আমি একসঙ্গে বলে উঠলাম, "কী? কী দেখছিস?"

কেষ্টা বলল, "ঐ দেড়মণ" ।

আমরা বললাম, "কী কী দেড়মণ?"

কেষ্টা বলল, "ঐ পুকুরের সেই দেড়মণ কাছিমটা (কচ্ছপ) ।"

আমি তো হো হো করে হেসে উঠলাম।

বানছা বলল, “বেটা জোচ্চড়”
কেষ্টা বলল, “যাই বলিস, ভূতের মহিমায় বানছা আজ খাওয়ালি বটে।”

M.T.E.S পাস

আবির হাসান

রোল : ৩১৯৩৭, শ্রেণি : একাদশ

কাল্পনিক ও সামাজিক পরিস্থিতিকে ভিত্তি করে রচিত

সদ্য বিদেশ ফেরত যুবক আদর। একদিন সে তার এলাকার চায়ের দোকানে বসে তার পুরোনো বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিল আর চা খাচ্ছিল। হঠাৎ আদরের চোখে পরল একটি মেয়ে। লক্ষ করে দেখল মেয়েটি আর কেউ না তার স্কুলের Class mate অনন্যা। অনন্যা শুরু থেকেই প্রচণ্ড মেধাবী ছাত্রী। সে S.S.C এবং H.S.C দুইবারই সফলতার সাথে পাস করেছে। বর্তমানে সে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে B.B.A করছে। অপরদিকে আদর ছেলেটি S.S.C পরীক্ষার মুখটি পর্যন্ত দেখতে পায় নি। প্রথমত পারিবারিক অসচ্ছলতা, পাশাপাশি ছাত্র হিসাবেও সে তেমন সুবিধার ছিল না। তাই S.S.C নির্বাচনী পরীক্ষায় ফেল করে, পরীক্ষা আর দেওয়া হয় না তার পক্ষে। আদরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল সে ছিল অত্যন্ত ভদ্র একটি ছেলে, জামাকাপড় ছিল উসকোখুসকো, সব সময়ই সে ক্লাসের পিছনের বেঞ্চে বসত। ক্লাসের কারও সাথে তেমন মেলামেশা করত না। কিন্তু অনন্যাকে সে প্রথম দেখা থেকে পছন্দ করে ফেলেছে, এটাও সে নিজের জানত না, হঠাৎ প্রায় ছয় বছর পর অনন্যাকে দেখে তার সব স্মৃতি মনে পরে গেল। তার পর থেকে সে নিয়মিত সেই চা এর দোকানে এসে বসে থাকে, কেননা এই দোকানের সামনে দিয়ে তার মনের রানী যায়। একদিন সে ভাবছে সে অনন্যাদের বাড়ি তাদের বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবে। পরক্ষণেই তার মাথায় উদিত হল সে যে শিক্ষিত নয়, অনন্যা তার চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত। পরক্ষণেই তার মাথায় একটি বুদ্ধি আসল। প্রথমে সে মেয়ে অর্থাৎ অনন্যাদের বাড়িতে তাকে দেখতে যাবে! যেমন ভাবনা তেমনই কাজ, অনন্যাদের বাড়িতে প্রস্তাব পাঠানো হল। তারাও মেয়েকে দেখতে ছেলে পক্ষকে অনন্যাদের বাড়ি আসতে বলল। দেখতে দেখতে তাকে দেখার দিনও চলে আসল। প্যাকেট ভর্তি মিষ্টি আর হালে ভরা ফল ফলাদি নিয়ে আদর তার পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে অনন্যাদের বাড়ি উপস্থিত হল। আদরকে দেখে কেউ অপছন্দ করতে পারবে না, যেমন স্মার্ট, চতুর কর্মঠ, টাকাও উপস্থিত করে অনেক। দেশে এসেই সে মিরপুর DOHS এ একটি ফ্ল্যাট বুকিং দিয়েছে বর্তমানে তারা সেমানেই থাকে। কিন্তু মেয়ে অনন্যার এইসব কিছু চায় না। সে স্বামী হিসাবে একজন শিক্ষিত পুরুষকেই পছন্দ করবে। যাই হোক অবশেষে অন্যান্যকে সবার সামনে আনা হল। শাড়ি পরিহিত অবস্থায় তাকে দেখতে লাগছিল মাশাআলাহ!! মেয়ে দেখে সবারই পছন্দ হল। এবার ছেলের শিক্ষাগত যোগ্যতা জিজ্ঞেস করা হল। উত্তরে সে বলল M.T.E.S পাস। এমন পাসের নাম কেউ কমানোও শোনে নি। মেয়েটি একটু কৌতুহলী হয়ে ভিতরের ঘরে গেল এবং বাজারের সবচেয়ে বড় "OXFORD DICTIONARY" নিয়ে বসল। কিন্তু সে M.T.E.S শব্দটির কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না। অবশেষে সে ভাবল ছেলের শিক্ষগত যোগ্যতা এত বড় যে Dictionary তে তার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া নেই। মেয়েটি পুনরায় সবার সামনে গেল এইবার তায় সম্মতি জানতে চাওয়া হলে সে মুচকি হাসি দিয়ে বলল সে রাজি। এর পর একটি ভাল দিন দেখে তাদের বিয়েও হয়ে গেল। সুখী পরিবার। অনন্যা আদর এর মতো কাউকে তার স্বামী হিসাবে পেয়ে প্রচণ্ড খুশি। বিয়ের মাসখানেক পর তারা কক্সবাজার গিয়েছে হানিমুন করতে। ওখানে গিয়ে উঠেছেও সেখানকার নামকরা একটি "Five Star" হোটেল এ। সারাদিন সমুদ্রসৈকতে মাতামাতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভোগ করে রাতের ডিনার টেবিলে তারা দুজনে গল্প করছিল। কথায় কথায় অনন্যা তার প্রিয় স্বামীকে জিজ্ঞেস করল যে সে MTES পাস করেছে আসলে M.T.E.S এর Full Meaning কী? তখন তার স্বামী আদর হা-হা করে উচ্চশব্দে হেসে উঠল এবং তার পর তার স্ত্রী অনন্যা কে উদ্দেশ্য করে বলল আরে বোকা, MTES এর অর্থ হচ্ছে M=Matric (ম্যাট্রিক T=Test (টেস্ট) E=Examination (এক্সামিনেশন S=Sattay (ছাটাই) Matric test examination Sattay এরপর আদর বলল যে স্কুল জীবন থেকেই সে অনন্যাকে পছন্দ করত যা। সে কখনোও প্রকাশ করতে পারে নি। তখন ওর প্রধান কারণ ছিল আদর ছাত্র হিসাবে তেমন ভাল ছিল না এবং তার পরিবার ছিল খুবই দরিদ্র। কিন্তু বর্তমানে আদরের গাড়ি বাড়ি সবই আছে। মুখ দিয়ে অনর্গল English বলতে পারে কারণ সমাজের সব ধরণের মানুষের সাথে চলাচল করে। বাস্তব অর্থে আদর শিক্ষিত না হলেও সুশিক্ষিত। কিন্তু তার অর্থ এই কাজের জন্য। অনন্যার কাছে ক্ষমা চাইল। উত্তরে অনন্যা বলল সে একটুও রাগ হয় নি। বরং আদরকে পেয়ে সে আনন্দিত। কিন্তু অনন্যার একটি শর্ত যে তাকে আবার পড়ালেখা করত হবে। তখন সেখানে বসেই আদর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে সে ঢাকায় ফিরেই “বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে” ভর্তি হবে এবং প্রমাণ করে দেবে যে আসলে “শিক্ষার কোনা বয়স নাই”।

স্বপ্ন আমার নীল আকাশ ছোঁয়া

মোহসিনা চৌধুরী যুথী

রোল : ৩০২৪৮, শ্রেণি : একাদশ

আমি ছুঁতে চেয়েছিলাম আকাশের নীল কিন্তু ওরা ছুঁতে দেয় নি। মেয়েদের এত দুঃসাহস নাকি ভাল না। শৈশবের বন্ধু রুমি তপুর সাথে গোল্লাছুট খেলার বড় সাধ ছিল, কিন্তু বার বারই হাতে পুতুল দিয়ে পাশের রুনার সাথে পুতুলের বিয়ে খেলতে বলা হতো। মেলায় গিয়েই সবার আগে দৌড়ে হাতে তুলে নিতাম টিনের পেন, বড় হয়ে আকাশ ছোয়া একটা পেনের পাইলট হব। এমন গোপন ইচ্ছাও ছিল মনে, মিষ্টি বুঝিয়ে সেই পেনটা ছাড়িয়ে আমার হাতে দেয়া হতো রেশমি চুড়ি। ছোট্ট আমি চুড়িতেই খুশি হয়ে, মনের অজান্তেই নিজের চারপাশে গড়ে নিয়েছিলাম অদ্ভুত এক কাঁচের দেয়াল। বড় হতে হতে আরও অনেক কিছুই বুঝ দেয়া হল। আমিও মেনে নিতাম, না পারলেও নিজেই নিজেকে বোঝাতাম। কাঁদতাম, লুকাতাম, হারাতাম আবার নিজেকে খুঁজে বের করে হাসতাম। এরপর কোনো এক শীতের সকালে ঘন কুয়াশার চাদর ছিঁড়ে মিষ্টি রোদের মতো তুমি এলে। হাসালে, জয় করলে, আমার স্বপ্নগুলো নুতন আকাশ পেলো, ওড়ার জন্য। কষ্টগুলো সমুদ্র পেল ডুবে মরার জন্য। আর আমি! আমি পেলাম ডানা। বাতাসের সাথে পালা দিয়ে ভাসার জন্য অতপরঃ তুমিও বুঝালে “শোন, মেয়েদের এত ওড়াউড়ি ভাল না, ব্যাখ্যা ভরা চোখে তোমার দিকে তাকাতেই তুমি বললে ‘না মানে, কেউ তোমার দিকে বাকা চোখে চাইলে আমার দুনিয়া নড়ে যায়। তুমি পাশে না থাকলে আমার দমবন্ধ হয়ে আসে” ভালবাসার নেশায় বুদ আমি তোমাকে বিশ্বাস করে আমার আকাশকে বন্দি করলাম তোমার ছোট্ট সেই জং ধরা খাচায়। আর আমার রঙধনু রঙের স্বপ্নগুলো রং নিবে ধুপছোয়ায় হঠাৎ তোমার আকাশে দেখি বহু ঝলমলে রঙিন সব ঘুঁড়ির মেলা। বুকের ভেতর লক্ষ কোটি কাঁচ ভাঙার আওয়াজ আর পাড়ভাঙা জলোচ্ছ্বাসের রূপ। সবই দেখা হল ক্ষণিকেই। ঝড় থামতেই ধমক। হাওয়ার মতো নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে চলে এলাম। আবারও সেই একলা সাথে আমি। আমার নানা রঙের স্বপ্ন, তার আকাশ ছোয়ার সেই আজন্ম বাসনা, এখনও আমার হাতে সেই পুতুল দিতে চায় কেউ, স্বপ্নগুলোকে ভরতে চায় কাচের বয়মে। কিন্তু জেনে রেখো তুমি বা তোমরা, সে বা তাহারা। আমি তামব না, আমি ছাড়বো না আমার এক চুল অধিকারও। আমি হাটব, হোচট খাব, আবার হাটব, আমি উড়বো, পাখির সাথে সমান তালে, ক্লান্ত হব। পালা দেব ঝড়ের সাথে। কিন্তু নীল আকাশ আমি ছোবই।

গ্রাম্য ও শহুরে সমাজের স্বরূপ

পার্থ মজুমদার

রোল : ২৮৪৯৩, শ্রেণি : দ্বাদশ

গ্রাম্য সমাজের সব মানুষ পুরোপুরি প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে শিক্ষিত না হলেও তাদের মধ্যে যে প্রাণের স্পন্দন, নিজের শিকড়ের প্রতি যে ভালবাসা ও মমত্ববোধ আছে তা আমাদের মতো মানুষ হাজারো ডিগ্রি অর্জন করলেও ঐসব গুণগুলোর কাছে নিরর্থক নয় কি? আমার মতে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুধু আমাদেরকে গাদা গাদা সার্টিফিকেট উপহার দেয় কিন্তু সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য যে সকল গুণে গুণান্বিত হতে হয় তা নিজ সামর্থ্যের ও মানসিকতার উপর নির্ভরযোগ্য। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সার্টিফিকেট অর্জন তো হয়ই সেই সাথে ভাল কর্মসংস্থানের প্রবেশাধীকারে সহায়তা করবে। সার্টিফিকেট অর্জনের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা অর্জন হলো কিন্তু গৌরব রইল না। “শিক্ষার গৌরব নিজেকে বড় করা না, বরঞ্চ অন্য লোকদের বড় করার জন্যই শিক্ষিত লোকদের শিক্ষার গৌরব” কথাটি গোরা নামক উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক আগেই বলে গিয়েছেন। যে উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রকে ব্যক্তি হিসেবে চেনা যায়। যাক সেই কথা, আমার মনে হয় গ্রামের প্রকৃতি, পুকুর, নদী, গাছপালা, সুদীর্ঘ মাঠ, ফসলের ক্ষেত এইসব প্রাকৃতিক উপাদানই শিখিয়েছে কিভাবে ভালবাসতে হয় অন্যকে। আসলে এইসব উপাদাগুলোর মধ্যে একপ্রকার প্রাণের স্পন্দন আছে যা আত্মউপলব্ধির মাধ্যমে বোঝা যায়। অনেকেই হয়তো মনে করেন গ্রামে আছে শি? এইসব লোকের দলের লাইনের কাতারে আমিও ছিলাম এককালে কিন্তু আমার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হলো। একদিন। এক অনুষ্ঠানে গ্রামে নিজের ঠাকুরদার আমলের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তখন আমার এক সম্পর্কের কাকাতো ভাইয়ের সাথে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম নিজের অপরিচিত গ্রামের সাথে পরিচিত হতে। সেখানকার সবুজ শ্যামল ছায়াঘেরা গ্রামের প্রকৃতি দেখে আমি আশ্চর্য হলাম। এত সুন্দর প্রকৃতি আবার হয় না কি? আমি আরো আশ্চর্য হলাম যে ৪-৫ বছর আগে আমি আমার নিজ গ্রামে একবার পা রেখেছিলাম তাও পুরো দিনটা থাকবো বলে নয়। তখনকার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আমার পুরো উল্টো আজকের দিনের সাথে। আমার সেই কাকাতো ভাইয়ের সাথে ঘুরার সময় কিছু প্রবীণ লোকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তারা আমার পরিচয় জানার সাথে সাথে ব্যাকুল হয়ে আমাকে বুকে টেনে নেয়।

মানুষের প্রতি মানুষের মানবিক ব্যবহার আমি তাদের কাছ থেকে শিখেছি। কিন্তু শহুরে সমাজ তো এর উল্টো। এখানে ব্যস্ততায় পরিপুর্ণ মানুষরা অন্যকে কিভাবে সময় দেবে, তাদের তো সময়ই নেই। নিজের ও নিজেদেরকে সময় দিতে পারে না। থাক অন্য কিছু প্রদর্শনের ব্যাপার। তারা চলছে যুগের হাওয়ায়। তবে অনেকে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মূল্যায়ন করে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে। এর ফলে শহুরে মানুষ হয়ে উঠেছে নির্জিব। মনটা হয়ে গেছে যন্ত্রের মতো যন্ত্রী। তাই আমাদের উচিত শেকড়ের টানে নিজেকে পরিপূর্ণ মানুষ ও মণ প্রাণবন্ত করতে আপন শেকড়ের সন্ধান কিংবা শেকড়ের টানে গ্রামে যাওয়া। এমন কি দেখে আসা উচিত কেমন সুন্দর সেই গ্রাম।

জীবনের স্রোতে

আশরাফ মাসুদ দিব্য

রোল : ২৯৬৮৮, শ্রেণি : দ্বাদশ

চার দেয়ালের মাঝে ঘন কালো অন্ধকার। ইজি চেয়ারের কচ্‌ কচ্‌ শব্দ। ঠাস্‌ করে শব্দ হল। ধুলোয় মাখা টেবিলের ল্যাম্পটি জ্বলে উঠল। নিলয় সাহেবের বয়স আজ ৮৮ হল। তার চোখ ঝাপসা দেখাচ্ছে। এই ঝাপসা চোখের মাঝে স্পষ্ট ভেসে উঠছে তার জীবনের ৮৮টি বছরে কত স্মৃতি। জীবনের স্রোতে ভেসে গিয়েছে দীর্ঘ সময়। এ দীর্ঘ সময়ের মাঝে কত আনন্দ বেদনামাখা স্মৃতি বাসা বেঁধেছে তার শূন্য হৃদয়ে। উদাস মনে নিলয় সাহেব ভাবতে থাকেন তার অতীত। কতই না আনন্দ ছিল, বেদনা ছিল, হাসিকান্না ছিল। এখন সবই যেন হারিয়ে গেছে। স্কুল জীবনের কত স্মৃতি যা আর কখনই ফিরে আসবে না। কলেজের সেই ক্রাফেটেরিয়া যেখানে চলত ব্যস্ত আড্ডা, বন্ধুদের সাথে সুখেদুঃখে সময় কাটানো, একই সুরে ধ্বনি মেশানো, ঘুরে বেড়ানো কিছুই এখন নেই। একে একে হারিয়ে গেছে সবাই। জীবনের স্রোতে সবই যেন এভাবেই হারিয়ে যায়। সেগুলো আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। ভাবতেই যেন মন থেকে হাহাকার ভেসে ওঠে, বুকের মাঝে শূন্যতা অনুভব হয়। হঠাৎ নিভে গেল ল্যাম্প। আবারো অন্ধকার, ঘন কালো অন্ধকার।

নবজন্ম

নাহিয়ান সিফাত

রোল : ২৮৮৯৬, শ্রেণি : দ্বাদশ

ভাইয়া আমি কিছু দেখছি না, ভাইয়া আমি চোখে কিছু দেখছি না, ভাইয়া..........!!!

চঞ্চল একটি ছেলে "চয়ন"

ওরা দুই ভাই চয়ন আর ওর বড় ভাই "প্রহর"। চয়ন এর আব্বু সরকারি চাকরি করে। তিনি ঢাকায় থাকেন। আর আম্মু, প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। চাকরির স্থান পরিবর্তন করা যায় না বলে তিনি বাড়িতে (গ্রামে) থাকেন। "প্রহর" যখন "ষষ্ঠ" শ্রেণিতে উঠল তখন তার আব্বু প্রহরকে ওনার সাথে ঢাকায় নিয়ে আসলো ভাল স্কুলে পড়ানোর জন্য। চয়ন তখনও অনেক ছোট, স্কুলে ভর্তি হয় নি।

কিছু দিন পর চয়ন স্কুলে ভর্তি হলো, (শ্রেণি-নার্সারি) প্রতিদিন সকালে উঠে সে স্কুলে যায়। চয়ন এর স্কুল ছুটি হয় সকাল দশটায়। প্রতিদিন স্কুল শেষ সে বাড়িতে এসে তার বন্ধুদের সাথে খেলা করে, জঙ্গলে পাখির বাসা খুঁজে, নৌকা নিয়ে বিলে শাপলা ফুল তুলে, আম গাছে ঢিল ছুড়ে। এ রকম আরও অনেক দুষ্টুমি। চয়ন তার আম্মুকে অনেক ভালবাসে। তাই বিকেলে যখন চয়নের আম্মু স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে, তখন সারাদিনের সব দুষ্টুমির কথা চয়ন তার আম্মুর সাথে বলে। চয়ন এর আম্মু সব শোনার পর চয়নকে এতো দুষ্টুমি করতে মানা করে।

চয়ন বিভিন্ন পোষা প্রাণী পালন করতেও ভালবাসাতো। তার মধ্যে একটু অন্য জাতের প্রাণী বেশিই পছন্দ করত। (যেমন-টিক্কিওয়ালা মুরগি, গলা ছিলা মুরগি, সাদা রঙের মুরগি, কালো রঙের মুরগি। হাঁসের মধ্যে রাজহাঁস, পাতিহাঁস ইত্যাদি। শুধু তাই না, সে অন্য মানুষের ঘরে গিয়েও মুরগির বাচ্চা ডিম দেখে আসতো। আর এর ভিতরে যদি তার কোনোটা পছন্দ হতো তাহলে আগে থেকেই সেটা তার জন্য রাখতে হতো চয়ন এর একটা কুকুরও ছিল (নাম-টাইগার)। কুকুরটা চয়ন এর অনেক ভক্ত ছিল। চয়ন সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত ব্রাশ করতে করতে একবার টাইগার' বলে ডাকতো। আর সঙ্গে সঙ্গেই টাইগার (কুকুর) যেইখানেই থাকতো দৌড়ে চয়ন এর কাছে চলে আসতো। একবারতো একটা ছাগলও কিনে পালন করা শুরু করল...এক বছর পর সেই ছাগল বিক্রি করল। এসব দুষ্টুমির জন্য চয়ন এর দাদুর সাথে চয়ন এর মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝগড়াও হতো। বাড়ির আশেপাশে যারা প্রতিবেশি ছিল চয়নের এইসব দুষ্টুমির জন্য সবাই চয়নকে একটু বেশিই ভালোবাসতো। এভাবেই চঞ্চলতার মাঝেই তার প্রতিটি দিন পার হতো।

সব দুষ্টুমির মাঝেও ছোট থেকেই সে পড়াশোনায় বেশ ভাল ছিল। ক্লাসে সব সময় দ্বিতীয়, তৃতীয় রোল নং এর মধ্যে তার নাম থাকতো। এর জন্য চয়ন এর স্কুলের শিক্ষকরা চয়নকে অনেক পছন্দ করত। সে গ্রামের স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণি পাস করল।

তার পর চয়ন এর আব্বু ঠিক করল চয়নকেও তার সঙ্গে ঢাকায় নিয়ে আসবে ভাল স্কুলে পড়ানোর জন্য। সব দুষ্টুমি, আম্মুর আদর, দাদুর সাথে ছোট ছোট ঝগড়া, গ্রামের বন্ধুদের সাথে স্বাধীনভাবে খেলা করা, সব ছেড়ে চয়ন তার আব্বুর সাথে ঢাকায় চলে আসল। তার পর চয়ন এর আব্বু চয়নকে ঢাকার একটা ভাল বয়েজ স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিল।

আগের মতোই চয়ন প্রতিদিন স্কুলে যায়। কিন্তু ঢাকার স্কুল তার কাছে ভাল লাগে না। ঢাকায় আসার পর সে তার গ্রামের বন্ধুদের কথা ভাবে। সেই আদরের কুকুর, বন্ধুদের সাথে পুকুরে ঝাপ দেওয়া, শাপলা ফুল তুলা, দাদুর সাথে ছোট ছোট ঝগড়া আর গ্রামের সেই মুক্ত জীবন ছেড়ে চয়ন আজকে চার-দেয়ালের মধ্যে বন্দি। স্কুলের ছাত্ররা কেমন জানি, শিক্ষকগুলোও তার ভাল লাগে না। স্কুলে সে কোনো বন্ধু খুঁজে পাচ্ছিলো না। তার মাঝে "আম্মুর" জন্য তার মন খারাপ লাগে। যখন চয়ন বাড়িতে ছিল তখন যেকোনো কাজ করার আগে তার আম্মুর কাছে বলতো। কিন্তু ঢাকায় আসার পর সে একা একা ছোট সিদ্ধান্ত নিতেও দ্বিধাবোধ করতো। এইসব অভাব চয়নকে সব সময়ই অস্থিরতার মধ্যে রাখতো। একা একা থাকতে থাকতে চয়ন কেমন জানি হয়ে গেল। স্কুলে ছেলেদের সাথে মারামারি করে, ঠিক মতো পড়াশোনা করে না।

স্কুলের প্রথম পরীক্ষায় মাত্র তিন নাম্বারের জন্য তাকে ইংরেজি শিক্ষক ফেল করিয়ে দিলো। যেই ছেলে একবার ভাল করে ইংরেজি রিডিং পড়তে পাড়লেই মুখস্থ করে ফেলতে পারত, আজকে সে ইংরেজিতে ফেল করেছে। চয়ন ইংরেজি ভাল পারত বলে তার আম্মু বলতো চয়ন বড় হলে 'ইংরেজিতে অনার্স' পড়াবে। আর এখন সে ফেল করেছে। এসব চিন্তা করে সে আব্বু-ভাইয়ার অজান্তে প্রতিদিন রাতে অনেক কাঁদতো। তার কিছুই ভাল লাগত না। এতো কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তার খালি ঘুমিয়ে যেতে ইচ্ছে হতো। কারণ সব সময় সে মনে করতো যে ঘুমিয়ে গেলেই সব চিন্তা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ঘুম তো রাতেই শেষ হয়ে যায়। তাই ভেবে সে সারাজীবনের জন্যই ঘুমিয়ে যাওয়ার চিন্তা করল। কিন্তু কিভাবে? এই প্রশ্ন তার মাথায় সব সময় ঘুরপাক খেত...। যখন সে বাড়িতে ছিল তখন তাদের বাড়ির পাশেই একটা লোক পারিবারিক সমস্যার জন্য বিষ খেয়ে মারা গিয়েছিল। হঠাৎ তার এ্টা মনে পড়ল।

কিছুদিন পর স্কুল গ্রীষ্মের ছুটি দিয়ে দিল। সে তার আব্বুর সাথে গ্রামে বেড়াতে গেল। একদিন বিকেলে চয়ন এর আম্মু চয়নকে কিছু তরকারি কিনার জন্য বাজারে যেতে বলল। তার পর সন্ধ্যায় যখন সে বাজার করে বাড়িতে আসছিল তখন একটা কীটনাশক এর দোকান চয়নের চোখে পড়ল। সাথে সাথেই তার খারাপ চিন্তা মাথায় আসল এবং দোকানে ঢুকল। ভিতরে ঢুকে সে চারদিকে একবার তাকাল এবং দোকানদারকে নারিকেল গাছের পোকা মারার কথা বলে পঁচিশ টাকা দিয়ে বিষের বোতল কিনল। তার পর ঐটা পকেটে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগলো। মাঝ পথে এসে সে ভাবল সে চিরতরে ঘুমিয়ে যাবে। এই ভেবে বোতল এর মুখটা খুলল, কিন্তু সেই তরল পদার্থটার গন্ধ এতো বেশি কড়া ছিল সে গন্ধটা সহ্য করতে পাড়ল না, তাই আবার মুখটা বন্ধ করে বোতলটা পকেটে রেখে দিলো আর চলে গেল।

কিছু দিন বাড়িতে থাকার পর চয়ন এবং তার আব্বু আবার ঢাকায় চলে আসল। আর ঐ দিনও বোতলটা পকেটে করেই সে ঢাকায় নিয়ে এসেছিল। ঢাকায় আসার দিন বাসার কাছে এসে চয়নের একবার ইচ্ছে হচ্ছিল যে বোতলটা রাস্তায় ছুড়ে ভেঙ্গে ফেলতে। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য দুষ্টু শক্তির জন্য সে তা করতে পারল না। পরে বাসায় এসে বোতলটা সে খাটের নিচে একটা ব্যাগের ভিতর রেখে দিল। আর এই সব কাহিনী চয়ন তার খালাতো ভাই এর সাথে বলল। একদিন বোতলটাও বের করে দেখিয়েছিল। আর এইসব বলার আগে তাকে (ভাইয়াকে) অনেক "কসম" কাটিয়ে নিল। আর তার খালাতো ভাইকে বলল কথাগুলো যেন আর কাওকে না বলে। চয়ন এর খালাতো ভাই তখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সেও এত কিছু বোঝত না, তাই এইসব কথা এতো গুরুত্ব দেয় নি।

প্রতিদিন এর মতো ঐদিন সন্ধ্যায়ও চয়ন ও তার ভাই একসাথে টেবিলে বসে পড়ছিল। গ্রীষ্মের ছুটি শেষ, কালকে স্কুল খুলবে আর আবার সেই কষ্টের জীবন। টেবিলে বসে এইসব কষ্টের কথা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ চয়নের ঐ বিষের বোতলটার কথা মনে হল। আর সঙ্গে সঙ্গেই টেবিল থেকে উঠে ঐ বাতলটা নিয়ে সে বাথরুমে গেল। তখন আর কোনো কিছু চিন্তা না করেই বোতলটা মুখে নিয়ে দুই / তিন ঢোক খেয়ে ফেলল। আর বাকিটা বাতরুমে ঢেলে দিল, পরে তা যাওয়ার জন্য যতই পানি ঢালে ততই ফেনা হতে থাকলো। সে কোন কিছু ভেবে না পেয়ে বোতলটা কমটে ফে দিতে চাইল। (কিন্তু কোনো একদিন চয়ন এর আম্মু চয়নকে বলেছিল কমটে যেন এইসব বড় কোনো জিনিস না ফালায় তা হলে কমটে পানি আটকে যাবে, এই ভেবে সে বোতলটা কমটের ভিতর ফেলল না) একটু পর চয়ন এসে তার ভাইয়াকে বোতলটা দেখিয়ে বলল ভাইয়া আমি এইটা কমটের ভিতর ফেলল না) একটু পর চয়ন এসে তার ভাইয়াকে বোতলটা দেখিয়ে বলল ভাইয়া আমি এইটা খেয়ে ফেলছি। তার ভাইয়া বোতলটা হাতে নিয়ে বিষ লেখা দেখেই চিন্তিত হয়ে পড়ল। চয়ন এর ভাইয়া সাথে সাথে চয়নকে ডাক্তারের কাছে নেওয়ার জন্য শার্ট পড়তে বলল। তখন মুচকি হেসে বলল, ভাইয়া ডাক্তারের কাছে গিয়ে কী হবে? আমি আর বাঁচব না.............

তখন ভাইয়া চয়নকে একটা ধমক দিয়ে বলল শার্ট পড়!! পরে রাস্তায় এসে অন্য একটা ভাইয়াকে নিয়ে পাশেই একটা ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার তখন ফোনে কথা বলছিল। আর চয়ন এর ভাইয়া যখন ডাক্তারকে বোতলটা দেখিয়ে বলল যে চয়ন এইটা খেয়ে ফেলছে। এইটা দেখে ডাক্তার চয়ন এর ভাইয়াকে বলল যে চয়নকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে। চয়নের ভাইয়া দোকান থেকে বের হয়েই একটা রিকশায় উটল চয়নকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য। ততোক্ষণে বিষ চয়নের শরীরের শক্তি ক্ষমতা কমিয়ে দিতে লাগল। মাঝ পথে এসে চয়ন বলতে লাগল ভাইয়া আমি চোখে কিছু দেখছিনা, ভাইয়া আমি চোখে কিছু দেখছিনা.... তখন চয়ন এর ভাইয়া বলল এইত আর একটু সময় হাসপাতালে চলে যাব....... চয়ন ভাইয়া বলে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।।
তারপর চয়নকে ICU তে নিয়ে যাওয়া হল। আর প্রায় বিশদিন হাসপাতালে থাকার পর .... বাড়ির সবার দুয়ার, মহান আল্লাহ তা'আলার অবদানেই চয়ন পুনরায় সুস্থ পড়ে পড়ল। সবার দোয়া সব সময়ই কাজে লাগে বলা যায়। কারণ ঐ বোতলের উপরে বিষের প্রতিষেধক এর নাম লিখা ছিল। আর ঐদিন যদি চয়ন বোতলটা বাথরুমের কমটে ফেলে দিত, তবে হয়তবা প্রতিষেধকের অভাবে চয়ন এর মৃত্যু হতো। কিন্তু মহান আল্লাহর রহমতেই চয়ন আবার তার জীবন ফিরে পেল। পরে সে আর ঢাকায় থাকল না। তার আম্মুর কাছে গ্রামে চলে গেল এবং আম্মুর স্কুল এর সাথের উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পরল..................।।

সাইফুল আলম

কোনো এক দিন ১১ বছরের এক বালিকা তার বাবাকে বললো, বাবা! আমার ১৫তম জন্মদিনে আমাকে কী দিবে? বাবা বললেন এখনো তো অনেক সময় আছে, দেখা যাক----- মেয়েটির ১৫ তম জন্মদিনের কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন সে অজ্ঞান হয়ে গেল-- দ্রুত তাকে হাসপাতালে নেয়া হলো---- ডাক্তার মেয়েটিকে পরীক্ষা করল--- মেয়েটির বাবাকে ডাক্তার বললো, আপনার মেয়ের হার্টে একটি ছিদ্র ধরা পড়েছে----দ্রুত হার্ট পরিবর্তন না করলে তাকে হয়তো বাঁচানো যাবে না---।
যখন বাবা মেয়েকে দেখতে গেল,

মেয়ে : বাবা! আমি কি মারা যাবো?
বাবা : না, তুমি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে।
মেয়ে : তুমি কিভাবে জানো? ডাক্তার বলেছে, আমার হার্ট বন্ধ হয়ে যাবে।
বাবা : আমি জানি না, তুমি অবশ্যই সুস্থ হয়ে যাবে। মেয়েটি দীর্ঘকাল হাসপাতালে চিকিৎসার পর একসময় সুস্থ হয়ে বাসায় আসলো ও তার বাবাকে খোঁজতে লাগলো। এর মধ্যেই তার বয়স ১৫ বছর হয়ে গেল--- এর মধ্যেই তার মা তাকে খামে ভরা ও আটকানো একটি চিঠি দিল। সে অত্যন্ত কৌতূহল বসত চিঠিটি খুললো। চিঠিটি ছিল তার বাবার লিখা---
"প্রিয় মা আমার। তুমি যখন এ চিঠিটি পড়ছো তার অর্থ হলো সব কিছুই ঠিক মতোই হয়েছে এবং তুমি সুস্থ আছো যেমনটি আমি বলেছিলাম-----
মনে আছে? একদিন তুমি প্রশ্ন করেছিলে, তোমার ১৫ তম জন্মদিনে আমি তোমাকে কী উপহার দিব। তখন আমি জানতাম না কী দিব---- তখনই আমি বুঝলাম তোমাকে আমি কি দিতে পারি----
তাই তোমার জন্যে আমার উপহার আমার "একমাত্র হার্ট"
আমি তোমাকে এর থেকে কম ভালবাসি না---

বাবা-মাকে আমরা কখনো যেন ভুলেও কোনো কষ্ট না দেই কারণ, তারাই আমাদের ছোটবেলার সব কষ্ট থেকে আগলে রেখেছিলেন।

জীবন

সুদীপ্ত চক্রবর্ত্তী

রোল : ৩১২২৭, শ্রেণি : একাদশ

ঢাকা শহরের একটি বস্তি। আশরাফুল নামের এক রিক্সাচালকের বাস সেখানেই। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করেই তার রোজকার দিন অতিবাহিত হয়।
রিক্সাটাকে গ্যারেজে রেখে ধীর পায়ে বের হয়ে এল আশরাফুল। আজ তার মনটা একটু খারাপ। অবশ্য মন খারাপটাকে ও খুব একটা পাত্তা দেয় না। ছোটলোকের আবার কিসের মন খারাপ। গরিবের তো পেটে লাথি খেয়েই বড় হতে হয়। ঈশ্বর গরিবের পেট তৈরি করেই তো লাথি খাওয়ার জন্য। তা ঠেকানোর সাধ্য কারও নেই। তবুও আজ কেন যেন তার অনেক কষ্ট হচ্ছে নিজের কথা ভেবে।
মনটা খারাপ আজ বিকেল থেকেই। ঘটনাটা ঘটল বিকেল

বেলাতেই। এক যাত্রী থেকে মিরপুর যাবে। কিছু না বলেই সে রিক্সায় চড়ে বসল। সাধারণত এই ধরনের যাত্রী বাড়া নিয়ে ঝামেলা করে না। যাত্রী মিরপুর নেমে ৩০ টাকা ধরিয়ে দিল। আনিস তখন যাত্রীকে বলল "৩০ ট্যাকা ক্যান আরও ১০ টাকা দেন"। যাত্রীটি চিৎকার করে উঠল "কবে শ্যামলী থেকে মিরপুর ৪০ টাকা হলো? ফাইযলামো পাইছো নাকি"? ঘাম মুছতে আশরাফুল বলল "আপনার লগে আমি ফাইযলামো করুম ক্যান"? অমনি যাত্রীটি ভয়ংকর ভাবে খেপে গিয়ে আশরাফুলের শার্টের কলার ধরে দুই তিনটে থাপ্পর লাগিয়ে দিল। দুই একজন বলেও উঠল "ঠিকই আছে"। আবার অনেকে বলল "ওদের এভাবেই মারা উচিত," তখন কারও মনে ছিল না সহমর্মিতা। সেই নিম্নশ্রেণির কুকুররূপী মানুষটার প্রতি ছিল না কারও সমবেদনা। সবশেষে আবার গা ঝারা দিয়ে উঠে নিজের সঙ্গী রিক্সাটাকে নিয়ে চলল নিজের বস্তির দিকে। নতুন বিয়ে করেছে আশরাফুল। মনে তার অনেক আশা। আশাগুলো খুব বড় নয়। আশরাফুল ভাল করেই জানে পৃথিবী ও তার মানুষ তার নিজের পক্ষে না পুরোই বিপক্ষে। ঘরে ঢুকেই মেঝেতে পড়ল শুয়ে আশরাফুল। তার ঘরটা রান্নাঘরের পাশে। রান্নাঘরের অসহ্য তাপে সে হাসফাস করতে লাগলো। মনে হয় জ্বর আসবে। এরই মধ্যে আশরাফুলের বউ হালিমা ঝাঝালো কণ্ঠে বলে উঠল "কী ব্যাপার এত জলদি রিক্সা থুইয়া আইয়া পরছ"? আশরাফুল হালিমার দিকে ক্লান্ত হয়ে তাকিয়ে আছে। হালিমার চেহারায় কোনো মমতার ছাপ নেই। হায়রে অভাব, অভাব এমনই বিচিত্র যা মমতাকেও অন্ধকারে তলিয়ে দেয়। আবারও হালিমা চেচিয়ে উঠল "খাওনের সময় তো কম খাও না খালি ঘরে আইলেই কষ্ট।" ওই বাড়ির সখিনারে দেখছ কত শখ করে। "আনবার সময় কত কথা" তোমারে এই দিমু, সেই দিমু আর অহন।" এসব কথা শুনতে শুনতে আশরাফুল ঘুমিয়ে পড়ে। পরবর্তীতে হালিমা যখন জানতে পারে আশরাফুলের গায়ে অনেক জ্বর তখন সে তার পাশে বসে জলপট্টি দিতে থাকে। তখন আশরাফুল হালিমাকে বলে 'তোরে আমি গয়না কিন্না দিমু।' শাড়ি কিন্না দিমু, হালিমা নরম গলায় বলল- "লাগব না, তুমি অহন ঘুমাও। চোখ মুছতে মুছতে হালিমা বলে শাড়ি, গয়না দিয়া আমি কী করুম।" আশরাফুল আবার বলে তোরে আমি গয়না দিমু, শাড়ি দিমু"।

ক্ষমতা

তানজিন ফরহাদ জেনি

ক্রমিক নং : ৩০৩১৪, শ্রেণি : একাদশ

আকাশের রংটি কেমন জানি হয়ে আছে। কোথাও লাল আভা, কোথাও নীল, কোথাও হলুদ কমলা। সব মিলিয়ে অসাধারণ এক গোধুলী বেলা। আমি আমার মতো করে প্রত্যেকটা রংকে উপভোগ করতে পারছি। এমন গোধূলি বেলায় নগ্ন পায়ে ভিজা বালুর মাঠে পায়চারি করা মজাই আলাদা। নদীতে পা ভেজাতে ইচ্ছা করছে।

ঐ তো, ঐ তো সামনে একটা নদী দেখা যাচ্ছে। এক দৌড়ে রিদি নদীর ধারে চলে গেল। কাছে গিয়ে চমকে উঠল রিদি নদীর পানি কি এতো পরিষ্কার ও নীল থাকে? প্রশ্ন করল নিজেকে। যাই হোক আজ আর কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ইচ্ছা করছে না রিদির। অল্প পানিতে পা ভেজাতে লাগল রিদি। যেহেতু সন্ধ্যা হয়ে গেছে মা-এর ডাক পরল।

রিদি, রিদি ঘড়ে আয় মা। হাত-পা ধুয়ে পড়তে বস; "আসছি রিদি উত্তর দিল।

আজ দিনটাই অন্য রকম। আজ সব কিছুই ভাল লাগছে। ঘরে এসে রিদি খুব সময় ও যত্ন নিয়ে হাত পা পরিষ্কার করল। পড়াও শেষ করল। আজ রিদির কোথাও বসে থাকতে ইচ্ছা করছে না দৌড়ে বেড়াতে ইচ্ছা করছে। তাই বার বার এক ঘড়ের এক কোনা থেকে অন্য কোনে ছুটে বেড়াচ্ছে।

বাবা আসতে আসতে অনেক রাত হয়। আজ রিদি ঘুমাবে না। জেগে থাকবে। তার মনে হচ্ছে ঘুমুলেই বুঝি সব মজা সব শান্তি শেষ।

বাবা সব সময় অফিস থেকে আসার পথে রিদির জন্য কিচু না কিছু নিয়ে আসেই। আজ রিদি দেখতে উৎসুক যে বাবা তার জন্য কি আনবে। বাবাকে রিদি অনেক ভালবাসে। কারণ বাবা রিদির না বলা কথাগুলোও বুঝে ফেলে। কেমন করে যেন সব সমস্যার সমাধান করে দেয় বাবা।

বাবা ফিরলো অনেক রাত করে। এসে রিদির হাতে একটা বাক্স দিল বলল এটা সাবধানে রাখ কালকে খুলবি। রিদি নিজেকে উৎসাহে আটকাতে না পেরে বাক্সটা খুলেই ফেলল। ভিতরে ছিল একজোড়া নূপুর, রূপার নূপুর। নূপুর পেয়ে সে মহাখুশি। অতরাতেই রিদির নূপুর পরে নদীর পানিতে পা ভেজাতে ইচ্ছে করছে। সে সারা রাত জেগে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু নুপুরের কথা ভাবতে ভাবতে সে যে কখন ঘুমিয়ে পরল।

সকালে মার ডাকে ঘুম ভাঙ্গল। "রিদি, রিদি উঠ মা" রিদি চোখ খুলে মার দিকে তাকাল। তার পর মার হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল মা তার দিকে ক্রাচ এগিয়ে দিচ্ছে। মা তাকে ক্রাচ এগিয়ে দিচ্ছে কেন? রিদি কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। সে বালিশের নিচে হাত দিল। বাক্সটা খুঁজল। রিদি বাক্সটা পাচ্ছে না। মাকে জিজ্ঞেস করল। "মা, বাক্সটা?

মা অবাক হয়ে বলল, "কিসের বাক্স" "ঐ যে কাল রাতে বাবা আনল সেই বাক্স" তোর বাবা তো তোর জন্য পুতুল এনেছে।

তোর টেবিলের ওপর রেখেছে দেখ!
“আসলেই টেবিলের উপর একটা নতুন পুতুল রাখা। তবে কি রিদি স্বপ্ন দেখল? না না স্বপ্ন এতো বাস্তব হয় না। ওটা স্বপ্ন ছিল না। রিদি তাড়াতাড়ি নূপুরগুলো খোজার উদ্দেশে বিছনা থেকে নামল মা তাকে ধরতে এগিয়ে আসল। মা কেন এগিয়ে আসছে? আমি কি একা দাঁড়াতে পারব না? দাঁড়াতে গিয়ে রিদি অমনি পড়ে যেতে ধরল। মা ধরে ফেলল।
রিদি তার পায়ের দিকে তাকাল, একি! তার পা বাকিয়ে কেন? কাল রাতেই তো নব ঠিক ছিল। তাহলে এইসব কি?
মার দিকে তাকাল রিদি ভেজা চোখে। দেখল মার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। তা হলে কি মা আগে থেকেই জানত মা, আমার নূপুরগুলো? “মা বুঝতে পেরে বলল, “মা, তুই কি কোনো স্বপ্ন দেখেছিস?
রিদি নিশ্চুপ। অর্থাৎ সব স্বপ্নই ছিল।
বাস্তবতা হচ্ছে সে পঙ্গু। ৫ বছর বয়স থেকে সে পোলিওতে আক্রান্ত। তার দুই পা বাকানো। সে ক্রাচের সাহায্যে ছাড়া হাটতে পারে না। সব কিছুই তার মনে পরে গেল। বাবা ঘরে ঢুকল। রিদি বাবার দিকে তাকিয়ে কেঁদে দিল। বাবা রিদির মাথায় হাত দিয়ে বলল মা, ভাবছিস এটা তোর অক্ষমতা। কিন্তু আল্লাহ যে তোকে এর বড় ক্ষমতা দিয়েছে। “রিদি ভেজা চোখে এবং অবাক দৃষ্টি নিয়ে বাবার দিকে তাকাল এমন কি ক্ষমতা আছে তার? বাবা বলল, “চিন্তা করার ক্ষমতা, চিন্তাশক্তি। 'Imagination power' তুই স্বপ্ন, তোর চিন্তাকে বাস্তবের মত অনুভব করতে পারিস কয়জন পারে এমনটা? আলাহ্ তোর একটা ক্ষমতা নিয়ে তোকে বড় ক্ষমতা দিয়েছে” রিদি কান্নাবন্ধ করে বলল, “হ্যাঁ, বাবা তুমি ঠিকই বলেছ।” মেয়েকে শক্ত হতে দেখে বাবাও শান্তি পেলেন। আসলে মেয়ের এই অবস্থার জন্য তিনিই দায়ী। পোলিও টিকার প্রতি গুরুত্ব দেয় নি রিদির বাবা-মা। এই অবহেলার জন্য আজ রিদি অবহেলিত সমাজে। তারাও চোখের পানি ফেলে। এসব ভেবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন রিদি বাবা এবং মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন তার কী লাগবে, যা চাইবে এনে দেয়া হবে তাকে। রিদি বাবার কাছে ক্যানভাস, রং তুলি ও ডাইরি চাইলো। বাবা তাকে এসব চাওয়ার কারণ জানতে চাইলে সে উত্তরে বলে, আমি আমার স্বপ্ন আর ভাবনাগুলোকে বাস্তব ভাষায় বুঝতে চাই। শুনে খুশি হলেন রিদির বাবা।
বিকেলের মধ্যে রিদির বলা মতো সব হাউজ হল একটা লাল বাক্স। বাক্সটা রিদির হাতে দিয়ে বাবা বললেন, “মা, তোর অক্ষমতাই তোর ক্ষমতা,” বাক্সে ছিল রিদির স্বপ্নের নূপুর। বাবা ভেজা চোখে ও হাসি মুখ নিয়ে নূপুর পরিয়ে দিল। রিদি তার অক্ষমতা ভুলে গেল। আজ ৫ বছর পর রিদির আঁকা ছবি শহরের নামি-দামি আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শনীতে উঠে, তার লেখা বই সবাইকে চরম বাস্তবতার মুখোমুখি করে। রিদি আর অক্ষমতাকে ভয় করে না, সে ক্ষমতাকে জয় করে। পঙ্গুকে অবহেলা কারে না পঙ্গুওকে অবহেলা কর। অবহেলা করো না কোনো প্রতিবন্ধীকে। মনে রেখ তারাই আমাদেরকে জীবনের অর্থ বুঝিয়ে যায়। তাই তারা Special child.

রহস্য উদ্ঘাটন

মোঃ তাসদীদুল ইসলাম রোকন
রোল : ৩০৭৮৪, শ্রেণি: একাদশ

লেখক ইকবাল চৌধুরী, তিনি মূলত রহস্য-উপন্যাস লেখেন। তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। একা মানুষ, সারা জীবন লেখালেখি করেই কাটিয়েছেন। লেখালেখি-ই তার জীবন হয়ে গেছে। একা মানুষ বলে কোনো পিছুটান নেই। লেখার প্রয়োজনে গল্পের পট খুঁজতে তিনি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ান। তার স্কুল-কলেজ এর বন্ধু-বান্ধবের বেশির ভাগের সঙ্গেই তার এখন আর যোগাযোগ হয় না। শুধু আব্রার হোসেন নামে একজন সাংবাদিক আছেন যিনি তার সাথে একই কলেজে পড়তেন। কেবলমাত্র আব্রার এর সাথেই ইকবাল সাহেবের নিয়মিত যোগাযোগ হয়। তারা দুজনে আসলে খুব ভাল বন্ধু। আব্রার বিবাহিতা। তার এক ছেলে ও মেয়ে আছে। বউ-সংসার নিয়ে আব্রার সাহেব ঢাকার ঝিগাতলায় থাকেন। আর ইকবাল কলাবাগানে একটা বাসা নিয়ে ভাড়া থাকেন। তবে মাসের বেশির ভাগ সময় তিনি গল্পের বিভিন্ন পট খুঁজতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যান। তার এইবার ইচ্ছে হল যে, সুন্দরবানের কাছাকাছি থেকে ঘুরে বেড়াবেন। এতে ঘুরাও হবে আবার লেখলেখির কাজও হবে। যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি রীতিমতো গিয়ে উঠলেন খুলনার ছায়াবিথি হোটেলে। হোটেলটা শহরের একটু বাইরের দিকে রূপসা নদীর পাড় ঘেঁসে; সবচেয়ে ভাল দিক সুন্দরবানের একেবারে কাছাকাছি হোটেলে। হোটেলের সীমানা যেখানে শেষ এরপরই নদী আর নদীর ওপারেই সুন্দরবান। ইকবাল গিয়ে উঠলেন ওই হোটেলের দুই তালার একটা রুমে। হোটেলের মালিক তানভীর সাহেব তাকে দেখেই চিনতে পারেন। তিনি ইকবাল সাহেবের খুব বড় একজন ভক্ত। তাই ইকবাল সাহেবের যেন কোনো অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ রাখার জন্যে হোটেলের সবাইকে বলে রাখলেন। বিকেল বেলায় ইকবাল সাহেব হোটেল থেকে বের হলেন চারপাশটা একটু ঘুরে দেখবেন বলে। খুব দূরে যেতে হল না অবশ্য, পাশেই নদীর পাড়ে খুব সুন্দর বাগান। নানা রকম দেশি-বিদেশি ফুল সেখানে। ইকবাল সেগুলো দেখে খুবই মুগ্ধ হলেন। একটু পর তিনি খেয়াল করলেন হোটেল ম্যানেজার তার পিছনে পিছনে এসেছে। তাকে দেখে

ইকবাল সাহেব বাগানটার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে বাগানের মালিকের কথা জানতে চান। ম্যানেজার জানান যে বাগানটি ওই হোটেলের আগের মালিকের। আগের মালিক-কে শৌখিন বলে মনে হল ইকবাল সাহেবের, তাই তানভীর সাহেবের কাছে সেই আগের মালিকের সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। ইকবাল সাহেবের আগ্রহ দেখে তানভীর সাহেবও আগের মালিকের সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন।

"আমি যার কাছ থেকে এই হোটেলটা কিনেছিলাম সেই মহিলার স্বামী ও স্বামীর বন্ধু এই হোটেলের মালিক ছিলেন। এই হোটেলের নিচ তলায় একটা রুম আছে, ওই রুমেই স্বামী-স্ত্রী থাকতেন। দুইজন মিলে হোটেলের ব্যবসা দেখতেন। তাদের যে পার্টনার ছিলেন তিনি ঢাকায় ব্যবসা করতেন। এদিকে খুব একটা আসতেন না। শুধু কয়েক মাস পর পর এসে নিজের লাভের টাকা নিয়ে চলে যেতেন। ভদ্র মহিলার নাম ছিল রূপা তার স্বামী ছিলেন আর উনাদের পার্টনারের নামে ছিল জাহিদ। হোটেল ভালই চলছিল কিছুদিন পর মালিকের হঠাৎ করে অনেক টাকার দরকার হল। সে চাইল হোটেল বিক্রি করে দিতে। কিন্তু হিমেল ও তার স্ত্রী তাতে রাজি হচ্ছিল না। কিন্তু এক পর্যায়ে জোর-পূর্বকভাবে জাহিদ তাদেরকে রাজি করায়। সেই ঘটনা মতে তানভীর সাহেবই হলেন তাদের কাস্টমার।

৬০ লাখ টাকায় দাম ঠিক হল হোটেলটার। তানভীর সাহেব নগদ টাকা দিয়ে হোটেলটা কিনে নিলেন, দলিল-পত্র ঠিক করা হয়ে গেল। তানভীর সাহেব যেদিন টাকা পরিশোধ করলেন সেইদিনই ঘটল এক ভয়ংকর ঘটনা। ৬০ লাখ টাকার অর্ধেকটা পেয়েছিল জাহিদ আর বাকি অর্ধেক পেয়েছিল রুপা ও হিমেল। টাকাটা তখন রুপা আর হিমেল ব্যাংকে জমা রাখে নি। মনে হয় ভেবেছিল পরের দিন দিবে। হোটেলের নিচ তলায় যে রুমে তারা থাকতো সেইখানেই টাকাটা রাখা ছিল। আর সেখানে রুপার আরও অনেক গয়না-গাটি ছিল। জাহিদও সেদিন রাতে হোটেলে ছিল। কথা ছিল পরদিন সে টাকা নিয়ে ঢাকায় চলে যাবে। কিন্তু সেদিন মাঝরাতে হিমেল খুন হয়েছিল। তার স্ত্রী রুপাকে বেধে রেখে তাদের সব টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি নিয়ে পালিয়ে গেল জাহিদ। কিভাবে খুন হয়েছিল হিমেল, সেটা পরে পুলিশের কাছে জবানবন্দিতে বলেছিল রূপা। সেদিন মাঝরাতে নাকি, জাহিদ জরুরি কথা আছে বলে হিমেলকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো। অনেকক্ষণ পর দরজায় আবার নক হলে রুপা ভেবেছিল হয়ত হিমেল ফিরে এসেছে। কিন্তু দরজা খুলে দেখে জাহিদ। রুপাকে কোনো রকম কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে জাহিদ, তার পর তাকে খাটের সঙ্গে বেঁধে রেখে আলমারি ভেঙ্গে গয়না আর টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। যেহেতু জাহিদই হোটেলের মালিক তাই তাকে কেউ সন্দেহ করে নি বা আটকায় নি। পরের দিন সকালে একজন বেয়ারা রুপাদের রুমে গিয়ে এই অবস্থা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে অনেক খোঁজাখুঁজির পর নদীর ওইপাড় থেকে হিমেলের লাশ উদ্ধার করে আসলে লাশ বলতে কিছুই ছিল না, খালি হাড়গুলো। বডির অনেকটাই বাঘে কিংবা অন্য কোনো পশু খেয়ে ফেলেছে। তবে লাশের গায়ে শার্ট দেখে রুপা তার স্বামীর লাশ চিনতে পারে। এরপর জাহিদকে অনেক খোঁজা হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। অনুসন্ধানে জানা যায় জাহিদ আসলে স্মাগলার ছিল। সোনা চোরাচালানের সাথে জড়িত ছিল সে। ওই সময় ঢাকার বিমানবন্দরে প্রায় কোটি টাকার চালান পুলিশের কাছে ধরা পরে জেটা মানিকের ছিল। কিন্তু জাহিদ কোনো মতে বেচে যায় যায়। এ বিশাল লোকসান মিটাতে সে তার হোটেল বিক্রি করার প্ল্যান করে এবং হিমেলকে খুন করে সব টাকা-গয়না নিয়ে পালিয়ে যায়। স্বামী হত্যার বিচার না পেয়ে রুপা ভীষণ হতাশ হল। কিছু উপায় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত হোটেলটা তানভীর সাহেবের হাতে হ্যান্ডওভার করে খুলনা চেড়ে চলে যান। কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞেস করলে বলেন, আমার এক মামার বাসায় যাচ্ছি। তার পর থেকেই হোটেলটা তানভীর সাহেবের হয়ে যায়। ঘটনা শুনে ইকবাল সাহেব ভাবলেন এই বিষয়ের উপরেই তো তার একটা গল্প লিখা যেতে পারে। কিন্তু গল্পটার শেষটা কিভাবে করবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। তিনি এ বিষয়ে আরো একটু তদন্ত করার জন্যে তানভীর সাহেবের কাছে রুপা আর মান্নানের রুমটা দেখতে চাইলেন। রুমে তাদের কিছু পুরনো আসবাবপত্র ছাড়া আর তেমন কিছু ছিল না। তিনি সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ তার নজর পরে গেল আলমারির দিকে। পুরনো দিনের কাঠের আলমারি, অনেকদিন ঝারা-মুছা না করায় প্রায় নষ্টই হয়ে গেছে। আলমারিটা খুলে ভিতরের জিনিসপত্রগুলো দেখতে লাগলেন ইকবাল সাহেব। হঠাৎ একটা ড্রয়ারের কোনায় ছোট্ট একটা কাগজ পেলেন তিনি। চিরকুটের মতো একটা ছেরা কাগজ। তানভীর সাহেব যাতে ওইটা না দেখতে পান সেভাবে তিনি চিরকুটটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন। আরো কিছুক্ষণ রুমটা দেখে ইকবাল সাহেব তানভীর সাহেবকে নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে পরলেন। রাতের বেলায় তানভীর সাহেব চলে যাবার পর ইকবাল সাহেব পকেট থেকে চিরকুটটা বের করে দেখেন একটা ঠিকানা লিখা, সিলেটের একটা জায়গার। ইকবাল বেশ কয়েকবার সিলেটে গেছেন কিন্তু জায়গাটা ঠিক চিনতে পারলেন না। তবে ঠিকানা পড়ে বুঝতে পারলেন সিলেটের শহরের কোনো একটা জায়গা হবে। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন তার পর তার বন্ধু আব্রার সাহেবকে ফোন করলেন। তার পর তাকে পুরো ঘটনাটা সংক্ষেপে বলে সেই ঠিকানা দিয়ে তাকে সেই জায়গায় গিয়ে খোঁজখবর নিতে বললেন। বন্ধুর এইসব উদ্ভট আচরণের সাথে অনেক আগে থেকেই পরিচিত আব্রার, তা ছাড়া এ ধরনের কাজে ইকবালকে সাহায্য করতে তার খুব ভালও লাগে। তাই জরুরি

কাজ বলে বাসায় জানিয়ে দিয়ে আব্রার সাহেব রওয়ানা দেন সিলেটের পথে। শহরের ভিতর যাবার পর আশেপাশের লোকজনদেরকে জিজ্ঞেস করতে বাড়িটা খুজে পেল আব্রার। বাড়ির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ির দরজা নক করল। কিছুক্ষণ পর একজন বয়স্ক মতো লোক এসে দরজা খুলে দিলেন। লোকটি আব্রার সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, "কাকে চাই?"

আব্রার সাহেব বললেন, "আমি এই বাড়ির মালিকের সাথে একটু কথা বলতে চাই।" মালিকের কাছে যা বলার দরকার আছে তা লোকটির কাছেই বলার জন্যে আব্রার সাবেকে বললেন। এর-ই মধ্যে একজন মহিলা বাইরে এসে আব্রার সাহেবকে বললেন, "আমিই এই বাড়ির মালিক, বলুন কী বলবেন।" "মহিলার নাম জেনে বুঝা যায় তিনিই সেই রুপা যার স্বামী ক্ষুণ হয়েছিল। বাড়ির ভিতর ঢুকে আব্রার সাহেব খেয়াল করলেন ঘরের আসবাবপত্রগুলো বেশ দামি এমন কি রুপার পরনের শাড়িও অনেক দামি। অথচ রুপা নিজেকে অনেক গরিবের মতো করে উপস্থাপন করতে চাইছে। লোকটি সম্বন্ধে জানতে চাইলে বলেন উনি বাড়ির কেয়ারটেকার আজিজ। রুপা জানতে চান আব্রার সাহেব কিভাবে জানলেন যে রুপা সিলেটে আছেন। উত্তরে আব্রার সাহেব ইকবাল সাহেবের কথা বলেন। আর কিছু টুকিটাকি বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে আব্রার সাহেব রুপার বাসা থেকে চলে আসেন। হোটেলে ফিরে এসেই ইকবাল সাহেবকে ফোন করে সব খুলে বললেন। কেয়ারটেকারের কথা শুনে তার বয়স আর চেহারার বিবরণ নিয়ে নেন। তার পর আব্রার সাহেবকে আরও দুই-তিন দিন ওইখানে থেকে রুপার বাসার উপর কড়া নজর রাখতে বলেন। বন্ধুর এই রকম কথায় আব্রার কিছুই বুঝতে পারলেন না। ওদিকে বন্ধুর কাছ থেকে পুরো বেপারটা শুনে ইকবাল সাহেব অনেক ভালভাবে ভাবলেন বেপারটা। আস্তে আস্তে পুরো রহস্য তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। পরদিন সকালে উঠেই তিনি তানভীর সাহেবকে ফোন করে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিলেটের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। বিকেলবেলা সিলেট পৌঁছানো সাথেই আব্রার সাহেবকে নিয়ে তিনি সিলেট সদর থানায় গিয়ে ওসি সাহেবের সাথে আলাদা একটা ঘরে বসে অনেকক্ষণ কী নিয়ে যেন আলাপ করলেন। কথা শেষ হবার পর ওসি সাহেব কিছু সংখ্যক পুলিশ নিয়ে ইকবাল এবং মাসুদের সাথে গাড়িতে রওয়ানা দিলেন। ইকবাল সাহেব আব্রারকে বললেন রুপার বাসাটি চিনিয়ে দিতে। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই তারা রুপার বাসার সামেন পৌঁছে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা সবাই অবাক হয়ে গেল। কেন না, বাসায় কেউ ছিল না। পাশের একটি দোকানে খোঁজ করে জানতে পারে যে মাঝ রাতে রুপা ও তার বাসার কেয়ারটেকার সিএনজি দিয়ে কোথায় জানি গেছে। তার পর ওসি সাহেব বাসার তালা ভেঙ্গে ঘরে তলাশি করার আদেশ দেন। তলাশির সময় আলমারি থেকে একটা স্বামী-স্ত্রীর ছবি পাওয়া গেল। ছবি দেখে আব্রার সাহেব একদম অবাক হয়ে গেলেন। কেন না, ছবির লোকটিই ছিল সেই বাড়ির কেয়ারটেকার। তার পর ইকবাল সাহেবের কাছে সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল। হোটেলের সেই রাতে হিমেল খুন হয় নি বরং খুন হয়েছিল জাহিদ। হোটেল বিক্রির কথা উঠার পর রুপা ও হিমেল বুঝতে পেরেছিল যে তারা শত চেষ্টা করলেও হোটেল বিক্রি ঠেকাতে পারবে না। তাই স্বামী- স্ত্রী মিলে ভয়ংকর একটি পরিকল্পনা করে। আর সেটি হল জাহিদকে খুন করে সকল টাকা নিজেরা নেয়ার। মানিকের অবৈধ ব্যবসা তা তারা আগে থেকেই জানতো। কাজেই কোনো একটা খারাপ কাজ করে জাহিদকে সহজেই ফাসানো যাবে। পরিকল্পনা মতো ঘটনার রাতে হিমেলই জাহিদকে হোটেল থেকে ডেকে নিয়ে যায়। তার পর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে হিমেল তার পোশাক জাহিদকে পরিয়ে দেয় এবং লাশটি নদীর ওপারে ফেলে আসে। সবকিছুই তাদের পরিকল্পনা মতো হয়েছিল। কিন্তু রুপার একটু ভুলের কারণেই এই খুনের রহস্য উদঘাটন হল। রুপার ভুলটা ছিল হোটেলে ঠিকানাটা ফেলে আসা। এই ঠিকানার জন্যেই ইকবাল সাহেব আসল খুনিকে খুঁজে বার করতে পেরেছেন। যদিও এতকিছু করার পর আসল খুনিকে ধরা গেল না। কিন্তু ইকবাল সাহেব তার গল্পের পট শেষ করতে পেরেছেন বলে, মনে সন্তুষ্টি নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা দিলেন।

প্রশ্ন ফাঁস

জাহিদ হাসান শুভ

রোল : ৩২৩৬৫, শ্রেণি: একাদশ

এস.এস.সি পরীক্ষা চলে এসেছে রিফাতের রুমে বসে সে।

"রিফাত, রিফাত"

কী আম্মু?

বসে বসে কি ঘোড়ার ঘাস কাটতেছ?

আমি পড়ছি আম্মু"

তুই যে বিদ্যাসাগর তা আমি জানি। গাধার মত না পড়ে তুমি প্রশ্ন খুঁজে দেখছ?

প্রশ্ন! কিসের প্রশ্ন?

কাল পরীক্ষা প্রশ্ন ইন্টারনেটে, ফেসবুকে তো পাওয়া যাচ্ছে। পাশের বাড়ির জিনির মা আমাকে এখন ফোন করে জানালেন। জিনি নাকি এই প্রশ্নে দুইবার পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছে।

আর তুই?

ছি: ছি: লজ্জায় আমার মাথা কাটা পড়ল; আমার প্রশ্ন লাগবে না মা। আমার প্রিপারেশন এমনিতেই ভাল।

ছাতার মাথার প্রিপারেশন, যাও প্রশ্ন খুজে বের করো। নিজের রুমে গিয়ে পিসি খুলল রিফাত।
সহজেই পাওয়া গেল প্রশ্ন। উত্তরসহ!
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রশ্নটা দেখা শুরু করল সে। খুব সহজেই পাস করে উঠল সে। কলেজের সব ছেলে মেয়েরা ঘুরে বেড়ায়। কম্পিউটারে গেমস খেলে, প্রেম হয় ফেইসবুকে ডেটিং চলে চ্যাটে।
প্রেম ভাঙে ফেইসবুকে,
পরীক্ষা নিয়ে কোনো টেনশন নেই।
কারণ পরীক্ষার আগে তো সহজেই উত্তরসহ প্রশ্ন পাওয়া যায়।
সেই খবর আবার ছাত্রদের আগে চলে আসে অভিভাবকদের কাছে। ছাত্রদের চেয়ে তারাই সবচেয়ে বেশি সিরিয়াস, প্রশ্ন পাওয়ার ক্ষেত্রে ‘ভাবী, আমার ছেলে তো কালকের প্রশ্ন নামিয়ে ফেলেছে। ওরা নামি রেজাল্ট নামিয়ে ফেলতে পারবে হা, হা, হা, । আর বলবেন সবার প্রশ্ন এইচ,এস,সি পরীক্ষা শেষ হলো! রেজাল্ট হলো বাম্পার ফলন।
সোনালি ফসল ঘরে ঘরে! গোল্ডেন সোনালি জিপিএ ফাইভে ভর্তি চারপাশে। অবশেষে সবাই গেলে ভার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষার প্রশ্ন?
সেটা পরীক্ষার ১ মাস আগেই পাবলিক হয়ে লাইন ধরে সবাই গেল ভাইবা দিতে।
ভাইবা দিয়ে বের হলো রিফাত। মা প্রশ্ন করল কেমন হলো বাবা?
আমি পারি নি আম্মু।
কী? পার নি মানে?
কী জিজ্ঞাসা করেছিল?
Tell me something about your self?
মা বলল এইটাই পার নি।
রিফাত বলল না আম্মু। প্রশ্নটা তো আগে পাই নি।

আশরাফুল আলম

রোল : ৩১২২৯, শ্রেণি : একাদশ

কোন এক দিন ১১ বছরের এক বালিকা তার বাবাকে বললো, বাবা! আমার ১৫তম জন্মদিনে আমাকে কি দিবে? বাবা বললেন, এখনো তো অনেক সময় আছে, দেখা যাক.....
মেয়েটির ১৫তম জন্মদিনের কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন সে অজ্ঞান হয়ে গেল.....
দ্রুত তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলো.....
ডাক্তার মেয়েটিকে পরীক্ষা করল.....
মেয়েটির বাবাকে ডাক্তার বললো, আপনার মেয়ের হার্টে একটি ছিদ্র ধরা পড়েছে.....
দ্রুত হার্ট পরিবর্তন না করলে তাকে হয়তো বাঁচানো যাবে না.....
যখন বাবা মেয়েকে দেখতো গেল,
মেয়ে : বাব! আমি কি মারা যাবো?
বাবা : না, তুমি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে।
মেয়ে : তুমি কিভাবে জানো? ডাক্তার বলেছে, আমার হার্ট বন্ধ হয়ে যাবে।
বাবা : আমি জানি না, তুমি অবশ্যই সুস্থ হয়ে যাবে।
মেয়েটি দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসার পর এক সময় সুস্থ হয়ে বাসায় আসলো ও তার বাবাকে খোঁজতে লাগলো। এর মধ্যেই তার বয়স ১৫ বছর হয়ে গেল.....
এর মধ্যেই তার মা তাকে খামে ভরা ও আটকানো একটি চিঠি দিল। সে অত্যন্ত কৌতুহল বসত চিঠিটি খুললো। চিঠিটি ছিল তার বাবার লিখা.....
“প্রিয় মা আমার। তুমি যখন এ চিঠিটি পড়ছো তার অর্থ হলো সব কিছুই ঠিক মতোই হয়েছে এবং তুমি সুস্থ আছো যেমনটি আমি বলেছিলাম.....
মনে আছে? একদিন তুমি প্রশ্ন করেছিলে, তোমার ১৫তম জন্মদিনে আমি তোমাকে কী উপহার দিবো। তখন আমি জানতাম না কী দিবো.....কিন্তু যখন তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে তখনই আমি বুঝলাম তোমাকে আমি কী দিতে পারি.....
তাই তোমার জন্যে আমার উপহার আমার “একমাত্র হার্ট”
আমি তোমাকে এর থেকে কম ভালবাসি না.....

‘বাবা-মাকে’ আমরা কখনো যেন
ভুলেও কোনো কষ্ট না দেই
কারণ, তারাই আমাদের ছোট বেলার
সব কষ্ট থেকে আগলে রেখেছিলেন।

আমাদের পড়াশোনার অবস্থা

রিতা ইসলাম

রোল : ৩০৪৭২, শ্রেণি : একাদশ

আজকালের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ খুব কমই রয়েছে। সবাই শুধু ভাল রেজাল্ট চায় কেউ নিজের মেধাকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞান অর্জন করতে চায় না। সবাই পাশকরা বিদ্যাকে প্রকৃত বিদ্যা মনে করে। তেমনই আমাদের কলেজের এক ছেলে জাকির। সারা বছর পড়াশোনার কাছে যায় না। পরীক্ষার সময় সাজেশনের পিছনে ঘুরে। সাজেশন ছাড়া তার পরীক্ষা দেয়াই হয় না। কাল তার কলেজে পরীক্ষা। আজ সে

সকাল ৮ টায় ঘুম থেকে উঠল। ভাবল, ফ্রেশ হয়ে, নাস্তা করে একটু পড়তে হবে। আর বেশি সময় নেই। সকাল ১০টা নাস্তা খাওয়ার পর বই নিয়ে সবল। সবই তার পরিচিত পড়। ধুর এগুলোর জন্য এত টাইম পাস করার কোনো মানে হয় না। দুপুরে ভাত খাওয়ার পর পড়ে নিলেই হবে এখন টিভি দেখি। দুপুরে ভাত খেয়ে একটু বই নিয়ে বসল। হঠাৎ মনে পড়ল এখন যদি না ঘুমাই তাহলে রাতে পড়তে পারব না। একটু ঘুমাই নিই। মাগরিবের নামাযের পর পড়তে বসব। সন্ধ্যা ৭টা বাজে তাই টেবিলে গিয়ে জাকির বই খুলল। কয়েক মিনিট চলে গেল। কি যে পড়ল তা সে নিজেই বুঝতে পারল না। মনে পড়ল সবই তো আগের পড়া। আর সাজেশনটা তো পেয়েই গেছে পরীক্ষার প্রশ্ন তার হাতে। তো এখন শুধু শুধু পড়ে লাভ কি। এখন পড়ে মাথা হেং করার কোন মানে হয় না। পরদিন সকাল ১০ টায় পরীক্ষা ঘুম থেকে উঠে জাকির সাজেশনের মতো সব তার মাথায় নিয়ে নিল। পরে রেডি হয়ে কলেজে পরীক্ষা দিতে গেল। জাকির তো মহাখুশি। সে সাজেশন পেয়েছে সব মুখস্থ করেছে এবার খাতায় লিখে তা জমা দিলেই বিরাট নাম্বার আর ভাল রেজাল্ট। পরীক্ষার প্রশ্নটা তার হাতে সব কমন পড়েছে। তার এখন শুধু লিখলেই হবে। লিখতে গেছে কোনটার উত্তর লিখবে? সবই তো গড়মিল হয়ে যাচ্ছে। কোনটার উত্তর কোনটা হবে? জাকির যে এমন পরীক্ষা দিবে তা কখনোই ভাবতে পারে নি। কোন রকমে টেনে টুনে পাশ করল। প্রিয় সহপাঠীরা জাকির এর মত তোমরা কখনোই এমন ভুল করো না। তাহলে জাকিরের মত তোমাদেরও একই অবস্থা হবে। কারণ "ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।"

LIVING AN AUTHOR

সাবিদ কামাল
রোল : ৩১০১৮, শ্রেণি : একাদশ

The dream that I see constantly every time & every day, while I am asleep & while I am awake.
The dream to succeed, the dream for being a good author. A little money but I need most is fame.
In the world now many people are writing & struggling for being a great author, maybe to become a legend.
Authors like us know that writing poetry & novel is a great passion. But the passion is not full of worth.
If others do not read it or like it. The answer of this passion is fame, the answer of your writing is having
Applauses for your piece of art. Maintaining the passion a hard task. Especially when your passion to create something new & dynamic. What about the fame? You haven't slept in days just to do something
New but it vanishes into the deep dirty water. How can we, us survive? We do survive, we have to.
Although it doesn't matter if they vanish form the earth. I have seen many talent ruining in front of my eye.
Of my eyes for want of money & fame. What happened to the dreams of that author? The answer is it's ruined with himself. People might say that he couldn't survive because he wasn't talented enough; It might be right. But he couldn't survive not because of his lack of talent but because people do not like his work. But I can't blame the people. We live, we survive, we create that is what authors do. But our dreams are to live joyfully, to survive easily & to give a shelter to our creation........

A Glass of Water

Toufiq Mahbub (Borshon)
Roll : BBA 296, Session : 2013-2014

Read this small story; Hope that makes a BIG Change in YOU

The Professor began his class by holding up a glass with some water in it. He held it up for all to see & asked the students ''How much do you think this glass weights?''

'50gms!...'100gms'...'125 gms'...the student

answered.

"I really don't know unless I weight it," said the professor, "but my question is; What would happen if I held it up like this for a few minutes?"...
'Nothing'.....the students said.

'Ok what would happen if I held it up like this for an hour?' the professor asked. 'Your arm would beging to ache' said one of the student

"You're right, now what would happen if held it for a day?"
" Your arm could go numb; you might have severe muscle stress & paralysis & have to go to hospital for sure!"
...Ventured another student & all the students laughed.

"Very good.
But during all this, did the weight of the glass change?" Asked the professor.
'No'... Was the answer.
"Then what caused the arm ache & the muscle stress?"

The students were puzzled.
"What should I do now to come out of pain?" asked professor again.
"Put the glass down!" said one of the students.
"Exactly" said the professor.
Life's problems are something like this.

Hold it for a few minutes in your head & they seem OK.
Think of them for a long time & the begin to ache.

Hold it even longer & they begin to paralyze you. You will not be able to do anything.

It's important to think of the challenges or problems in your life, But EVEN MORE IMPORTANT is to 'PUT THEM DOWN' at the end of every day before you go to sleep..

That way, you are not stressed, you wake up every day fresh & strong & can handle any issue, any challenge that comes your way!

Moral
So, when you start your day today, Remember friend to PUT THE GLASS DOWN TODAY!'

ভ্রমণ কাহিনী

মিশন তেঁতুলিয়া

আশফাক মাসুদ দিব্য
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ২৯৬৮৮

বন্ধুরা মিলে ঠিক করে ফেললাম ঢাকায় আর নয়, এবার ঢাকার বাইরের মাটির গন্ধ নেয়া যাক। কোনো এক কাক ডাকা ভোরে রওনা হলাম আমরা চৌদ্দজন ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনের উদ্দেশ্যে। সকাল ৮টার ট্রেন, রওনা দিতে বেজে গেল ৭:৩০। উদ্বিগ্ন মন নিয়ে উসাইন বোল্ট স্টাইলে পৌঁছে গেলাম স্টেশনে। যেয়ে দেখি ট্রেন নেই, সবাই মাথায় হাত। একি হল। পরক্ষণেই আবিষ্কার করলাম আমরা বাংলাদেশে অবস্থান করছি। ট্রেন তার বংশ পরম্পরা অনুযায়ী তিন ঘণ্টা লেট। আমাদের মন থেকে ভেসে উঠল, "ট্রেন তুমি যাওনি মোদের ছেড়ে, একা করে"। আমরা সেই সময় খেয়ে-দেয়ে, গান-বাজনায় মত্ত হয়ে উঠলাম। ট্রেনের আসার কথা ১১টায় এবং ঠিক সময়মত ১১:৪৫ এ এসে হাজির হল। আমরা ঢাকাকে বিদায় জানিয়ে উঠে পড়লাম ট্রেনে। ট্রেন ছাড়ল, শুরু হল চিন্তামুক্ত একটি সতেজ ভ্রমণ। বাংলাদেশের সৌন্দর্যের সাথে যেন কোনো কিছুর তুলনা হয় না। নদী, পাহাড়, সবুজ-শ্যামল, বিস্তৃত সোনালী মাঠ জুড়ে আমাদের বাংলা। হঠাৎ ট্রেনের পেট খারাপ হয়ে যাওয়ায় সিরাজগঞ্জে ট্রেন থেমে যায়। আমরাও ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমাদের পেটের গর্জন কমাতে। পেটকে শান্ত করার সাথে সাথে ট্রেন বাবাজি অশান্ত হয়ে চলা শুরু করল। রাতের দিকে ট্রেনের এক পাশে দেখতে পেলাম জোনাকির আলো এবং আরেক পাশে ঘন কালো অন্ধকার। ওহ! দুঃখিত। এ তো জেনাকির আলো নয়, বর্ডার গার্ডদের টর্চলাইটের আলো। শত শত টর্চলাইটের আলো মিলে মিশে কী সুন্দর দেখাচ্ছে। ট্রেনের এক পাশে ভারত এবং অন্য পাশে বাংলাদেশ। রাত ১২টায় পৌঁছালাম নীলফামারীর সৈয়দপুরে। সেখানে নেমে আবিষ্কৃত হল আমাদের সেই বিখ্যাত গান, "এসেছি বহুদূর, ঢাকা টু সৈয়দপুর।" নীলফামারী, নীলফামারী, নীলফামারী। " একে একে দিনাজপুরের রাজবাড়ি, রামসাগর, মাতাসাগর, ক্যাফেটেরিয়া, রবার ড্যাম সব যেন পরিচিত হয়ে উঠল। বাসের ছাদে, ভ্যান, ট্রাক্টর, নসিমন, টমটম কিছুই যেন বাদ ছিল না। অবশেষে তেতুঁলিয়ার বাংলাবান্ধা যেখানে বড় করে লেখা, "বাংলাদেশের সীমান্ত শেষ"- সেখানে আমাদের ভ্রমণও শেষ হল। অবশেষে ফিরে এলাম ইট-পাথরের খাঁচায়, সেই চিরচেনা ব্যস্ত জীবনে। তবে অক্সিজেন সাগরে হাবুডুবু খাওয়া সেই দিনগুলো, স্মৃতির পাতায় অমর হয়ে থাকবে।

তিস্তা ব্যারেজ ভ্রমণ

মোঃ রাঈসুল হাবীব
রোল : ২৯৭৮৫, শ্রেণি : দ্বাদশ

আমরা দশজন বন্ধু প্রায় একসাথেই ঘুরি। তো একদিন নাসিফ ভাই বলে উঠল যে, দোস্তরা চল পিকনিক খাই। নাসিফ এর প্রস্তাবে এক লাফে সবাই রাজি। তো এখন প্রশ্ন কোথায় পিকনিক খাব? অনেক চিন্তা শেষে ঠিক করলাম তিস্তা ব্যারেজ এ পিকনিক খাব। তো আমাদের তিস্তা ব্যারেজ এ যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো গাড়ি ঠিক করলাম না। আমরা একটু ভিন্ন ভাবেই পিকনিকে যাব ভাবলাম। পিকনিক এ খাওয়ার জন্য খিচুড়ি ও মুরগির গোস্ত মেনু ঠিক করলাম। পিকনিক এর দিন সকালে বাজার করে একেক বন্ধুর বাসায় একেক আইটেম তৈরির জন্য পাঠালাম। সকাল ১০.০০টায় আমরা সবাই একসাথে হয়ে রেলস্টেশনে গেলাম। সকাল ১০.৩০ এর ট্রেনে আমরা বড়খাতা এলাম তাও টিকিট না কেটে। টিটিকে পাম দিয়েই বড়খাতা পর্যন্ত চলে আসি। আমরা ট্রেন থেকে নেমে একটা ছোট হোটেল এ ঢুকে নাস্তা সারলাম। এবার একটা অটোরিক্সা ভাড়া করে তিস্তা ব্যারেজ পর্যন্ত এলাম। এসেই আমরা তিস্তা ব্যারেজ এর সম্পর্কে অনেকগুলো তথ্য শুনলাম যেমন :
তিস্তা ব্যারেজ হল তিস্তা নদীর উপর স্থাপিত একটি ব্রিজ। এটি সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ এর শাসন আমলে তৈরি হয়। এই ব্রিজটি ৫ আগস্ট, ১৯৯০ তারিখে যাতায়াতের জন্য খুলে দেয়া হয়। এই ব্রিজটির বিশেষত্ব হল এই ব্রিজ এ পানি নিয়ন্ত্রণ এর জন্য স্লুইস গেইট রয়েছে। এখানে ৪৪টি মূল স্লুইস গেইট আছে এবং ৪টি সাইড গেট রয়েছে। এই ৪টি সাইড গেইট দিয়ে ক্যানেল এর মধ্য দিয়ে বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুরে সেচ প্রকল্পে পানি দেয়া হয়। যদিও বগুড়াতেও এই পানি দেয়ার কথা ছিল কিন্তু তা হয় নি। এই ব্রিজটি নির্মাণের ৩টি উদ্দেশ্য আছে-১. যাতায়াত (পুল হিসেবে) ২. সেচ ব্যবস্থা ৩. বিদ্যুৎ উৎপাদন।
ভারতের সাথে পানি চুক্তি না হওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন উদ্দেশ্যটি এখনও বাস্তবায়ন হয় নি। এই ব্রিজ দিয়ে প্রতিদিন অনেক যানবাহন যাতায়াত করে। যাতায়াতের জন্য যানবাহনের আকার অনুযায়ী টোল আদায় করা হয়। এই ব্রিজটি প্রতিবছর পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে লিজ দেয়া হয়। এই ব্যারেজটি নীলফামারি জেলার অর্ন্তভুক্ত। এই ব্যারেজটির পাশে আছে স্লুইস গেইট কন্ট্রোল রুম (যেখানে একজনই ব্রিজ এর গেইটগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে), পুলিশ ফাঁড়ি, হেলিপ্যাড, পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিস এবং একটি ঠ.ও.চ রিসোর্ট আছে (যার নাম "অবসর")। তথ্যগুলো জানার পর আমরা ব্রিজটি ঘুরে দেখলাম। এরপর গাছের নিচে বসে আমাদের দুপুরের খাবার সেরে নিলাম। এরপর ৪টার দিকে আমরা একটি খালি ট্রাকে উঠে বাসায় ফিরে এলাম।

বান্দরবানের সেই ভ্রমণ

হাছিবুর রহমান (সুদিন)
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩১০৫৩

জীবনের কিছু ঘটনা মানুষ এর জীবনকে নাড়িয়ে দেয়। তেমনি একটি ভ্রমণ ঘটনা আমার জীবনকে নাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা ৪জন বন্ধু গিয়েছিলাম বান্দরবান ঘুরতে। নোয়াখালী থেকে বান্দরবান যেতে আমাদের ১২ঘণ্টা লাগল। বাস ভ্রমণ খুব মজা লাগছিল। যাই হোক, সেখানে আমরা একজন বড় ভাই এর বাসায় উঠলাম। তিনি সেখানে সরকারি চাকরি করেন। সেখানে তিনি পরিবার নিয়ে থাকেন। তিনি আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন। রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে সবাই গল্প করতে বসলাম। বান্দরবানকে নিয়ে অনেক গল্প করছিলাম সবাই মিলে। অনেক ভালো লাগছিল এত সুন্দর এলাকার গল্প শুনতে। অনেক দিনের ইচ্ছে এত সুন্দর এলাকা দেখার। কিন্তু বড় ভাই গল্পের মাঝখানে বলেছিলেন, পাহাড়ের খুব গভীরে যেন না যাই। কিন্তু আমরা বান্দরবানের বর্ণনা শুনে দেখার জন্য এতটাই উৎসাহিত হলাম যে, তার সতর্কমূলক কথাটা আমরা ভুলেই গেলাম। এরপর দিন সকালে নাস্তা করে পাহাড় ভ্রমণের উদ্দেশ্য রওয়ানা হলাম। তারপর পাহাড়ের ভিতরে গেলাম। পাহাড় দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। আর চারপাশের পরিবেশ এতটা সুন্দর লাগছিল যে আমরা প্রকৃতি প্রেমে পাগল হয়ে কোন সময় যে পাহাড়ের গভীরে চলে গেলাম তার আর খবর নেই। তারপর যা হল তা আমাকে এখনও শিহরিত করে। নিস্তব্ধ গহীন অরণ্যে হঠাৎ গুলির আওয়াজে আমরা বন্ধুরা খুব ভয় পেলাম এবং এলোমেলোভাবে যে যার মতো পালাতে লাগলাম।

হঠাৎ আমার খেয়াল হল আমি একা। আমার বন্ধুরা কে কোথায় তা আমি জানি না। আমার মনে হল তারা আর বেঁচে নেই। আমি তাদের পাগলের মতো খুঁজতে লাগলাম তখন আর গুলির আওয়াজে নেই। প্রায় ৩০মিনিট পর ২জনকে খুঁজে পেলাম। কিন্তু রাফাতের দেখা নেই। আমরা সবাই পাগলের মতো খুঁজতে লাগলাম। যা দেখলাম তাকে খুঁজতে গিয়ে তা আমার মনে চিরদিনের জন্য কালো দাগ একেঁ দিল। সে গুলিবদ্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। তাকে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের একটি হাসপাতালে নিলাম। ডাক্তার অপারেশন করল। এরপর সে ভালো হল। তারপর জানতে পারলাম পাহাড়ে জঙ্গিরা আমাদের উপর আক্রমণ করেছিল। আমরা দুইদিন পর চলে এলাম। আমাদের ভাগ্য যে আমরা চার বন্ধু সুদিন, রাফি, রিফাত, হাসান মরতে মরতে বেঁচে গেলাম। বুঝলাম যে, মানুষের জীবন কত মূল্যবান তার কাছে। এটা আমার জীবনের স্মরণীয় একটা ঘটনা।

চিটাগাং, কক্সবাজার ও সেইন্টমার্টিন ভ্রমণ

লিপি আক্তার
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ২৮২৮৩

আমি B.N.C.C ক্যাডেট। ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে প্রতি বছর B.N.C.C ক্যাডেটদের নিয়ে একটি শিক্ষা সফরের আয়োজন করে। তেমনি ২০১৪ সালেও করেছিল। ২০১৪ সালে B.N.C.C থেকে ৫দিন ব্যাপী একটি সফর এর আয়োজন করেছিল। Tour এর জায়গা ছিল কক্সবাজার, সেইন্ট মার্টিন ও বাংলাদেশ ন্যাভাল একাডেমি, চিটাগাং (BNA)

আমিও এই সফরে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সে কি মজা....। ভ্রমণের প্রথম দিন আমরা রাতের খাবার খেয়ে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। ২য় দিন সকালে কক্সবাজার গিয়ে পৌঁছাই এবং নাস্তা করি। এর পরপরই আমরা আমাদের ভাড়া করা Hotel এ গিয়ে Dress Change করে সমুদ্র সৈকতের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়ি। আমরা দীর্ঘ সময় সমুদ্র সৈকতে থাকি, ছবি তুলি আরও কত কী! এরপর দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আবার সৈকতে। আমরা স্পিড বোটে করে সাগরের মাঝে যাই। অনেক ঘোরাঘুরি করি।

রাত হলে হোটেলে ফিরে আসি। রাতে আমরা সবাই মিলে Teacher দের সাথে Market এ যাই এবং কেনাকাটা করি। খাওয়া শেষ করি এবং হোটেলে ফিরে আসি। আমি সহ আমাদের রুমে আমরা ৪জন Friend ছিলাম। রাতে তো আমাদের ঘুম হলই না বরং আমরা ৪জন মিলে নাচলাম, গান গাইলাম আরও কত কী? পরদিন সকালে আমরা ঘুম থেকে উঠে সমুদ্র-সৈকতে বেড়াই এবং বিকেলে হিমছড়ি পাহাড় দেখতে যাই। কক্সবাজারের সবকিছুই আকর্ষণীয় তার মধ্যে অন্যতম হিমছড়ি পাহাড়। আমরা হিমছড়ি পাহাড়ের উপরে উঠি, কিন্তু স্যার আমাদেরকে পাহাড়ে উঠতে এবং ঝরনায় ভিজতে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু আমরা তার কথা রাখতে পারি নি। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে স্যারকে না বলে পাহাড়ে উঠেছিলাম এবং ঝরনায় ভিজে ছিলাম। অবশ্য কোনো সমস্যা হয় নি।

আমার জীবনে প্রথম তখন পাহাড়ে উঠেছি এবং বাস্তবে ঝর্ণা দেখেছি, ঝরনার পানি পান করেছি। এগুলো করতে পেরে অনেক খুশি হয়েছিলাম এবং মনে হচ্ছিল জীবনে নতুন কিছু পেয়েছি। নতুন কিছু দেখেছি। নতুন কিছুর মুখোমুখি হয়েছি। রাতে হোটেলে ফিরলাম এবং পরের দিন অর্থাৎ ভ্রমণের চতুর্থ দিন আমরা সবাই খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করি এবং সেইন্ট মার্টিনের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়ি। সেইন্ট মার্টিন যেহেতু একটা দ্বীপ সাগরের মাঝে সেখানে অবশ্যই বড় বড় জাহাজে করে যেতে হয়। আমার জীবনে প্রথম এত বড় জাহাজ দেখেছিলাম এবং জাহাজে করে সাগরের মধ্যে গিয়েছিলাম। সাধারণত নাফ নদী দিয়ে সেন্টমার্টিন

যেতে হয়। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের বিভক্তকারী নদীটি হল নাফ নদী। আমরা নদীতে অবস্থানকালে নদীর পাশে অবস্থিত বাংলাদেশের বড় বড় পাহাড় এবং মিয়ানমারের বর্ডার দেখেছিলাম। এক সময়ে আমরা আমাদের গন্তব্য সেইন্ট মার্টিনে পৌছলাম। তখন দুপুর তাই আমরা লাঞ্চ করে আমাদের হোটেলে গেলাম এবং এরপরই সবাই সাগরের পাশে ফুটবল খেললাম এবং সাগরের পাশে হাঁটলাম। সন্ধ্যা হলে হোটেলে এলাম এবং বারবিকিউ পার্টির জন্য তৈরি হলাম। আমাদের হোটেলটা ছিল সাগরের পাশে তাই আমরা রাতে সাগরের দৃশ্য দেখতে পেলাম, পানির টুপটুপ শব্দ শুনতে পেলাম। আর রাতটি ছিল চাঁদনী রাত অসাধারণ এক মুহূর্ত রাত ১০টার দিকে পার্টির আয়োজন শুরু হতে লাগল। আমরা এরই মাঝে রাতের খাবার খেলাম। এরপর পার্টির জন্য সবাই হোটেলের বাইরে ছাউনি দেয়া একটা ঘরের মতো জায়াগায় অবস্থান করলাম। পার্টিতে নাচ, গান এবং হৈ-হল্লা করতে করতে রাত ১টা বেজে গেল। আমাদের সবার ইচ্ছা ছিল সারা রাত মজা করব। কিন্তু বিদ্যুৎ না থাকার কারণে তা সম্ভব হল না। অবশেষে আমরা খাওয়া শেষ করলাম এবং ২টার দিকে ঘুমালাম।

পরের দিন উঠে আমরা নাস্তা করে দ্বীপ সেইন্ট মার্টিন সাগরের পাশ দিয়ে ঘুরলাম এবং কেনাকাটা করলাম। দুপুরের খাবার খেয়ে চিটাগাং এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। রাত ১১টায় আমাদের গন্তব্যে পৌঁছলাম হোটেলে গেলাম এবং ডিনার করলাম। পরের দিন ঘুম থেকে ওঠে BNA এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম, BNA দেখলাম। প্রজাপতি পার্ক দেখলাম এবং বিকালে বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পরের দিন সকাল ৬টায় কমার্স কলেজে এসে নামলাম এবং বাসায় আসলাম। আমার জীবনে স্কুল জীবন থেকে অনেক সফরে গিয়েছি, অনেক জায়গায় ঘুরেছি কিন্তু কমার্স কলেজের B.N.C.C-র পক্ষ থেকে আয়োজিত সফরটি সত্যিই অসাধারণ। এ রকম এক অসাধারণ সফর উপহার দেয়ার জন্য B.N.C.C কর্তৃপক্ষকে অশেষ ধন্যবাদ।

ভ্রমণ

রাইমা চাক্মা

শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩০২৮১, সকশন- P_1

শব্দটির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। যখন ভ্রমণের কথা শুনি মনটা খুব ভালো লাগে। আমি রাঙ্গামাটির মেয়ে "রাইমা চাকমা" ছোটবেলা থেকেই রাঙ্গামাটিতে বড় হয়েছি। পাহাড়ে উঠা, নদীতে সাঁতার এসব ভালো লাগে। এখন আপনাদের সবার কাছে আমার জীবনের প্রথম ভ্রমণের কাহিনী বলছি। ২০১০ সাল। আমি তখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। অক্টোবর মাস, তখন দুর্গাপুজা ও ঈদ-উল আযহার ছুটি ছিল। তখন সব বন্ধুরা মিলে ঠিক করলাম যে পাহাড়ে উঠবো। ঠিক হলো তাই, ঠিক করা হল রাঙ্গামাটির সবচেয়ে উচুঁ পাহাড় "ফুরোমোন" -এ উঠার কথা। ফুরোমোনে আমাদের সব বন্ধুদের এক সাথে উঠার মজা ছিল অনেক। এখানে আমাদের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য বিহার আছে। সবাই অনেক কষ্টে পাহাড়ে উঠলাম। উঠতে একটু কষ্ট হলেও উঠার পর অনেক ভালো লাগল। মনে হচ্ছিল যেন আমি এখন আকাশে। অনেক বাতাস, গাছগাছালি এসবে পরিবেশটা অনেক সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর লাগছিল। ফিরে যেতে মন চাইছিল না। সবচেয়ে ভালো লাগছিল তখন যখন আমরা বৌদ্ধবিহারে ছিলাম। প্রার্থনা ও দান ধর্ম করার আশা পূর্ণ হয়েছিল। সেদিন যে পাহাড়ে উঠেছিলাম তার অভিজ্ঞতাই আলাদা, প্রথম পাহাড়ে উঠে অনেক ভালো লেগেছিল। তার পর থেকে আরও অনেকবার পাহাড়ে উঠেছি। পাহাড়ের ঝরনায় নাওয়ানা। পাহাড়ে উঠা চাষাবাদ দেখা এগুলো আমাদের পাহাড়িদের নিত্য কাজ। অবসর পেলেই পাহাড়ি এলাকায় যাই। অনেক আনন্দ লাগে। জানি না আপনাদের কেমন লাগবে আমার প্রথম পাহাড়ে উঠার কাহিনী। কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতা জানাতে পেরে অনেক খুশি হলাম।

সদরঘাট টু মামার বাড়ি

বিল্লাল হোসেন

শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ২৯০২০

সকশন- বি-২

বিষয়: ভ্রমণ কাহিনী

নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ, রাজধানী ঢাকা আর বুড়িগঙ্গার সম্পর্ক তো একই সুতোয় গাঁথা। শত বছর ধরে হাজারো সওদাগরি নৌকা পাল তুলে এসেছে এই বুড়িগঙ্গায় আর তিলে তিলে ঢাকা হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধশালী। আমি থাকি ঢাকার মিরপুরে যা বুড়িগঙ্গার তীর থেকে বহু দূর। ছুটিতে মামার বাড়ি যেতাম বছরে দুই একবার। নদীপথেই যেতে হতো মামার বাড়ি। সদরঘাট থেকে প্রতিদিন ছোট, বড় ও মাঝাড়ি ধরনের লঞ্চ ছাড়তো দুই বার সকালে ও রাতে। গন্তব্যে পৌঁছতে আমাদের সময় লাগতো ৬/৭ ঘণ্টা। ভোর ৭টায় ছিল প্রথম লঞ্চ আর রাতে যেত তিনটি লঞ্চ, তাও ৯/১০টায়।

বোঝা নিয়ে নিঃশব্দে যাচ্ছে কুলি আর অন্যদিকে ছোট বড় পণ্য বিক্রেতার সরব উপস্থিতি। রাস্তার পাশের হোটেলগুলোতে ভাজা হচ্ছে সকালের নাস্তা। পরোটা আর ডিম পাশেই গরম কেতলিতে ফুটছে চা। মূল ফটকে ইজারাদার তার পয়সা বুঝে পেলেই খুলে দিত ঘাটের প্রবেশ পথ। বরিশাল আর ভোলা রুটের সুবিশাল লঞ্চ এর পাশে আমাদের মাঝাড়ি লঞ্চগুলো বেমানান। কিছু নাম এখনও মনে পরে এম.ভি যুবরাজ, এম. ভি রাজহংস, এম.ভি মিতালি, এম.ভি লামিয়া, এম.ভি কাজল। এম.ভি মানে আসলে কী তা কখনো জানা হয় নি।

সময়মত সারেং তার লঞ্চ নিয়ে সদরঘাট থেকে বিদায় নিত।

বুড়িগঙ্গা নদী ধরে আর আমরা এগিয়ে যেতাম ফতুল্লার দিকে। ঢাকার স্কাইলাইন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেত দিগন্তে। বুড়িগঙ্গার দুই পাশে আছে শত শত ছোট-বড় শিল্পকারখানা। ফতুল্লা ছিল লঞ্চের প্রথম ঘাট অন্যান্য যাত্রীর সাথে ঝালমুড়িওয়ালা, ছোলাবুটওয়ালা আর কলম বিক্রেতাও ইত্যাদি উঠে আসতো লঞ্চে। বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে আমাদের লঞ্চ গিয়ে পড়লো শীতলক্ষ্যা আর ধলেশ্বরীর মোহনায়। তিন নদীর মোহনার উত্তাল ঢেউয়ের দুলানিতে বারান্দায় দাঁড়াতে সাহস পেতাম না। শক্ত হয়ে বসে থাকতাম কেবিনের ভিতরে। তার কিছুক্ষণ পর শুনলাম আমাদের লঞ্চ চলে আসলো চাঁদপুরে। চাঁদপুর থেকে প্রায় এক অথবা দুই ঘণ্টা লাগবে আমার মামার বাড়িতে যেতে। ঐখানকার নামগুলো ছিল অনেকটা অদ্ভুত টাইপের হরিনাথপুর, কালিকাপুর, হাবিপুর, বদরপুর, মহিষখোলা, টুমচর, মোলবিরহাট, গুয়াবাড়িয়া এই সব প্রতিটি নামের হয়ত ছিল কোনোও মজার ইতিহাস। লঞ্চে বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখা যায় গ্রাম বাংলার আবহমান জীবন। যা সকালের লঞ্চে না গেলে বুঝা যায় না। ষড়ঋতুর বাংলাদেশের গ্রামের প্রকৃতিও বদলে যাওয়া ঋতুভেদে। ডেকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কখনো দেখতাম বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত আবার কখনো বা সর্ষের হলুদ রঙ্গে মেতেছে দিগন্ত। শাপলা ফুলের লাল-সাদা রঙ্গে ঢেকে থাকা বিস্তীর্ণ জলাভূমি। নদীর তীরে জমে থাকা কচুরি পানার ওপর দিয়ে কী স্বাচ্ছন্দ্যেই না লম্বা দুই পায়ে হেটে বেড়ায় ডাহুক।

আমাদের গন্তব্যের স্থান ছিল শৌলা লঞ্চঘাট, ঐখানেই মামার বাড়ি। শৌলার এই পাড়ের সুবোধ বালক হয় তো উড়িয়েছে তার লাল ঘুড়ি, অপর পাড়ের দুষ্ট বালক তার মাঞ্জা দেয়া সুতোয় উড়িয়েছে সাদা ঘুড়ি কাটাকুটি খেলবে বলে। নদীর পাড়ের বাঁশবাগানে আটকে আছে অতীতের কেটে যাওয়া ঘুড়ি আর সুতো। লঞ্চের ডেকে দাঁড়িয়ে শহুরে বালক আমি ঈর্ষায় জ্বলতাম ওদের অবাধ স্বাধীনতায়। খোয়া ঘাটে দলবেঁধে নদী পার হতো ইউনিফর্ম পড়া স্কুল ছাত্র ও ছাত্রিরা। হাতেই তাদের সব বইপত্র। স্কুলের ব্যাগ সবার নেই।

শেষ ঘাটের আগের ঘাটেই নেমে যেতাম আমরা। তারপর মামার বাড়ি পর্যন্ত তো শুধুই পায়ে হাটা গ্রাম্য পথ।

ভ্রমণের মজা

মোঃ সোহানুর রহমান সোহান

রোল : ২৯৬৮২, শ্রেণি : দ্বাদশ

বাসে যাতায়াত একটা দৈনন্দিন বিষয় হলেও তা যদি হয় দূরের পথ, তবে তার মধ্যে একটা অন্য রকম ভ্রমণের আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে এ আনন্দটাই উপলব্ধি করেছিলাম।

গত রোজার ঈদের পরে আমার এক বন্ধুর সাথে জামালপুরে খুব জরুরি বিষয় নিয়ে দেখা করার দরকার ছিল। তাই আমি একটা নির্দিষ্ট দিন ঠিক করলাম। রওয়ানা হওয়ার আগের দিনই আমি ফোনের মাধ্যমে সায়েদাবাদের একটা বাসের টিকিট কাটলাম যেটা জামালপুর যাবে। আমি জানালার পাশের একটা সিট পছন্দ করেছিলাম। পরদিন সকালে তড়িঘড়ি করে সকাল ৭টায় সায়েদাবাদ বাস টারমিনালে পৌছালাম। খুব সকাল হলেও এখানে মানুষের প্রচণ্ড ভিড়। আমি আমার যাত্রার বাসটা খুঁজে পেলাম। বাসে উঠে আমি নির্দিষ্ট সিটে গিয়ে বসলাম। ঠিক সাড়ে সাতটায় বাস ছাড়ল।

আমার মনে উৎসাহের ঘনঘটা। অনেক অপরিচিতি জায়গাই তো রয়েছে। আমি ঠিক করলাম জামালপুর যাওয়ার পথে যতগুলো অপিরিচিত স্থান পড়বে তা সম্পর্কে জানব। আমাদের বাস মহাখালি এলাকা পার হতেই লাগলো ত্রিশ মিনিট। বাস খুব দ্রুত চলছে। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি। কিছুক্ষণ পর আমাদের বাসটি বিমানবন্দর অতিক্রম করল। চেনা-অচেনা অনেক জায়গা দেখতে লাগলাম। আমি রাস্তায় এবং বিভিন্ন স্থানে লাগানো সাইনবোর্ডে জায়গার নাম দেখতে দেখতে মাঝেমধ্যেই নিস্তেজ বোধ করছিলাম।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পর আমাদের বাসটি গাজিপুর এলাকায় প্রবেশ করে। এটা স্বপ্নের মতো ছিল। দুপাশে বিভিন্ন ধরনের গাছ যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। বাসটি গাজিপুর ন্যাশনাল পার্কের ধার দিয়ে যাচ্ছিল। এ জায়গায় আমি আগে কখনো আসি নি। আমি যখন এ জায়গা সম্পর্কে জানলাম আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলাম। আমি একনজরে কিছু পরিত্যক্ত জলাভূমি দেখতে পেলাম। কিছু বিল, হাওড়, পুকুর এবং দিঘি দেখলাম। লোকজন মাছ ধরছিল। যখন সাড়ে এগারোটা বাজে তখন আমাদের বাস ময়মনসিংহে। এটা পুরাতন একটা শহর। আমাদের বাসটা কিছু সময়ের জন্য ময়মনসিংহ বাস টারমিনালে থামল। আমি জলদি বাস থেকে নেমে দোকান থেকে কিছু বিস্কুট আর এক বোতল ঠাণ্ডা পানি কিনে আবার বাসে উঠলাম। খুব খিদে পেয়েছিল। আমি জানালা দিয়ে চারপাশে তাকাচ্ছিলাম। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের বাস একটা সরু রাস্তায় প্রবেশ করল। খুবই বাজে রাস্তা। আমাদের বাস খুব আস্তে চলা সত্ত্বেও একবার এদিক দুলছে, আরেকবার ওদিক। রাস্তাটা পেরিয়েই বাস খুব দ্রুত চলতে লাগল।

বিকেল ৪টায় বাস জামালপুর বাস টারমিনালে পৌছাল। হকাররা সেখানে ভিড় করছিল। রিক্সা ছিল অনেক। আমি একটা রিক্সা নিয়ে সোজা চলে গেলাম আমার বন্ধুর কাছে।

এ ভ্রমণটা ছিল খুবই আনন্দদায়ক। আমি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য দেখে মগ্ধ হয়েছি। এটা চিরদিন আমার স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকবে।

কবিতা

নাম	লেখক
কোথায় স্বাধীনতা?	ফাতেমা আক্তার
একটাই তুমি বাংলা আমার	সুমাইয়া ইয়াসমিন দিপা
খাটছে তারা	পূজা বিশ্বাস
অবুঝ	উপল চৌধুরী
একটি পাখি	রকিবুল ইসলাম
নতুন পিরামিড	আব্দুল কাদের সৌরভ
ইচ্ছা	মাহমুদুল হাসান নাবিল
মাতৃ-বন্দনা	নাজমুল হুদা
তুমি আর কে	জান্নাতুল মুনিরা
হিসাববিজ্ঞান	রাসেল
কোথাও ফেরার নেই	কার্নিজ পারভীন অর্থি
বালক ও ঘুড়ি	আলিম দেওয়ান
গল্পবুড়ি	মাহামুদুল হাসান (নাবিল)
ঘুড়ি	আলিম দেওয়ান
Star জলসা আর Z বাংলা	রিতা ইসলাম
রাজধানীর জ্যাম	মাহামুদুল হাসান (নাবিল)
বড়লোক, ছোটলোক	মোঃ সোহাগ ভূইয়া
রাজ পথের স্মৃতি	শবনম শারমীন (স্বর্ণালী)
ঋণ	পূজা বিশ্বাস
অপেক্ষা	ইয়াকুব আলী-শাকিল
পরিবার	পার্থ মজুমদার
মশা	খাদিজা
সিগারেটসেবীদের...	আফরা ফারহানা
কন্যা আমি	শাহনাজ আক্তার
বৃদ্ধা শ্রমকে না বলুন	শ্রাবন্তী দেবনাথ
ঢাকা	মোঃ রাসেল
আবেগ	মোঃ সোহানুর রহমান সোহান
উপদেশ	মোঃ সানিয়াল আহমেদ
খুকুমনির বিয়ে	সুমী আক্তার
ছাত্র	মির্জা আকিবুজ্জামান
স্বাধীন বাংলা	এম. আব্দুল্লাহ আল মামুন
ভাষার কথা	
মা	রুবিনা সুলতানা মিম
How is it	Alim Dewan
A SHAKESPEARE'S TALE	Sabid Kamal
	Saif A. Sunjani
Best Friend Forever	Mahamudul Hassan Nabil

কোথায় স্বাধীনতা?

ফাতেমা আক্তার

রোল : ২৭৮৪০, শ্রেণি : দ্বাদশ

রক্তের মেলা মৃতের মেলা
মুক্ত নদীতে ভাসে ভেলা
পথে পথে মানুষ কাঁদে
কোথায় স্বাধীনতা কোথায় স্বাধীনতা?

উর্দু ভাষা, ফারসি ভাষা
বাংলা আমার মাতৃভাষা
পথে পথে মানুষ কাঁদে
কোথায় স্বাধীনতা কোথায় স্বাধীনতা?

অপরাধীরা পায় না সাজা
ঘুষ খেয়ে হয়ে যায় রাজা
পথে পথে মানুষ কাঁদে
কোথায় স্বাধীনতা কোথায় স্বাধীনতা?

একটাই তুমি বাংলা আমার

সুমাইয়া ইয়াসমিন দিপা

রোল: ২৭৬২৫, দ্বাদশ

একটাই তুমি বাংলা আমার, একটাই
তুমি নাম
তোমার মধ্যে লিখেছি আমার,
জীবন-মরণ প্রাণ;
ভালোবাসি ওরে বাংলা আমার,
ভালোবাসি ও'রে মা
ভালোবাসি তোমার অঙ্গে ভরা সকল
উপমা।

তোমার এমন ঐশ্বর্য আর তোমার এমন
রূপ
দেখেছি আমার দুচোখ ভরে, যতটুকু
মিলে সুখ;
ওমা জন্ম আমার এই মাটিতে, মরণও
এখানে চাই
তোমার মতো এমন মাটি আর যে
কোথাও নাই।

তোমায় নিয়ে যত স্বপ্ন আমার, তোমার
মধ্যেই সুখ
তাই তোমার মধ্যে রাখব, আমি আমার
চিরসুখ;
তোমায় নিয়ে যত আশা আমার, তোমায়
নিয়ে গর্ব
তোমার জন্য ত্যাগ করতে পারি, আমি
আমার সর্ব।।

খাটছে তারা

পূজা বিশ্বাস

রোল: ২৮১৭৪, দ্বাদশ

যার হাতে বই থাকবে
থাকবে কলম-খাতা,
সে কুঁড়ায় ছিন্ন কাগজ
আর ঝরা পাতা!
ভবিষ্যতে বড় হয়ে
দেশ গড়বে যে
পেটের দায়ে রিক্সা চালক
হচ্ছে কেন সে?
কেউবা শ্রমিক কেউ বা কুলি
খাটছে তারা খাটছে
তাদের পাশে কতই মানুষ
উদাসভাবে হাঁটছে।

অবুঝ

উপল চৌধুরী

রোল: ২৯৪০৮, দ্বাদশ

আমি আর একটুও বড় হতে চাই না,
বড় হলেই ঢের ঝামেলা
স্বপ্ন দেখতে ভীষণ মানা
কঠিন কঠিন সব বাস্তবতা।

একদিন আমি ছোট ছিলাম
বাবার হাত ধরে স্কুলে যেতাম
টিফিনের সময় বার্গার খেতাম
ড্রইং খাতায় রঙবেরঙের ছবি আঁকতাম,
খেলার মাঠে ধুলোর মধ্যে ছুটোছুটি
গঙ্গাফড়িং এর জীবন ছিল।

এখন আমি ভালোই বড়,
অলি-গলি পথ-ঘাট সব বন্ধু আমার,
টিফিনের সময় বার্গার খাই না,
তবে, নিকোটিন শলাকা চলছে ভীষণ
বন্ধু, আড্ডা, গিটার, গানে
পাখির ডানায় উড়ে যাচ্ছে সময় এখন।

আর একটু বড় হলেই
নয়টা-পাঁচটার জীবন হবে,
মাসের শেষে গলা টিপে
সুইসাইড করতে ইচ্ছে হবে,
বন্ধু, আড্ডা, গিটার, গান সব মহাশূন্যে
মিলিয়ে যাবে,
উফ্! ভাবা যায় এসব!

হে ঈশ্বর, আমি আরও কয়েকশ বছর
বাঁচতে চাই,
স্বাধীন ভাবে পৃথিবীর পথে হাঁটতে চাই,
যেমন আছি তেমনই থাকতে চাই
বড় হতে চাই না, আর একটুও না।

একটি পাখি

রকিবুল ইসলাম

রোল: ৩২৩২৬, একাদশ

একটি পাখি হাসতে জানে
একটি পাখি ভালো,
একটি পাখি বেজায় খুশি
মুখ ভরা তার আলো।
একটি পাখি ভীষণ দুঃখী
একটি পাখি কানা,
একটি পাখি শুধুই কাঁদে
ভাঙা যে তার ডানা।
একটি পাখি হাসি খুশি
কখনো বা দুঃখী,
দুঃখের মাঝে সুখ আছে যার
সেই যে বড় সুখী।

নতুন পিরামিড

আব্দুল কাদের সৌরভ

রোল: ২৯৬১৬, একাদশ

ফিলিস্তিনের আকাশে চাঁদ ওঠে
হেলমেট মাথায় দিয়ে
বর্মবুকে ওঠে সূর্য
তারারা নিঃশব্দে কাঁপে ভয়ার্ত শিশির
ধোঁয়া ভারী নীল মেঘ চড়ে বেড়ায়
উঠোনে-উঠোনে
রক্তের নদী মরে পড়ে থাকে বিছানায়
মাথার ওপর কাকেরা চেঁচায়
চিলের চিৎকারে ছিঁড়ে যায় দিগন্ত
বোমারু ঈগল আগুনের ডিম দেয় শূন্যে
কোথাও কোনো আর্তনাদ নেই
ধ্বংস আর হত্যা স্বাভাবিক করে দিয়েছে
নিয়ম
বরফ আর আগুনের স্বাদ শিশু-বৃদ্ধের
এক
ভয়ার্ত আর লেলিহান শিখা করে রেখেছে
স্মৃতিস্তম্ভ
মানুষের মাথায় খুলির পিরামিড
সম্পূর্ণ নতুন
তাকে এখনো পাহাড়া দেয় স্ফিংস

ইচ্ছা

মাহমুদুল হাসান নাবিল

রোল: ৩২২২৬, একাদশ

ইচ্ছে করে পৃথিবী ছেড়ে
তারার দেশে যাব।
কেমন করে তারা ওঠে
অনেক খবর পাব।

সেই খবরটা জানার পরে
অনেক মজা হবে।
কাছের যত বন্ধু আছে
আমায় ঘিরে রবে।
সবার মাঝে বসে বসে
জানাবো সব কথা।
দেশের সব মিডিয়াগুলো
প্রচার করবে যথা।

মাতৃ-বন্দনা

নাজমুল হুদা

রোল: ৩২৫৯৮, একাদশ

মাগো তুমি এই পৃথিবীর
সবার চেয়ে ভালো
তুমি আছ বলেই মাগো
অন্ধকারেও আলো।
জনম নিয়ে প্রথম যে দিন
দেখি তোমার মুখ
অহংকারে পূর্ণ হলো
আমার ছোট্ট বুক।
তুমি বড় মায়াবিনী
জনম থেকেই জানি
তাই তো আমার হৃদয় জুড়ে
তোমার বদনখানি।

তুমি আর কে

জান্নাতুল মুনিরা

রোল: ৩০৫৫৬, একাদশ

তুমি শুকনো পাতার পুরনো পাঁচিল
বেহুলার ভেলা,
তুমি ফুটপাত, উড়াল সেতু, রথের
মেলা।
তুমি ডানা ভাঙা পাখির ভেজা-ভেজা
চোখ, মিটিমিটি তারা,
তুমি উড়ে যাওয়া প্লেন, গাঢ় কালো
মেঘ, খুব দিশেহারা।
তুমি জানালার গ্রিল, বৃষ্টির দিন, ভুলে
যাওয়া ছাতা,
তুমি পিচ্ছিল পথ, ঘুম ঘুম চোখ,
কবিতার খাতা।
তুমি বন্ধ ঘড়ি, চশমার কাঁচ, জীবনের
মানে,
তুমি থেমে থাকা ট্রেন, পালাবার মন, খুব
অভিমানে।

হিসাববিজ্ঞান

রাসেল

রোল: ৩০৯৯৫, একাদশ

আয়ের নাকি স্বভাব ক্রেডিট,
বাড়লে ক্রেডিট তাই।
আয় কমলে কষ্ট হলেও
ডেবিট করা চাই।
ব্যয় বা ক্ষতি ডেবিট ঘরের বাড়লে
ডেবিট তাই।
ব্যয়ের হ্রাসে, মুচকি হেসে
ক্রেডিট করা চাই।
সম্পত্তির ন্যাচার ডেবিট
আসলে ডেবিট তাই।
শখের এ ধন ঘর ছাড়লে
ক্রেডিট করা চাই।
দায় বা দেনা ক্রেডিট জাতের
বাড়লে ক্রেডিট তাই।
এমন আপদ বিদায় নিলে
ডেবিট করা চাই।
ক্লাসে এসে, স্যারে হেসে
বলল কেটে ছড়া।
খুব সহজেই হয়ে গেল।
হিসাবের মূল পড়া।

কোথাও ফেরার নেই

কার্নিজ পারভীন অর্থি

রোল: ৩০৩৭০

তুমি হঠাৎ আসবে ভেবে জেগে আছি
রাতকে ঘুমাতে দেইনি নির্জন একা
এতো ঝরা পাতার শব্দেও বুঝলে না
অভিমান
কোথাও ফেরার নেই আর কেবল
তোমাকে ছাড়া।
প্রবল ঈর্ষার মেঘ জানালায় ভাঙা অন্ধ
চাঁদ
ছোট ছোট বাড়ির সুতোয় বাধা গ্রাম,
ছেঁড়া পথ অজস্র নগ্ন পা অচল মুদ্রার
মতো ফিরে আসে
এক হাত থেকে অন্য হাতে।
হোঁচট খাওয়া দরিদ্র পথে;
দূরে ঝোপঝাড়ে জোনাকির মতো
রাত ভর জলে আর নেভে
বেদনার বিষণ্ন প্রদীপ।
অসুখী ছায়ার ভিড়ে
কোনো নিবিড় উৎসব নেই
তবু অন্য সব মানুষের মতো
আকাশের রেলিং -এ ঝুলে থাকা চাঁদ
দেখি,
খুব ক্ষীণ চাঁদ, ভাঙা চাঁদ
কোথাও ফেরার নেই।

বালক ও ঘুড়ি

আলিম দেওয়ান

রোল: ৩১৭৮৩, একাদশ

ছোট্ট বালক উড়ায় ঘুড়ি
নাটাই হাতে নিয়ে,
বইছে হাওয়া দেখছে বালক
আকাশ পানে চেয়ে।

উড়ছে ঘুড়ি, ঘুরছে নাটাই
বাতাস বইছে জোরে,
ছুটছে বালক সবুজ মাঠে
আকাশে ঘুড়ি উড়ে।

একটু করে দিচ্ছে যে টান
একটু দিচ্ছে ছেড়ে
কাগজের ঘুড়ি উড়ছে আকাশে
মাটিতে আসবে ফিরে।

গল্পবুড়ি

মাহামুদুল হাসান (নাবিল)

রোল : ৩২২২৬, শ্রেণি : একাদশ

গল্প-বুড়ি ফোকলা দাঁতে
গল্প বলেন, দিনে রাতে
গল্পের ছলে রাগি সাজে
কণ্ঠে বুড়ির বীণা বাজে।

নাতি-নাতনী পঙ্গপাল
গল্প শুনতে মারে ফাল
গল্পবুড়ির নেই জুড়ি
বয়স বুড়ির চার কুড়ি।
বুড়ির আছে সন্ধ্যাবাত
হাঁক ছাড়েন রাত-বিরাত
গলায় বুড়ির শক্ত জোর
ভয়ে পালাল সিঁধেল চোর।

খুঁজবে নাবিল বুড়ির বাড়ি
গাঁয়ে যাবে শহর ছাড়ি।

ঘুড়ি

আলিম দেওয়ান

রোল : ৩১৭৮৩, শ্রেণি : একাদশ

আকাশ পানে উড়ছে দেখ
রং বেরং এর ঘুড়ি
মাঝে মাঝে ইচ্ছে জাগে
তাদের সাথে উড়ি।

পাখা মেলে নীল আকাশে
ভাসিয়ে দেব ভেলা
রং বেরং এর ঘুড়ির সাথে
করবো মোরা খেলা।

ছেলের হাতে থাকবে নাটাই
হব মোরা ঘুড়ি
একটু বাতাস বইলে আকাশে
খেলব উড়াউড়ি।

Star জলসা আর Z বাংলা

রিতা ইসলাম

রোল: ৩০৪৭২, একাদশ

স্টার জলসা আর জি বাংলা,
নষ্ট করল সারা বাংলা।
সিরিয়াল বোঝে না সে বোঝে না,
ভাল মন্দ কেউ খুঁজে না।
সিরিয়াল জলনূপুর,
ঝগড়া চলে সারা দিন রাত দুপুর।
সিরিয়াল তোমায় আমায় মিলে,
শাশুড়ির ঝগড়া সব সময় চলে।
সিরিয়াল আঁচল,
আছে শুধু ঘর ভাঙার প্যাঁচাল।
মহিলারা সিরিয়াল দেখা শুরু
করে সন্ধ্যা থেকে রাত,
স্বামী তার কাজ থেকে এসে
পায় না ঠিক মতো রান্না করা ভাত।

রাজধানীর জ্যাম

মাহামুদুল হাসান (নাবিল)

রোল : ৩২২২৬, শ্রেণি : একাদশ

রাস্তায় গাড়ির জ্যাম
থেমে যায় কাজ কাম।
মানুষের পেরেশানি
এই মোদের রাজধানী।

তেল পোড়ে মন পোড়ে
হাঁক ডাক জোরেশোরে।
পুলিশের হাত নড়ে
মানুষের মাথা ধরে।
রাস্তার এই অবস্থা,
জানি না কী ব্যবস্থা।
মনেতে নেই আস্থা
কেবল জীবনই সস্তা।

বড়লোক, ছোটলোক

মোঃ সোহাগ ভুঁইয়া

রোল : ২৯২২১, শ্রেণি : দ্বাদশ

বড়লোক, ছোটলোক, গায়ে লেখা নয়
আচার, বিচার, ব্যবহারে, ছোটবড় হয়।
ধন, দৌলত, টাকা-পয়সা আছে যার বেশি
মান সম্মান, না থাকলে, বড়লোক সে কিসে?
বিষয় সম্পদ, বাড়ি-গাড়ি, অনেক লোকের নাই
তাই বলে সেই লোক ছোট হয়ে যায়?

জায়গা জমি, বিষয় সম্পদ, ভাগ্যরই লিখন
বিদ্যা-বুদ্ধি, কলা-কৌশল আপনি নিজেই শিখুন।
সমাজপতি, সৎলোক মানি-গুণী যে জন
লোকে যারে বড় বলে, আসলে সে সুজন।
ভাঙা ঘরে থেকেও কিন্তু বড় লোক হয়
স্বভাব চরিত্র ভালো যার, জানিবে নিশ্চয়।

দালান-কোঠায় থেকেও যার স্বভাব ভালো নয়
জ্ঞানী-মানি বড়লোক, কেবা তারে কয়?
হীনমন্য, হিংসা-বিদ্বেষ, বদ স্বভাব যার
সমাজেতে মূল্যহীন সম্মান নাই যে তার।
গুণী-মানি বিচারপতির ইজ্জত দেন না যিনি
বিষয় সম্পদ থেকেও কিন্তু ছোট লোক তিনি।
আসুন আমরা সবাই মিলে, বড় হয়ে যাই
ঘৃণা করি, ছোট লোকদের, ইজ্জত যাদের নাই।

রাজ পথের স্মৃতি

শবনম শারমীন (স্বর্ণালী)

রোল: ৩০৭৫৭, শ্রেণি : একাদশ

আমি এক রাজপথ,
শত বছরের শত স্মৃতি মিশে আছে আমার সাথে
কত মানুষের আনন্দ ধ্বনি, হতাশার দীর্ঘশ্বাস
কিন্তু আমার আজও মনে আছে,
সে দিনটির কথা............
সেদিনটি ছিল ফাল্গুনের এক ঝকঝকে সকাল
রাস্তাঘাট ফাঁকা
হঠাৎ কী হলো!
হাজার হাজার মানুষ সকল শৃঙ্খল ভেঙ্গে এলো
আমার কাছে...
বজ্রকণ্ঠে তাঁরা গর্জে উঠলো-
'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই!'
ঠা ঠা শব্দে হঠাৎ কেঁপে উঠলো চারিদিক
লুটিয়ে পড়লো বীর সন্তানেরা
আমার কাছে আসার স্বাধীনতাটুকুও কি তাঁদের ছিল না?
বহুদূরে... কোনো এক গাঁয়ের পথে
এক ভাষাসৈনিকের মায়ের চোখের জল,
পড়লো আমারই ওপর, শিশিরের মতো...
কিন্তু সে দিনটি ছিল আমার জীবনের
শ্রেষ্ঠ দিন
কারণ সে দিনের ত্যাগের কারণেই
আরেক জননী 'বাংলা'
পেয়েছিলো তাঁর স্বাধীনতা!!

ঋণ

পূজা বিশ্বাস

রোল : ২৮১৭৪ শ্রেণি : দ্বাদশ

আমি আমার মাকে বলি
শীত কেন মা আসে?
বস্ত্রহীন, ছাউনিবিহীন
গরিব দুঃখীর পাশে?
বড়লোকের ছেলেমেয়েদের
আছে দামি কম্বল
চটের ছালা, ছিঁড়া কাঁথা
গরিবদেরই সম্বল।
টুঙ্গীপাড়ার সেই ছেলেটি
খুলেছিল তার গায়ের চাদর,
পথের ধারে, অসহায় এক
গরিব দুঃখীকে করে আদর।
আমার আছে অনেকগুলো
একটি যদি দেই ওদের,
চুপ থেকো না, বলো না, মা?
শোধ কি হবে ঋণ মোদের?

অপেক্ষা

ইয়াকুব আলী-শাকিল

রোল : ৩১৭০৫, শ্রেণি : একাদশ

কোন আকাশে খুঁজব তোমায়
কোন শহরের ভিড়ে।
কোথায় আমি পাব তোমায়
কোন সাগরের তীরে।
কোন মানুষটি পেয়ে তুমি
হারিয়ে গেলে দূরে

হয়তো অনেক ভালো আছ
মিশে একি সুরে।
নিত্য তবু স্বপ্ন দেখি
আসবে তুমি আজি
নিত্য আবার যাই যে হেরে
ধরতে এমন বাজি।
চোখের জলে অপেক্ষাতে
শুধুই আমি ভিজি
ঘুমের ঘোরে স্বপ্নলোকে
আজও তোমায় খুঁজি।।

পরিবার

পার্থ মজুমদার
রোল: ২৮৪৯৩, শ্রেণি: দ্বাদশ

এই জীবনের সকল হাসি
কান্না যদি হয়,
মায়ের মতো আমার ব্যথা
কেউ তো বুঝবে না।
স্বপ্ন পথের অন্ধকারে
থামতে যদি হয়,
হাত বাড়িয়ে বাবার মতো
কেউ তো খুঁজবে না।

আমি হাঁটতে ভালোবাসি,
দাদার পাশাপাশি।
আমি দেখতে ভালোবাসি,
বোনের মুখের হাসি।
এই ভালোবাসা ছেড়ে-
দূরে সরে থাকা।
কবিতারা আছে মনে,
তবুও মন বড় একা।

মশা

খাদিজা
রোল: ২৮১৭০, শ্রেণি : দ্বাদশ

পড়তে বসে মশার কামড়
একি ভীষণ জ্বালা,
কানের কাছে ভনভনাভন
কানটা জ্বালাপালা।
যতই বলি ও মশা ভাই
পালাও তাড়াতাড়ি,
দুষ্টু মশা আমায় বলে
I am very sorry

মশা আর মশা
মশার জ্বালায় কোথাও
যায় না একটু বসা
মশার ভয়ে আমি যখন
মশারিতে ঢুকি
মশা তখন বাহির থেকে
মারে শুধু উঁকি।

সিগারেটসেবীদের...

আফরা ফারহানা
রোল: ২৭৬০৫, শ্রেণি : দ্বাদশ

আমাদের প্রতিবেশী ভালো লোক নন্দ
ছয় ফুট লম্বা, চওড়া তার স্কন্ধ
কোঁকড়ানো কালো চুল, মুখখানা চন্দ
নেই তার কারও সাথে ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব
হৃদয়টা মসৃণ নেই খানাখন্দ
অফিসে যায় রোজ, হলেও তা বন্ধ।

আচরণ স্বভাবের এক দিকই মন্দ
নিকোটিনের গন্ধে উন্মাদ, অন্ধ
একদিন খুব জ্বর, ডাক্তারের সন্দেহ
রক্তে পাওয়া গেল ক্যানসারের গন্ধ
ফুসফুসে দেখা গেল ছোট ছোট রন্ধ্র
এলোমেলো হয়ে গেল জীবনের ছন্দ।

কন্যা আমি

শাহনাজ আক্তার
রোল: ৩০৩৯৭, শ্রেণি : একাদশ

আমি স্বপ্ন দেশি দুচোখ ভরে,
স্বপ্ন দেখি
সুদূর পথের পথিক হতে
সাগর মহাসাগর পাড়ি দিতে।

স্বপ্ন দেখি
অজানাকে জানতে,
অসাধ্যকে সাধন করতে।

স্বপ্ন দেখি
স্বপ্নের দেশের রাজকন্যার মতো
ডানা মেলে উড়তে।

স্বপ্ন দেখি দুচোখ ভরি
জ্ঞানের সাগর দিব পাড়ি।

শুধু, স্বপ্নই দেখি
পারি না, স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে
পারি না, তাদের সমতুল্য হতে।

কন্যা আমি
তবে দুর্বল নই
সবই করতে পারি,
শুধু,
বাধার পাহাড় ভাঙতে দেরি।

বৃদ্ধাশ্রমকে না বলুন

শ্রাবন্তী দেবনাথ
রোল: ২৮১৭৫, শ্রেণি : দ্বাদশ

সন্তানের পেছনে, মা-বাবা
জুড়ে দেয় শ্রম
শত ত্যাগের পুরস্কার হলো, বৃদ্ধাশ্রম।
ছোটকালে, যে হাত ধরে
চলতে শিখেছিলে
এ বেলায় হাতটা ছেড়ে, কোথায়
পালালে?
ছোট বেলায় যাদের কাছ থেকে

এত স্নেহ নিলে
তাদের আজ বৃদ্ধাশ্রমে, ছুঁড়ে ফেলে দিলে!

বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বৃদ্ধাশ্রমে
ছিলেন অজানা
দুঃখ ভাগ করে সকলে আজ,
পরিবার-পরিজনা।

অপেক্ষায় তারা দিন গুনতে থাকে
মাসের পর মাসে
সন্তানেরা ভুলক্রমে যদি তাদের, দেখতে চলে আসে।

নিশ্চুপ এ মা-বাবার অশ্রু
রক্ত হয়ে ঝড়ে
বিধাতা কি এ মহাপাপ, কখনো মাফ করে?

মা-বাবার এত ত্যাগের কথা
অন্তত একবার স্মরণ করুন
লাখো কণ্ঠে, লাখো বার, বৃদ্ধাশ্রমকে না বলুন।

ঢাকা

মোঃ রাসেল
রোল: ৩০৯৯৫, শ্রেণি : একাদশ

ঢাকা আমার ঢাকা।
গুলিস্তানের মোড়ে গেলে
পকেট হবে ফাঁকা।
রাস্তা-ঘাটে বাসের ধোঁয়া
মশার জ্বালায় যায় না শোয়া,
সব জিনিসের মূল্য চড়া,
যায় না মোটেও সহ্য করা।
লক্ষ্যবিহীন ঘুরছে শুধু
এই জীবনের চাকা,
কেউ জানে না এমনি করে
কদিন যাবে থাকা।

আবেগ

মোঃ সোহানুর রহমান সোহান
রোল: ২৯৬৮২, শ্রেণি : দ্বাদশ

ডোবে রবি ওঠে চাঁদ দিন চলে যায়,
কত স্মৃতি কাঁদে বুকে শুধু হতাশায়!
কত ঢেউ তীরে এসে চলে যায় ফিরে
বালুচর ব্যথা নিয়ে রয় শুধু পড়ে।
কত ঝড়ে, সর্বস্বান্ত করে প্রকৃতিকে
তবুও প্রকৃতি তাকে হাসি মুখে ডাকে।
কোথা হতে এলো বান জানিল না কেউ,
নীড় ভেঙে দিয়ে গেল তীর ভাঙা ঢেউ।
শত ডাকে প্রভু মোর দিলে নাকো সাড়া,
রইলো না কিছু আর অশ্রু ছাড়া।

উপদেশ

মোঃ সানিয়াল আহমেদ
একাদশ
রোল: ৩১৩৩৫

দাঁত দিয়ে নখ কেটো না।
বই পড়ো না শুয়ে।
খাবার আগে সাবান দিয়ে
হাতটি নিয়ো ধুয়ে।

নিয়মিত খাবার খাবে
শরীর হবে বেশ,
তোমরা যারা আগামীতে
গড়বে নতুন দেশ।

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে
জীবনটাকে গড়।
সৎ সঙ্গ গ্রহণ করে
সৎ পথে চলো।
মিথ্যা কথা বলিও না
সত্য কথা বলো।
লোভ-লালসা ত্যাগ করে
সঠিক পথে চলো।

খুকুমনির বিয়ে

সুমী আক্তার
দ্বাদশ, রোল: ২৭৮৯৭

কলমিলতা, মাধবীলতা
করছে কানাকানি,
খুকুমনি বউ সেজেছে

যাবে শ্বশুরবাড়ি।
সঙ্গে ছিল ফুলকুমারী,
প্রজাপতির দল।
জোনাক দিল বিজলী বাতি,
করতে ঝলমল।
পেঁচা দিল তাহার ঠোঁটের
মধুমাখা হাসি,
মিষ্টিকণ্ঠী কোকিল দিল
সুরেলা এক বাঁশি।
সঙ্গী সাথী বন্ধুরা সব
নিয়ে এলো হাঁড়ি,
এ সব নিয়ে খুকুমনি
গেল শ্বশুরবাড়ি।

ছাত্র

মির্জা আকিবুজ্জামান
রোল: ৩১৮৭৪, শ্রেণি: একাদশ

ছাত্র আমি খুবই ভালো
অঙ্কে মারি ফেল,
পড়ার টেবিল আমার কাছে
মনে হয় এক জেল,
ইংরেজিতে লিখতে গিয়ে
বাংলাতে লিখি,
পড়তে গিয়ে দুচোখ দিয়ে
Facebook টা দেখি।
পড়াশোনা আমার কাছে
খারাপ লাগে বেশ,
মনে হয় মোর পড়াশোনা
এই পর্যন্তই শেষ।

ক্রিকেট টা খুব ভালোবাসি
প্রিয় খেলোয়ার সাকিব,
তাই তো বুঝি নাম দিয়েছে
মা আমারে আকিব।

স্বাধীন বাংলা

এম. আব্দুল্লাহ আল মামুন
রোল: ৩২০১৫, শ্রেণি : একাদশ

বাঙালি জাতি মোরা
বাংলা মোদের ভাষা,
বাংলাদেশকে ঘিরে মোদের
স্বপ্ন সুখের আশা।
বাংলা মোদের মাতৃভাষা
প্রেরণা যোগায় মনে,
স্বাধীনভাবে কথা বলি
সুখের অন্বেষণে।

স্বাধীন দেশের মানুষ মোরা
স্বাধীন মোদের ভাষা,
এই দেশেতেই বাঁধি মোরা
ছোট্ট সোনার বাসা।
স্বাধীন দেশের বৃক্ষরাজি
মুক্ত হাওয়ায় দোলে,
মাঠ ভরা ঐ সবুজ ফসল
ভরে যায় ফুল ও ফলে।
চারিদিকে দেখি সবুজের মেলা

স্বাধীন দেশের কোলে,
পাখ-পাখালির মিষ্টি সুরে
মনটা হাওয়ায় দোলে।
স্বাধীন দেশের মানুষ মোরা
নেই তো মোদের ভয়,
সাহস রেখে, শক্তি দিয়ে
করব সবই জয়।

জীবন দিয়ে করব রক্ষা
আমার (স্বাধীন) দেশের মাটি,
এই দেশেরই মাটি মোদের
মায়ের মতো খাঁটি।

ভাষার কথা

রুবিনা সুলতানা মিম
রোল: ৩০১৪১, শ্রেণি: একাদশ

পুত্র হারা মা জননীর
মনটা ভীষণ ভারি
কারণটা ভাই বলছি আমি
আসছে ফেব্রুয়ারি।
ভাষার তরে প্রাণটা দিল
পুত্র যে এ মাসে
তারই কথা পড়ে মনে
ভুলতে পারে না সে।

বায়ান্নতে রাখতে গিয়ে
বাংলা ভাষার বুলি
শত মায়ের সন্তানেরা
বিঁধল বুকে গুলি।

ওদের তরে পেলাম সবে
মায়ের মুখের ভাষা
যে ভাষাতে সুখে-দুঃখে
মিটাই মনের আশা।

মা

জন্ম নিয়েছি তোমার কারণে
তুমি কি সব না?
তোমায় আমি ভালোবাসি
কারণ তুমি আমার মা।
দশ মাস গর্ভে রেখে
জন্ম দিয়েছ মোরে,
ওয়াদা করে বলছি আমি
দেব না পর করে।
কত কষ্টে পালন করে
আমায় বড় করেছ আজ,
ভবিষ্যতে এই কারণে
করবে তুমি রাজ।

How is it

Alim Dewan
Roll: 31783, Intermediate

The paper on the table is
shiny and wet,
The sun in the sky is
bright and great.
The water in the pond is
clean and shiny.
The weather in a cloudy day is
slippery and rainy.
The sky in the winter is
full of birds.
But when you left me
my heart was broken in parts.

A SHAKESPEARE'S TALE

Sabid Kamal
Roll: 31018, Intermediate

When you are disappearing in
love
People can't see you, you can
see love around you
You feel strange, but want to
feel more
After some moments you get
exhausted,
Maybe because your lover didn't
disappear with you
You haul & shriek but yet there
are no symptoms of her
presence
You act like crazy "where are
you" you repeat
Still no feedback of sound in
this scene
Just the sound of your scream,

you try to escape from this scene
The time when you're leaving,
You prayed to stay one more time in this scene,
With your lady lover
Then it's the real life you started to face,
You search your lady lover, the answer is pissed
You haul & shark again but 1st time in reality
You can't find your lover, there is no opinion to live
A bottle of poison I started to drink,
Then you see a beautiful woman screamed after what you did
You recognized she was your love,
You couldn't touch her as you fell in deep sleep

(PS- THIS IS WRITTEN BY ME, NOT WILL SHAKESPEARE)

Saif A. Sunjani
Roll: 29024, H.S.C

When there is sun
Try to feel the sunshine;
May be you not get it tomorrow.

When there is rain,
Try to wash on it;
When there is joke,
Try to laugh, your test;
May be you not get this moment again.

When there is moon light.
Try to enjoy it;
May be you not get it again.

When there is a gentle blow,
Take a deep breath and try to feel it.
May be you won't be able to take it again.

How much time you live in the world
Try to enjoy
Because...
You are just for a while in this world.

I can remain alive.....

No person will remain alive
only my world can
remain alive

It I can write,
only for the welfare of this earth
only for the love of people
only for borrowings of our

I can remain alive
I can be immortal
If I can do any thing special
for mankin
for earth
for society.

I can remain alive in this
mortal live.

Best Friend Forever

Mahamudul Hassan Nabil
Roll: 32226

Best friends
The ones we never want to lose.
But what does it mean to be
Best friends?
You should see each other every day?
Well, that not true for you and me.
Should silly little fights get in our way?
Should we give?
Should we borrow?
Should we dance like there's no tomorrow?
Secrets are traded
Privacy invaded.
Hugs and smiles are shared
Tears and shed
Dove is spread
We knew that we both really cared.
I smile, you smile
You cry, I cry
I wish, you wish
You die, I die
If you fall
I'll help you up
But after I finish my laugh.
And if you call
I'll always puck up.
Best friends forever!
The promise we made.
And I know in my heart
That it will never fade!

তথ্য বিচিত্রা

নাম	লেখক	পৃষ্ঠা
জানলে তেমন ক্ষতি নেই	জান্নাতুল ফেরদাউস এশা	১৪০
ক্যালকুলেটর শাব্দিক আবিষ্কার	মোঃ রাসেল	১৪০
যেখাবে জন্ম হল ইসরায়েল নামক রাষ্ট্রের!	নাহিন মাহ্‌ফুজ সিয়াম	১৪০
....	সাদমান শাবাব	১৪১
পোশাকের সাথে পরিচিতি	নাহিন মাহ্‌ফুজ সিয়াম	১৪২
18 Amazing Facts About Business!!	নাম শবনম শারমীন	১৪২
পিঁপড়া নিয়ে যত অজানা কথা	মোঃ সাব্বির হোসেন মৃধা	১৪৩
ক্রিকেটের কিছু বাস্তব ঘটনা, রটনা নয়	মাহমুদ হাসান মাহ্‌দী	১৪৩
জানার আছে অনেক কিছু	মোঃ রাসেল	১৪৪
সময়ের দাম	মোঃ রাসেল	১৪৪
অভাবনীয়! বিস্ময়কর!	মোঃ রাসেল	১৪৪
....	আব্দুল কাদের	১৪৫
বাস্তবে কিছু সত্য রয়েছে যা আমাদের অজানা এবং অনেকটা অবিশ্বাস্য	আব্দুল কাদের	১৪৫
আধুনিক বাক্য সংকোচন	আব্দুল কাদের	১৪৫
আশ্চর্য মিল	মোঃ রিমন হোসেন	১৪৬
Digital বাক্য সংকোচন	মোঃ রাসেল	১৪৬
প্রাণীর বিচিত্র কিছু তথ্য	জেবা আতুকীয়া	১৪৬
অজানা কিছু তথ্য	জেবা আতুকীয়া	১৪৬
৭ নিয়ে কারবার	মোঃ রাসেল	১৪৭
গণিতের মজা	মাহামুদুল হাসান নাবিল	১৪৭
আমাদের বাংলাদেশ	রিতা ইসলাম	১৪৮
বিচিত্র জ্ঞানের সমাহার	মোঃ সোহানুর রহমান সোহান	১৪৮
সাধারণ জ্ঞান	মোঃ রকিবুল ইসলাম	১৪৮
পৃথিবীর বিচিত্র যত তথ্য	মাহমুদুল হাসান নাবিল	১৪৯
অজানা পারমাণবিক তথ্য	নাজিন মাহ্‌ফুজ সিয়াম	১৪৯
পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা কেন ফেল করে?	সালমান আহমেদ	১৫০
জানা অজানা তথ্য	জমি মন্ডল	১৫০

জানলে তেমন ক্ষতি নেই

জান্নাতুল ফেদাউস এশা

শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ২৭৫৯২

১। মাটিতে পুঁতে দেয়ার পর একটি প্লাস্টিকের ব্যাগের পচন ধরতে প্রায় ৫০০ বছর পর্যন্ত সময় লাগে।

২। পূর্ণ বসস্ক ১টি নীল তিমির একটি মাত্র নিঃশ্বাসে যে পরিমান বায়ু বের হয়, তাদিয়ে দুই হাজারটি বেলুন ফোলানো সম্ভব।

৩। মধুই একমাত্র খাদ্য, যা পঁচে না।

৪। ডায়েট কোকাকোলা পানির ভেতর ঢাললে পানির ওপর ভেসে থাকবে। কিন্তু সাধারণ কোকাকোলা পানিতে ঢাললে পানির সঙ্গে তা মিশে যাবে।

৫। শিল্পাঞ্জি একমাত্র প্রাণী (মানুষ ছাড়া) যে কিনা আয়নায় নিজেকে চিনতে পারে।

৬। খাঁটি হিরে কখনোই এক্স-রেতে ধলা পড়ে না।

৭। মোনালিসা'র ঠোঁট আঁকতে লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির ১২ বছর সময় লেগেছিলো।

৮। কেঁচোর কোনো হৃদপিন্ড নেই।

৯। কুমিরের দাঁত যতবার পড়ে, ততোবারই ওঠে।

১০। তেলাপোকা মাথা ছাড়া ১০ দিন বাঁচতে পারে।

১১। বানরের মাথায় দু'টি মগজ থাকে। একটি তার দেহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অপরটি তার লেজ নিয়ন্ত্রণ করে।

১২। হাতি দৈনিক প্রায় ২০ ঘণ্টা খাওয়ায় ব্যস্ত থাকে।

১৩। কালো তিমি জন্মের সময় সাদা হয়ে জন্মায়।

১৪। প্রজাপতি স্বাদ নেয় তাদের পায়ের সাহায্যে।

ফেসবুক কর্ণার

১। বলো তো, ফেসবুকের রং নীল কেন? কারণ, মার্ক জাকারবার্গ আংশিক বর্ণান্ধ। নীল রংটাই তিনি সবচেয়ে ভালো দেখতে পান। সবুজ/লাল এসব রঙের পার্থক্য তিনি ধরতে পারেন না।

২। ২০০৬ সালে ক্রিস পুটনাম নামের এক ব্যক্তি ফেসবুক হ্যাক করেছিলেন। ফলাফল? পরদিন সকালেই তিনি ফেসবুকের প্রধান কার্যালয়ে চাকরি পেয়েছিলেন।

৩। ধরো, এক সকালে তোমার ফেসবুকের মালিক হওয়ার কিছু নয়-কমপক্ষে ৪০ বিলিয়ন ডলার থাকতে হবে তোমার পকেটে।

৪। 'বিস্ট' নামের জাকারবার্গের একটি পোষা কুকুর আছে। ফেসবুকে কুকুরটির ফলোয়ারের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি।

৫। মার্ক জাকারবার্গের ফেসবুক একাউন্ট হ্যাক করা যায় না।

৬। প্রতি মাসে গড়ে ১৩১ কোটি মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করে।

৭। ফেসবুক ব্যবহারকারীরা প্রতি মাসে প্রায় ৬৪ কোটি মিনিট সময় ফেসবুকের পেছনে ব্যয় করে।

৮। গড়ে একজন ফেসবুক ব্যবহারকারীর ১৩০ জন বন্ধু থাকেন।

৯। ফেসবুকে ফেইক একাউন্টের সংখ্যা প্রায় আট কোটি ১০ লাখ।

ক্যালকুলেটর শাব্দিক আবিষ্কার

মোঃ রাসেল

শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩০৯৯৫

ক্যালকুলেটরের সাহায্যে খুব সহজেই কিছু শব্দ আবিষ্কার করা যায়। যার জন্য ক্যালকুলেটরকে উল্টো ধরতে হবে।

6 x 0.1289 = Hello (সম্ভাষণ)
5 x 15469 = Shell (খোসা)
5 x 1421 = Soil (মাটি)
13 x 26 = Bee (মৌমাছি)
6 x 1289 = Heel (নরক)
4 x 12.75 = Is (হয়)
34 x 227 = Bill (টাকার হিসাব)
5 x 69 = She (সে)
2 x 17 = He (সে)
200 x 3679.105 = Rasel (রাসেল)

উক্ত শব্দ ছাড়াও ক্যালকুলেটর দিয়ে বাক্যও তৈরি করা যায়। যেমনঃ 5 x 15430269 = She is ill.

যেখাবে জন্ম হল ইসরায়েল নামক রাষ্ট্রের!

নাহিন মাহ্ফুজ সিয়াম

শ্রেণি : একাদশ, রোল : ২৮৪৩২

বর্তমান বিশ্বে যে রাষ্ট্রকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক সংবাদ প্রচারিত হয় সেই রাষ্ট্র হল ইসরায়েল। ২০,০০০ বর্গ কি.মি আয়তনের বিশ্বের একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র কিভাবে পৃথিবীর বুকে জন্ম নিল আসুন জেনে নেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কি উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর ফিলিস্তিনসহ বেশির ভাগ আরব এলাকা চলে যায় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের দখলে। ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার জেমস বেলফোর ইহুদিবাদীদের লেখা এক পত্রে ফিলিস্তিনী ভূ-খণ্ডে একটি ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি

ঘোষণা করেন। বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ফিলিস্তিনী এলাকায় ইহুদিদের আলাদা রাষ্ট্রের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয় এবং বিপুল সংখ্যক ইহুদি ইউরোপ থেকে ফিলিস্তিনে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশদের সহযোগিতার মাধ্যমে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা ২০ হাজার হয়। এরপর ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২৩ সাল নাগাদ ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা বেড়ে ৩৫ হাজারে পৌঁছে যায়। ১৯৩১ সালে এই সংখ্যা ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১ লাখ ৮০ হাজারে পৌঁছায়। এভাবে ফিলিস্তিনে ইহুদি অভিবাসীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে থাকে। ১৯৪৮ সালে সেখানে ইহুদি সংখ্যা ৬ লাখে উন্নীত হয়।

১৯১৮ সালে বৃটেনের সহযোগিতায় গুপ্ত ইহুদি বাহিনী "হাগানাহ" গঠিত হয়। এ বাহিনী ইহুদিবাদীদের অবৈধ রাষ্ট্র তৈরির কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রথমে ফিলিস্তিনী জনগণের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদীদের সহায়তা করা "হাগানাহ" বাহিনীর কাজ হলেও পরবর্তিতে তারা সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী বাহিনীতে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করা সংক্রান্ত ১৮১ নম্বর প্রস্তাব গৃহীত হয়। জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব পাস করে।

এর ফলে ফিলিস্তিনীদের মাতৃভূমির ৪৫ শতাংশ ফিলিস্তিনীদের এবং ৫৫ শতাংশ ভূমি ইহুদিদের হাতে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তেল আবিবের জাদুঘরে ডেভিড বেনউগুরিনের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের জন্ম হয়। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ইসরায়েল স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

সাদমান শাবাব

শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ২৯২১২

FRIEND বলতে আমাদের যা বোঝা উচিত?

F= First
R= Relation
I= In
E= Earth (which)
N= Never
D= Dies.

আমরা কি জানি আমাদের দেশের অর্থ কী?

"BANGLADESH"

B = Blood (রক্ত)
A = Achieved (অর্জিত)
N = Noteworthy (স্মরণীয়)
G = Golden (সোনালি)
L = Land (ভূমি)
A = Admirable (প্রশংসিত)
D = Democratic (গণতান্ত্রিক)
E = Evergreen (চিরসবুজ)
S = Sacred (পবিত্র)
H = Habitation (বাসভূমি)

অবিশ্বাস্য সত্য :

১। প্রতি বছর ৪/৪, ৬/৬, ৮/৮, ১০/১০, ১২/১২ তারিখগুলো সপ্তাহের একই দিনে হয়। ২০১৪ সালে এ দিনগুলো শুক্রবার, ২০১৫ সালে শনিবার।

২। বৃষ্টির পানিতে Vitamin B থাকে।

৩। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইংরেজি শব্দ: Floccinaucinihilpilification. এ শব্দটির অর্থ অবমূল্যায়ন করার অভ্যাস।

৪। মানুষের চুল ও নখ মৃত্যুর পরও বাড়ে।

৫। বাঘের দুধ মাটিতে পড়া মাত্রই শক্ত হয়ে যায়। (সংগৃহীত)

সংখ্যার যাদু

একটি সহজ পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে একটি সংখ্যার খেলা খেলা যেতে পারে। প্রথমে তোমার বন্ধুকে ২০-৯৯ এর মধ্যে একটি সংখ্যা ধরতে বলো। তারপর ঐ সংখ্যার অংক দুটি যোগ করতে বলো। প্রাপ্ত যোগফলটি পূর্বে ধরা সংখ্যা হতে বিয়োগ করতে বলো। বিয়োগফলের যে কোনো একটি অঙ্ক তোমাকে বলতে বলো। এবার তুমি কিছু না দেখেই অন্য অঙ্কটি তাকে বলে দিতে পারবে। কারণ ৯ থেকে ঐ অঙ্কটি বিয়োগ করলেই অন্য অংঙ্কটি পাবে।

For Example: ধরো, তোমার যে বন্ধুকে ধরতে বলেছ, সে ধরেছে ৩৫, ৩ ও ৫ যোগ করলে ৮। এবার ৩৫ থেকে ৮ বিয়োগ করলে সে পেল ২৭। তুমি জিজ্ঞেস করলে তোমাকে ৯ থেকে ২ বিয়োগ করে সহজেই ৭ বলে দিতে পারবে। (৯-২) = ৭।

পোশাকের সাথে পরিচিতি

নাহিন মাহ্‌ফুজ সিয়াম
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ২৮৪৩২

আসলে পোশাক কী? পোশাক কেন পড়ি? শুধুই কি লজ্জা নিবারণের জন্য? আসুন একটু দেখে আসি।

Cloth: "Fabric made by weaving cotton, woll silk etc. or felted material"

Oxford Advanced Learner's Dictionary -এর মতে Clothes: "The things worn to cover a person's body"

পোশাক পরিধানের কারণ :

১। পোশাক পড়ে থাকি নিজেকে রক্ষার জন্য।
২। পোশাক পড়ে থাকি লজ্জা নিবারণের জন্য।
৩। পোশাক পড়ে থাকি সাজানোর জন্য।
৪। পোশাক পড়ে থাকি সামাজিক মর্যাদা বোঝানোর জন্য।

পোশাকের কাজ :

১। ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর জন্য।
২। বয়স বোঝানোর জন্য।
৩। পেশা বোঝানো জন্য।
৪। কোন গ্রুপের সদস্য বোঝানোর জন্য।
৫। বৈবাহিক এবং আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বোঝানোর জন্য।

আধুনিক ফ্যাশন ও স্টাইল :

ফ্যাশন কী? এ বিষয়ে কি আমাদের পরিষ্কার ধারণা আছে? না থাকাটাই স্বাভাবিক, চলুন প্রথমে জেনে নেয়া যাক ফ্যাশন কী?

Oxford Advanced Learner's Dictionary-এর মতে, “A popular style of clothes, hair etc. at particular time or place." অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা জায়গায় জনপ্রিয় পোশাক, চুলের সাজ ইত্যাদির স্টাইল হচ্ছে ফ্যাশন।”

স্টাইলঃ কোনো লোক বা আপনার নিজের জীবনযাপনের যে পদ্ধতি তাই আপনার স্টাইল। যেমনঃ আপনি চুল ছোট রাখেন এটা আপনার স্টাইল, আপনি শার্ট পড়েন কিন্তু হাতের বোতাম আটকান না এটাও আপনার স্টাইল। কোনো মেয়ে যদি জিন্স প্যান্ট আর ফতুয়া পড়ে এটা সেই মেয়ের স্টাইল।

ফ্যাশন : একটি স্টাইল যখন সমাজের একটি দল বা গোষ্ঠীর মাঝে জনপ্রিয়তা পায় তখন তা হয়ে যায় ফ্যাশন। যেমন : ছেলেদের চুলের স্পাইক, মেয়েদের হাতে রিস্ট ব্যান্ড পরা।

পার্থক্য : সকল ফ্যাশন কিছু স্টাইলের উপর গড়ে ওঠে। কিন্তু তাই বলে সকল স্টাইলই ফ্যাশন নয়। ফ্যাশন একটি সামাজিক ব্যাপার। যেমনঃ বাংলাদেশে নিশ্চয়ই কেউ জিন্নাহ্‌ টুপি পড়ে হাঁটবে না। একটি স্টাইল ততক্ষণ পর্যন্ত ফ্যাশনে রূপান্তরিত হয় না যত দিন পর্যন্ত তা জনপ্রিয়তা না পায় এবং একটি ফ্যাশন ততদিনই ফ্যাশন থাকে যতদিন এর গ্রহণযোগ্যতা থাকে।

আমরা কি এরকম ভাবি না যে, USA-ই ফ্যাশন জগৎ নিয়ন্ত্রণ করে? আসলে ব্যাপারটি তা নয়। আসুন জানা যাক কারা ফ্যাশন জগৎ নিয়ন্ত্রণ করে।

ফ্রান্স : ফ্রান্সকে বলা হয় "Center of Fashion" ফ্রান্স-ই আন্তর্জাতিক ফ্যাশনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ফ্রান্সের প্যারিসকে বলা হয় “ফ্যাশন সিটি”। দুইশ বছরের অধিক সময় ধরে তারা এ কাজটি করে আসছে।

ইতালি : ইতালির মিলান হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিতীয় ফ্যাশন সিটি। ফ্যাশন এই দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ শিল্প।

যুক্তরাজ্য : এ দেশটি প্রসিদ্ধ আধুনিক পুরুষের পোশাকের জন্য

জার্মানি : জার্মানির ফ্যাশন ইন্ড্রাস্ট্রিজ বিখ্যাত তার ফরমাল এবং নন ফরমাল পোশাকের জন্য।

আমেরিকা : ফ্যাশন জগতে এর স্থান পঞ্চম হলেও পৃথিবীর বেশি পোশাকের এবং কাপড়ের ক্রেতা এ দেশেরই।

আশা করা যায়, আমরা সবাই স্টাইল, ফ্যাশন, ফ্যাশন জগৎ সম্পর্কে একটি ধারণা পেলাম।

18 Amazing Facts About Business!!

নাম শবনম শারমীন
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩০৭৫৭

1. Rubik's cube is the best selling product of all times. I Phone is the 2nd.
2. More people have mobile phones than toilets.
3. Coca-cola's logo is recognized by 94% of the world's population.
4. Yahoo stands for ' Yet Another Hierarchical Officious Oracle'.
5. Walmart maker an average profit of $ 1.8

million (Tk. 13,95,90,000) per hour.

6. Average Smartphone users check on Facebook 14 times per day.

7. More than 80 million mouse ears have been sold at Walt Disney World.

8. The worlds 100 richest people earned enough money in 2012 to end global poverty 4 times over.

9. 1 in 8 Americans have been employed by McDonalds.

10. 70% of small business is owned and operated by a single person.

11. Cereal is the 2nd largest advertiser or TV today, after Automobiles.

12. Google was originally called Back Rub.

13. Warner Musics owns the copysights to 'Happy Birthday to You', So you technically owe royalities every time you sing it.

14. Samsung accounts for 20% of Korea's gross domestic product.

15. The most productive day of working days is Tuesday.

16. Candy Crush earns $ 633,000 per day (Tk. 4,90,89,150).

17. If Bill Gates were a country, he would be the 37th richest country.

18. Mc Donalds first launched hot dogs, not hamburgers.

পিঁপড়া নিয়ে যত অজানা কথা

মোঃ সাব্বির হোসেন মৃধা

রোল : ২৮৪০২, শ্রেণি : দ্বাদশ

পিঁপড়া ডাইনোসরের সমবয়সী। আজ থেকে ১৩ কোটি বছর আগেও পিঁপড়ারা ছিল এই বসুধায়। আবেগের বিষয় হল পিঁপড়া মানুষের আগে চাষাবাদ শুরু করে। হতে পারে পিঁপড়া মানুষের চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান। পিঁপড়ার দেহের তুলনায় মাথা বড় এবং এদের মস্তিষ্কে কোষ পৃথিবীতে প্রায় ১০,০০০ প্রজাতি/রকমের পিপড়া আছে। ২,৫০,০০০ আর মানুষের মাত্র ১০,০০০ মস্তিষ্ক কোষ আছে। আবার এরা এক প্রজাতি অন্য প্রজাতির সাথে চলাচল করে না। পিঁপড়ার দুটি চোখ দেখা গেলেও আসলে প্রতিটি চোখ অনেকগুলো ক্ষুদ্র চোখের সমষ্টি। পিঁপড়ার ছয় পা। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল পিঁপড়ারা জীবনে কখনো ঘুমায় না। পিঁপড়া খাবার খায় না বরং রস খায়। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী কী? উত্তরে আসে পিঁপড়া। একটি পিঁপড়া তার দেহের ওজনের কমপক্ষে ২০ গুণ ভারী খাদ্যবস্তু তুলতে পারে যা কোনো প্রাণী বা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। পিঁপড়াদের দল আছে। সমাজ আছে। পিঁপড়াদের দলে একটি রানি পিঁপড়া থাকে। রানি পিঁপড়ার কাজ হল ডিম পাড়া। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। এদিকে ত্যাগ বেশি স্বীকার করতে হয় পুরুষ পিঁপড়াদের। কেন না দলের পুরুষ পিঁপড়া রানির সাথে মিলিত হবার সাথে সাথে মারা যায়।

অন্যদিকে কর্মী পিঁপড়া অনেক পরিশ্রমী। এরা বাচ্চা পিঁপড়াদের দেখাশুনা করে। শত্রু এলে তাড়িয়ে দেয়। কর্মী পিঁপড়া বন্ধ্যা হয়। ওদের ডিম হয় না। পিঁপড়াদের মধ্যেও আবার ভিলেনের চরিত্র রয়েছে- স্লেভ মেকার অ্যান্ট নামে এক রকমের পিঁপড়া আছে যারা অন্যের বাসায় রাহাজানি করে। অন্য পিঁপড়ার বাসায় ঢুকে তাদের পিউপা বা ঘুমন্ত বাচ্চা চুরি করে নিয়ে আসে। নিজের বাসায় সে সব পিউপা লালন-পালন করে। যখন পিউপা খুলে ঘুমন্ত বাচ্চারা বড় পিঁপড়া হয়ে বেড়িয়ে আসে তখন সে সব পিঁপড়াকে সে বাসায় দাস বানায়। পৃথিবীতে মোট মানুষের ওজন যত তার চেয়ে পিঁপড়ার ওজন বেশি! প্রায় ১৫ লাখ পিঁপড়ার ওজন একজন মানুষের সমান। মাত্র এক একর বনভূমিতে ৩৫ লাখ পিঁপড়া আছে। কিন্তু এক একর জমিতে গড়ে দুইজন মানুষ বাস করে না। তাই বলা হয় পৃথিবীর সব প্রাণীর চেয়ে পিঁপড়ার সংখ্যা বেশি। সাবধান! একমাত্র পৃথিবীর মেরু অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর আর সব জায়গাতেই পিঁপড়া আছে। পিঁপড়া মাত্র ৪৫ থেকে ৬০ দিন বাঁচে।

ক্রিকেটের কিছু বাস্তব ঘটনা, রটনা নয়

মাহমুদ হাসান মাহ্দী

শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ২৮৯০২

১। ১৮৮৭ সালে প্রথম টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডকে হারায় ৪৫ রানে। ঠিক ১০০ বছর পর ১০০তম টেস্ট ম্যাচে সেই অস্ট্রেলিয়াই ইংল্যান্ডের কাছে হারে ৪৫ রানে।

২। শহীদ আফ্রিদি এক দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ওয়াকার ইউনিসের কাছ থেকে ধার করা ব্যাট ব্যবহার করে!

৩। বারবাডোজ আর ব্রিটিশ গায়ানার মধ্যে একটি ম্যাচের ঘটনা। তখন অবশ্য ওভার শেষ হতো ৮ বলে। অথচ একটি ওভার কি না শেষ হয়েছে ১৪ বলে! হয় তো বা মনে হতে পারে বাকিগুলো ওয়াইড কিংবা নো বল ছিল? না, আম্পায়ার বল গুণতে ভুল হওয়ায় এমনটি হয়েছে।

৪। টিভি আম্পায়ার প্রথম কাকে আউট দিয়েছিল সে কথা কি কারো জানা আছে! কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান শচিন টেন্ডুলকারকে!

আর সেই রান আউট করেছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত ফিল্ডার জন্টি রোডস। একই টেস্টে পরবর্তী দিনে জন্টি রোডসও রান আউট হন। আর সেই রান আউট করেন শচিন টেন্ডুলকার!

৫। ক্রিকেটের দীর্ঘতম ম্যাচ হলো ১৯৩৯ সালের ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার ম্যাচটি। টানা ১৪ দিন খেলার পর ম্যাচটিকে টাই হিসেবে ঘোষণা করা হয়!

৬। লর্ডসের ক্রিকেট মাঠে ঢুকে পড়েছে কবুতর! হুঁস হুঁস করেও তাড়ানো যাচ্ছে না তাদের। কী আর করা! কবুতরগুলো নিজ থেকে চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হলো ক্রিজে থাকা দুই ব্যাটসম্যান সাকিব আল হাসান ও মুশফিকুর রহিমকে!

৭। ক্রিকেট খেলার সব আইনই সময়ের সাথে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে শুধু একটি ছাড়া। আর সেটি হলো ক্রিকেট পিচের দৈর্ঘ!

৮। ফ্রাঙ্ক স্ট্রানলি জ্যাকসন হচ্ছেন ইংল্যান্ডের ১৭তম টেস্ট অধিনায়ক। ১৯০৫ সালে তিনি ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। খেলেছেন ২০টি টেস্ট ম্যাচ, যার মধ্যে পাঁচটিতে ছিলেন অধিনায়ক এর ভূমিকায়। ১৮৯৪ সালে হয়েছিলেন উইজডেনের 'ক্রিকেটার অব দ্য ইয়ার'। এই ফ্রাঙ্ক জ্যাকসনই কিন্তু ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯২৭-১৯৩২ সাল পর্যন্ত বাংলার গর্ভনরের দায়িত্বে ছিলেন!

জানার আছে অনেক কিছু

মোঃ রাসেল

শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩০৯৯৫

১। পৃথিবীর সবচেয়ে ভারবাহী প্রাণীর নাম পিঁপড়া। সম্মিলিত পিঁপড়ার ভর বহনের ক্ষমতা অন্য যে কোনো প্রাণীর সমষ্টিগত ভর অপেক্ষা বেশি।

২। ঘুম তাড়ানোর জন্য চা বা কফির চেয়ে অর্ধেক আপেল বেশি সুবিধাজনক।

৩। প্রাণিজগতের একমাত্র হাতিরই লাফ দেয়ার ক্ষমতা নেই।

৪। ঝিঁ ঝিঁ পোকা হচ্ছে প্রকৃতির থার্মোমিটার। একটি ঝিঁ ঝিঁ পোকা ১৫ সেকেন্ডে যতবার ডাক দেয় তার সাথে ৪০ যোগ করলে তখনকার তাপমাত্রা জানা যায়।

৫। পাউডার তৈরি হয় শামুকের খোলস থেকে।

৬। বাঘের জিহ্বা চিরুণীর মতো কাজ করে।

৭। একটি তেলাপোকা ৯ দিন মাথা ছাড়া বাঁচতে পারে।

৮। প্রজাপতি তার পা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করে।

৯। ছাগল ও অক্টোপাসের চোখের মনি চার কোনাটে।

১০। 'হার্মি বার্ড' পাখিটি পিছনে উড়তে পারে।

১১। মশার ৪৭ টি দাঁত আছে।

১২। গোল্ড ফিশ আলো এবং অন্ধকারে দেখতে পারে।

১৩। সোহাগ মাছ আগুনে পোড়ে না।

১৪। জিরাফ শব্দ করতে পারে না।

১৫। মাছের কখনো তৃষ্ণা পায় না।

১৬। পাখি কখনো ঘামে না।

১৭। গিরগিটির জ্বিহবা তার দেহের চেয়ে দ্বিগুণ।

সময়ের দাম

১। যদি এক বৎসর সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে চাও, তা হলে জিজ্ঞাসা কর সেই ছাত্রটিকে যে গত বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে।

২। যদি উপলব্ধি করতে চাও এক মাস সময়ের গুরুত্ব, তা হলে জিজ্ঞাসা কর সেই জননীকে যিনি দশ মাস দশ দিন অপেক্ষার পর জন্ম দিয়েছেন এক ফুটফুটে শিশু সন্তানকে।

৩। যদি উপলব্ধি করতে চাও এক সপ্তাহ সময়ের গুরুত্ব, তা হলে জিজ্ঞাসা কর সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশনায় ব্যস্ত সেই সম্পাদককে।

৪। যদি উপলব্ধি করতে চাও এক দিন সময়ের গুরুত্ব, তা হলে জিজ্ঞাসা কর সেই দিনমজুরকে যিনি তার আট সন্তানের খাবার আহরণে ব্যস্ত।

৫। যদি উপলব্ধি করতে চাও এক ঘণ্টা সময়ের গুরুত্ব, তা হলে জিজ্ঞাসা কর সেই প্রেমিকাকে যে তার প্রেয়সীর জন্য পার্কে অপেক্ষারত।

৬। যদি উপলব্ধি করতে চাও এক মিনিট সময়ের গুরুত্ব, তা হলে জিজ্ঞাসা কর সেই ব্যক্তিকে যিনি এই মাত্র মিস করেছেন তার কাঙ্ক্ষিত ট্রেনটি।

অতএব, পাঠকরা উপলব্ধি করতে শুরু করেন প্রতিটি মুহূর্তকে।

অভাবনীয়! বিস্ময়কর!

১। পৃথিবীর ওজন ছয় হাজার পাঁচশ মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন টন।

২। Facetious এবং Abstemious এই দুটি শব্দে সবকয়টি Vowel ব্যবহার হয়েছে।

৩। ইংরেজি ভাষায় ১৫টি অক্ষর নিয়ে এমন একটি শব্দ রয়েছে যার কোনো অক্ষর দুইবার ব্যবহৃত হয় নি। শব্দটি হলোঃ Uncopyrightable.

৪। কানাডায় সবচেয়ে দীর্ঘ দিন হচ্ছে মঙ্গলবার।

৫। পৃথিবীর প্রতিটি শিশু জন্মের সময় কালার ব্লাইন্ড হয়।

আব্দুল কাদের

শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩১৬৯০

১। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই জীবনে কোনো দিন গোসল করেন নি।

২। ভারতের বিখ্যাত জাদুকর পি.সি সরকার ২ মিনিটের জন্য তাজমহল উধাও করে ছিলেন।

৩। লিপস্টিক সাধারণত মাছের আঁইস দিয়ে তৈরি হয়।

৪। জাপানের ফুজিয়ামা পর্বত বাতাসে দোল খায়।

৫। চীনা কবি ইয়ান চী কাঁদলে চোখ দিয়ে রক্ত ঝড়তো।

৬। লবণ মানুষঃ চীনের জিয়াং জাওচেং প্রতিদিন কমপক্ষে আধা কেজি লবণ খেয়ে থাকেন। এ পরিমাণ লবণ না খেলে তিনি সুস্থবোধ করেন না। ১৯90 সাল থেকে তিনি সব সময় লবণ সঙ্গে রাখেন এবং অস্বাভাবিক মাত্রায় লবণ খেয়ে চলেছেন।

৭। অদ্ভুত হলেও সত্য, ১ পাউন্ড মাকড়সার জালের তন্তু পাশাপাশি সাজালে দু'বার পৃথিবী ঘুরে আসা যায়।

৮। শ্রীলঙ্কা মশা দমন করার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ করে।

৯। ম্যাচের আগে লাইটার আবিষ্কৃত হয়।

১০। তেলাপোকা মাথা ছাড়া ৯ দিন বাঁচতে পারে, এরপর মারা যায়।

১১। মানুষের চোখ আলাদা করে ১০ মিলিয়ন রং শনাক্ত করতে পারে।

১২। বিদ্যুৎ চমকানোর সময় আমাদের শরীরে আঘাত করলে শরীরের তাপমাত্রা হবে ২,৮০,০০০ ডি.সে. যা পৃথিবীতে পৌঁছানো সুর্যের প্রখরতার চেয়ে বেশি।

১৩। দূর মহাকাশে এমন জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া গেছে যেখান থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ১৫ কোটি বছর।

১৪। পুরুষ ক্যানারি পাখি মানুষের মতো গাইতে পারে।

১৫। শান্তিতে প্রথম নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখানকারী একমাত্র ব্যক্তি হলেন লি ডাক থো (ভিয়েতনাম ১৯7৩)

বাস্তবে কিছু সত্য রয়েছে যা আমাদের অজানা এবং অনেকটা অবিশ্বাস্য। যেমন-

১। মানুষের বয়স যতদিন ৭০ বছর হয় ততদিনে সে পানি খায় প্রায় ১২ হাজার গ্যালন।

২। একজন মানুষ সারাজীবনে প্রায় ৬০,০০০ পাউন্ড খাবার খায়, যা কি না গোটা ছয়েক হাতির সমান

৩। আইসক্রিম প্রথম আবিষ্কার
হয় চীনে, হযরত ঈসা (আ) এর জন্মের ২,০০০ বছর আগে।

৪। পূর্ণ বয়স্ক একজন মানুষের দেহে যে পরিমাণ চর্বি থাকে তা দিয়ে আস্ত একটা কাপড় কাচার সাবান এবং ৭৬ টি মোমবাতি তৈরি করা যাবে।

৫। পূর্ণ বয়স্ক একজন মানুষের দেহে যে পরিমাণ ফসফরাস আছে তা দিয়ে কমপক্ষে ৮০০টি দিয়াশলাই তৈরি হতে পারে।

৬। যে পরিমাণ কার্বন আছে একজন পূর্ণ বয়স্ক মানব দেহে তা দিয়ে ৯ হাজার শীষ পেন্সিল তৈরি করা যায়।

৭। সাতটি ভাষায় সপ্তাহের সাত দিনের নাম-

বাংলা	ইংরেজি	আরবি	স্পেনিস	জার্মানি	ফরাসি	ইতালি
শনিবার	স্যাটারডে	ইয়াওমুল সাবতি	সাবডে	সেম্মাবেন্ত	সায়েদি	সাবাতো
রবিবার	সানডে	ইয়াওমুল আহাদি	জেসিকো	সন্টানা	ডমনিসি	জোমিনাকো
সোমবার	মানডে	ইয়াওমুল ইসনাইন	লুসেন	নয়টাক	লুদ্দি	লুনোদি
মঙ্গলবার	টুইসডে	ইয়াওমুল সালাসাই	সাটেস	ডিসভাগ	মাদ্দি	মাতেদি
বুধবার	ওয়েডনেসডে	ইয়াওমুল আরবাআ	মিকোনেস	সিত্ত্বমা	চমমেদ্দি	মের্কলেদি
বৃহস্পতিবার	থার্সডে	ইয়াওমুল খামেসি	জুডেস	ডুগারটাগ	জুদ্দি	জিওবেদি
শুক্রবার	ফ্রাইডে	ইয়াওমুল জুময়াতি	ভানেস	ফ্রিনটগ	ভেনফিদ্দি	ভেনেদ্রি

৮। মিসিল দ্বীপের ভাইনসিয়াম রাজা জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে চুল দাড়ি কাটতেন।

৯। বিখ্যাত সুরকার বিটোফেন নিজের তৈরি সুর কোনোদিন শুনুতে পান নি। কারণ তিনি বধির ছিলেন।

১০। সাগরের পানিতে যে পরিমাণ লবণ আছে তা দিয়ে পৃথিবীর সব দেশকে ৪৯০ ফুট পুরু করে ঢেকে দেয়া যাবে।

১১। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী হল পিঁপড়া। কেন না এরা নিজের ওজনের তুলনায় ২০গুণ ভারী জিনিস বহন করতে পারে।

১২। গ্রেট ব্রিটেনে এত মিউজিয়াম আছে যে, প্রতিদিন একটি করে দেখলে সবগুলো দেখতে ৫ বছর লেগে যাবে।

আধুনিক বাক্য সংকোচন

বইয়ে তো অনেক বাক্য সংকোচন পড়েছি। নিম্নে কয়েকটি আধুনিক জীবনে বাক্য সংকোচন দেয়া হলোঃ-

১। যা সহজে ভাঙ্গে -বিশ্বাস

২। কর্মে অতিশয় তৎপর - ছিনতাইকারি

৩। যার দিনে দিনে পরিবর্তন ঘটে - ফ্যাশন

৪। কোথাও ভয় নেই যার - ট্রাক ড্রাইভার

৫। যা চিন্তা করা যায় না - যানজটমুক্ত ঢাকা

৬। যার অভাব নেই - ভিক্ষুক
৭। যা পূর্বে ছিল এখন নেই - সততা
৮। যা বিনামূল্যে পাওয়া যায় - উপদেশ
৯। উড়ে যাচ্ছে যা - সততা
১০। যে ড্রাইভার আমাদের কাজে আসে - স্ক্রু ড্রাইভার।

আশ্চর্য মিল

মোঃ রিমন হোসেন

শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ২৮৮১৩

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, দুই বিখ্যাত মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন ও কেনেডির মাঝে বেশ কিছু মিল রয়েছে।

১। লিঙ্কন ও কেনেডি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন যথাক্রমে ১৮৬০ সাল ও ১৯৬০ সালে।

২। উভয় প্রেসিডেন্ট স্ব-স্ব পত্নীর সামনে শুক্রবার নিহত হন।

৩। এই দুই প্রেসিডেন্টকে পেছন থেকে মাথায় গুলি করা হয়।

৪। এই দুই প্রেসিডেন্টের স্থলাভিষিক্ত হন জনসন নামের দু'জন। আবার উভয় জনসনই দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী ও সিনেটের সদস্য।

৫। লিঙ্কনের হত্যাকারী জনবুথ ও কেনেডির হত্যাকারী লীহারভে উভয়ের জন্ম দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে।

৬। ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থার উভয় প্রেসিডেন্ট তাদের একটি করে সন্তান হারান।

৭। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের সেক্রেটারির নাম ছিল কেনেডি এবং প্রেসিডেন্ট কেনেডির সেক্রেটরির নাম ছিল লিঙ্কন।

৯। উভয় আততায়ীর নাম John Wilkes Booth এবং Lee Harvey Oswald লিখতে ইংরেজি ১৫টি করে অক্ষর ব্যবহৃত হয়। সত্যিই আশ্চর্য। তাই না?

Digital বাক্য সংকোচন

মোঃ রাসেল

শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩০৯৯৫

১। যা ছাড়া বাঁচা যায় না = শব্দ
২। যার কোথাও ভয় নেই = ট্রাক ড্রাইভার
৩। দৈনন্দিনের সঙ্গী = লোডশেডিং
৪। যা সহজে পাওয়া যায় না = উপদেশ
৫। যা নিতে টাকা লাগে না = মারধর।
৬। যে কাজ করতে বেশি ঘুম পায় = লেখাপড়া।
৭। চাকরি পেতে সহায়ক = ঘুষ।
৮। যিনি বক্তৃতা দানে পটু = দলের নেতা।
৯। দেশে অভার নেই যার = ভিক্ষুক।
১০। কর্মে তৎপর যিনি = ছিনতাইকারি।
১১। দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে যা = ফ্যাশন।
১২। আপনার রং লুকায় যে = রাজনীতিবিদ।
১৩। টাকার কুমির = দুর্নীতিবাজ।
১৪। নষ্ট করার মাধ্যম = ইন্টারনেট।

প্রাণীর বিচিত্র কিছু তথ্য

জেবা আতুকীয়া

শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ২৭৫৮২

১। প্রজাপতি স্বাদ নেয় তাদের পায়ের সাহায্যে।

২। কেঁচোর কোন হৃদপিণ্ড নেই।

৩। কুমিরের দাঁত যতবার পড়ে, ততবারই ওঠে।

৪। উটের পিঠের কুঁজে পানি জমা থাকে না, থাকে চর্বি।

৫। বাগদা চিংড়ি পেছন দিকেও সাঁতরাতে পারে।

৬। কান নাড়াতে ৩২টি পেশি ব্যবহার করে বিড়াল। আর মানুষ ব্যবহার করে মাত্র ছয়টি পেশি।

৭। উটপাখির চোখ তাদের মগজের চেয়েও বড়।

৮। জায়ান্ট স্কুইডের একেকটি চোখ প্রায় ভলিবলের সমান হতে পারে।

৯। একটি নবজাতক ক্যাঙ্গারু এত ছোট থাকে যে সেটিকে একটি চামচে তুলে নেয়া যাবে।

১০। পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে পিঁপড়ার সংখ্যা বেশি।

১১। ঘোড়ার দাঁত ৪০টি।

অজানা কিছু তথ্য

জেবা আতুকীয়া

শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ২৭৫৮২

১। বিশ্বের কয়েকটি দেশে এমন লাইব্রেরিও আছে, যেখানে বইয়ের বদলে মানুষ ধার নেয়া যায়। সেই মানুষ গল্প পড়ে শোনায়।

২। তোমার শ্বাসের সঙ্গে যদি খুদে একট মটরদানা ঢুকে যায়, তা হলে ফুসফুসে সেটি থেকে গাছ জন্মাতে পারে।

৩। বড় বড় শব্দের প্রতি ভয় পাওয়াকে বলে-Hippopotomonstrosesquippedaliophobia. ভয় না পেয়ে উপায় আছে!

৪। ইথিওপিয়ান ক্যালেন্ডারে মাসের সংখ্যা ১৩। তাই ২০১৩ সালে এ ক্যালেন্ডারে কেবল ২০০৬ সাল শুরু হয়েছে। তাদের নববর্ষ পালিত হয় ১১ সেপ্টেম্বরে।

৫। শনি গ্রহকে যদি পানিতে রাখা সম্ভব হতো, তা হলে গ্রহটি

ডুবত না। পানিতে দিব্যি ভেসে থাকত।
৬। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের স্থানীয় ভাষার বর্ণমালার অক্ষর মাত্র ১৩ টি।
৭। উত্তর আমেরিকার চিপপেওয়া ইন্ডিয়ানদের ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল ভাষা।
৮। ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয়।
৯। বিষুবরেখা ও নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা দিন ও রাত সমান।
১০। জর্ডানে অবস্থিত মৃত সাগরের পানির ঘনত্ব এত বেশি যে মানুষ সেখানে ডোবে না।

৭ নিয়ে কারবার

মোঃ রাসেল
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩০৯৯৫

বিশ্ববরেণ্য কবি, সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা ৭ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন:
* কবির জন্ম মে মাসের ৭ তারিখ।
* বাংলা ২৫ বৈশাখ কবির জন্মদিন। অর্থাৎ ২+৫ = ৭
* কবি মারা যান আগস্ট মাসের ৭ তারিখ।
* কবির প্রথম কবিতার অভিষেক ঘটে ৭ বছর বয়সে।
* ইংরেজিতে কবির জন্ম সাল ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ ১+৮+৬+১+ = ১৬ বা, ১+৬ = ৭
* বাংলায় কবির জন্ম সাল ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ। অর্থাৎ ১+৩+৪+৮ = ১৬, ১+৬ = ৭

গণিতের মজা

মাহামুদুল হাসান নাবিল
শ্রেণি :একাদশ, রোল : ৩২২২৬

৯ সংখ্যাটি একটি মজার সংখ্যা। যেমন ৯ কে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যে গুণফল হয় সেই গুণফলের সংখ্যাগুলো যোগ করলে যোগফল ৯ হয়।

৯ x ৯ = ৮১, ৮+১ = ৯
৯ x ৮ = ৭২, ৭+২ = ৯
৯ x ৭ = ৬৩, ৬+৩ = ৯
৯ x ৬ = ৫৪, ৫+৪ = ৯
৯ x ৫ = ৪৫, ৪+৫ = ৯
৯ x ৪ = ৩৬, ৩+৬ = ৯
৯ x ৩ = ২৭, ২+৭ = ৯
৯ x ২ = ১৮, ১+৮ = ৯
৯ x ১ = ০৯, ০+৯ = ৯

অন্যদিকে ৯ কে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করে গুণফলকে আবার ১২৩৪৫৬৭৮৯ দিয়ে গুণ করলে যে গুণফল হয় সেই গুণফলের প্রথমবার যে সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয়েছিল সে সংখ্যাই থাকবে।

৯ x ১ = ৯, ৯ x ১২৩৪৫৬৭৮৯ =১১১১১১১১১
৯ x ২ = ১৮, ১৮ x ১২৩৪৫৬৭৮৯ = ২২২২২২২২২
৯ x ৩ = ২৭, ২৭ x ১২৩৪৫৬৭৮৯ = ৩৩৩৩৩৩৩৩৩
৯ x ৪ = ৩৬, ৩৬ x ১২৩৪৫৬৭৮৯ = ৪৪৪৪৪৪৪৪৪
৯ x ৫ = ৪৫, ৪৫ x ১২৩৪৫৬৭৮৯ = ৫৫৫৫৫৫৫৫৫
৯ x ৬ = ৫৪, ৫৪ x ১২৩৪৫৬৭৮৯ = ৬৬৬৬৬৬৬৬৬
৯ x ৭ = ৬৩, ৬৩ x ১২৩৪৫৬৭৮৯ = ৭৭৭৭৭৭৭৭৭
৯ x ৮ = ৭২, ৭২ x ১২৩৪৫৬৭৮৯ = ৮৮৮৮৮৮৮৮৮
৯ x ৯ = ৮১, ৮১ x ১২৩৪৫৬৭৮৯ = ৯৯৯৯৯৯৯৯৯

আরেকটি মজার সংখ্যা হলো ১০৮৯। ৩ ঘরের যে কোনো একটি সংখ্যা ১ থেকে ৯ অঙ্কগুলোর মধ্যে পরপর তিনটি ক্রমিক অঙ্ক নিয়ে গঠিত তার অঙ্কগুলোকে উল্টো পাশ থেকে সাজিয়ে লেখে ৩ ঘরের সংখ্যাটির সঙ্গে বিয়োগ করলে যে বিয়োগফল পাওয়া যায় তার অঙ্কগুলোকে আবার উল্টোদিক থেকে সাজিয়ে লেখে বিয়োগ ফলের সঙ্গে যোগ করলে সব সময় ১০৮৯ই পাওয়া যাবে। যেমন: ১২৩ কে উল্টো দিক থেকে সাজালে হয় ৩২১।
এখন ৩২১-১২৩ = ১৯৮
১৯৮ কে উল্টো দিক থেকে সাজালে হয় ৮৯১।
এখন ১৯৮+৮৯১ = ১০৮৯
আরেকটি লক্ষণীয় বিষয়

১০৮৯ x ১ = ১০৮৯ ১০৮৯ x ৯ = ৯৮০১
১০৮৯ x ২ = ২১৭৮ ১০৮৯ x ৮ = ৮৭১২
১০৮৯ x ৩ = ৩২৬৭ ১০৮৯ x ৭ = ৭৬২৩
১০৮৯ x ৪ = ৪৩৫৬ ১০৮৯ x ৬ = ৬৫৩৪
১০৮৯ x ৫ = ৫৪৪৫ ১০৮৯ x ৫ = ৫৪৪৫

এখানে বাম দিকের গুণফলগুলোর অঙ্কগুলোর বিন্যাস ডান দিকের গুণফলগুলোর অঙ্কগুলোর বিন্যাসের উল্টো।

আমাদের বাংলাদেশ

রিতা ইসলাম

শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩০৪৭২

ছোট একটি দেশ "বাংলাদেশ"। তবে গর্ব করার মতো এমন অনেক কিছুই আছে যা আমি আপনি অনেকেই জানতাম না। জেনে নেয়া যাক আজ আমাদের স্বদেশ সম্পর্কে।

* বিশ্বের সুখী রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১ তম।
* পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের স্থান কক্সবাজার।
* বৃহত্তর সিলেট এখনও দ্বিতীয় লন্ডন হিসেবে বিশ্ব দরবারে পরিচিতি।
* প্রধান এবং একমাত্র ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আমাদের বাংলাদেশেই।
* "মসজিদের শহর" এখনও ঢাকা-ই আছে।
* পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার একমাত্র বাংলাদেশেই।
* আমরাই পৃথিবীর একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছি।
* ক্রিকেটে বিশ্বের এক নম্বর অল রাউন্ডার সাকিব আমাদের দেশেরই।
* বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ।
* You tube আবিষ্কারক তিনজনের একজন জাবেদ করিম বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত।

"অথচ আমরা শুধু চেঁচাই আমাদের কিছুই নেই"।

বিচিত্র জ্ঞানের সমাহার

মোঃ সোহানুর রহমান সোহান

রোল : ২৯৬৮২, শ্রেণি : দ্বাদশ

আইফেল টাওয়ারের কিছু কথা

ফ্রান্সে অবস্থিত বিশ্ববিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে আইফেল টাওয়ার অন্যতম। ১৮৮৭ সালের ২৮ জানুয়ারি শুরু হয়েছিল ফাইফেল টাওয়ারে নির্মাণাযজ্ঞ। এ টাওয়ারের পাদদেশে ফ্রান্সের ৭২ জন বিখ্যাত লেখক, কবি ও বিজ্ঞানীর নাম খোদাই করা আছে। পরিষ্কার আবহাওয়ায় আইফেল টাওয়ারের সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে আশেপাশের প্রায় ৪২ মাইল এলাকা দেখতে পাওয়া যায়। তাপমাত্রার তারতম্য আইফেল টাওয়ারের উচ্চতা ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত বাড়ে-কমে। ঝড়ো বাতাসে টাওয়ারটি ১৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হেলতে পারে। ২০০৭ সালে এক নারী আইফেল টাওয়ারকে বিয়ে করেন এবং নিজের নাম বদলে রাখেন এরিকা আইফেল। আইফেল টাওয়ারের প্রতি সাত বছর পর পর নতুন রং করা হয়। সম্পূর্ণ আইফেল টাওয়ার রাঙাতে লাগে প্রায় ৬০ টন রং। ২০১৩ সালে আইফেল টাওয়ারকে রাঙানো হয় ব্রোঞ্জ রঙে।

বিচিত্র তথ্য

পাখিদের খাবার চিবানোর কাজটি হয় পাকস্থলীতে।
জেলিফিশের শতকরা ৯৫ ভাগই পানি।
ছবি দেখে এক ভেড়া আরেক ভেড়াকে চিনতে পারে।
দুনিয়ার তিন ভাগের দুই ভাগ বেগুন জন্মায় নিউজার্সিতে।
সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে পারে গরু, কিন্তু নিচে নামতে পারে না।
বাঘের ডোরাকাটা দাগ কিন্তু পশমে নয়, চামড়ায়।

মোঃ রকিবুল ইসলাম

শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩২৩২৬

বিষয় : সাধারণ জ্ঞান

১। বিশ্বে প্রথমবারের মতো পাটের জিন নকশা উন্মোচন করে কোন দেশের বিজ্ঞানী?
(ক) চীন (খ) ভারত (গ) বাংলাদেশ (ঘ) কানাডা। উত্তর: (গ)
২। ম্যাপল পাতার দেশ কোনটি?
(ক) কানাডা (খ) কিউবা (গ) চীন (ঘ) জাপান। উত্তর (ক)
৩। G.C.C-এর সদস্য দেশ কয়টি?
(ক) ৪টি (খ) ৬টি (গ) ৮টি (ঘ) ১০টি। উত্তর: (খ)
৪। নেপালি সৈন্যদের বলা হয়– (ক) গুর্খা (খ) টাইগার (গ) বিএসএফ (ঘ) নাসাকা। উত্তর: (ক)
৫। লাগোস, কোন দেশের রাজধানী?
(ক) নামিবিয়া (খ) মরিসাস (গ) নাইজেরিয়া (ঘ) কাজাকিস্তান। উত্তর : (গ)

পৃথিবীর বিচিত্র যত তথ্য

মাহমুদুল হাসান নাবিল
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩২২২৬

প্রাণিজগতের বিচিত্রতা :

১। পিঁপড়া। পরিশ্রমী পিঁপড়াদের সঙ্গে কমবেশি সবাই পরিচিত। কিন্তু অনেকে জেনে অবাক হবেন পিঁপড়ারা কখনো ঘুমায় না।

২। পিঁপড়া পানির নিচে দুই দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।

৩। জিরাফের জিহ্বা এতই লম্বা যে, সে তার কান পরিষ্কারের কাজে এ লম্বা জিহ্বা ব্যবহার করে থাকে।

৪। অদ্ভুত কিন্তু সত্য, হাতির বাচ্চা দিনে প্রায় ৮০ লিটার দুধ পান করতে পারে।

৫। প্রায় ২০ হাজার প্রজাতির মৌমাছির মধ্যে মাত্র চার প্রজাতির মৌমাছি মধু তৈরি করতে পারে। বাকিরা পারে না।

৬। অদ্ভুদ হলেও সত্য, পানি ছাড়া একটি ইঁদুর একটি উট থেকে বেশি সময় পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

৭। বিড়াল আমাদের অতি পরিচিত একটি প্রাণী। অন্ধকারে আমরা তেমন না দেখলেও একটা বিড়াল অন্ধকারে মানুষ থেকে ছয়গুণ ভালো দেখতে পারে।

৮। একটি কাঠঠোকরা সেকেন্ডে প্রায় ২০বার পর্যন্ত কাঠে ঠোকর দিতে পারে।

অদ্ভুদ ঘটনাগুলো :

১। ক্যালিফোর্নিয়ায় ডিড্রো অ্যানিরিগ নামে আট বছরের এক বালক ঘুড়ি উড়াচ্ছিল। এ সময় বেশ নিচ দিয়ে যাওয়া একটি বিমানের সঙ্গে তার ঘুড়ির সুতা জড়িয়ে যায়। এতে সে প্রায় ১০ ফুট উচুঁতে উঠে যায় এবং বিমান তাকে ২০০ গজ দূরে নিয়ে যায়।

২। পৃথিবীতে ৭০০ কোটি মানুষ আছে। কেউ যদি তাদের সবার সঙ্গে এক সেকেন্ডের জন্যও দেখা করতে চায় তবে তার ৩২ বছর সময় লাগবে।

৩। শীতল কিছুতে মাথা রেখে ঘুমালে ঘুম ভালো হয়। সে কারণে মানুষ সাধারণত বালিশের শীতল পাশে মাথা রেখে ঘুমাতে যায়।

৪। সুইজারল্যান্ডে ব্যারি নামক এক কুকুর তুষার ঝড়ে আক্রান্ত মানুষ খুঁজে বের করত। একদিন তুষার ঝড়ে আক্রান্ত ৪৪ জন মানুষকে সে বাঁচিয়েছিল।

অন্যরকম আইন :

১। জাপানে কোনো মেয়েকে প্রেমের প্রস্তাব দিলে আইন অনুসারে মেয়েটি না বলতে পারবে না।

২। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসগরীয় নতুন দেশ সামোয়াতে নিজের স্ত্রী জন্মদিন ভুলে যাওয়াটা আইনে সিদ্ধ নয়।

৩। ইন্ডিয়ানায় রবিবারে গাড়ি বিক্রি করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

৪। নেভাদায় বউ পেটানোর সময় ধরা পড়লে আইন অনুসারে তাকে আট ঘণ্টা বেঁধে রাখা হবে। তার বুকের মধ্যে একটা পোস্টার সেঁটে দেয়া হবে, যাতে লেখা থাকবে, 'ওয়াইফ বিটার বা বাংলায় বিশিষ্ট বড় পেটানো বিশেষজ্ঞ।

৫। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনায় সাবান চুরিতে ধরা পড়লে তার শাস্তি হল ওই সাবান দিয়েই নিজেকে ধুতে হবে যতক্ষণ না সাবান পুরো শেষ হয়।

৬। কলোরাডোয় যৌক্তিক কোনো কারণ না দেখিয়ে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করা এক ধরনের চুরি। এটি প্রতারণা অথবা ছিনতাইয়ের পর্যায়ে পড়ে বলে এ দেশের আইনে রয়েছে।

৭। জাপানে ট্রেনের নিচে আত্মহত্যা করলে, আত্মহত্যাকারীর পরিবারকে অর্থদণ্ড জরিমানা করা হয়।

অজানা পারমাণবিক তথ্য

নাজিন মাহ্ফুজ সিয়াম
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ২৮৪৩২

১। বিশ্বে প্রথম পারমাণবিক বোমা তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্র (১৬ জুলাই-১৯৪৫)।

২। বিশ্বে দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমা তৈরি করে রাশিয়া (২৯ আগস্ট ১৯৪৯)।

৩। বিশ্বে তৃতীয় পারমাণবিক বোমা তৈরি করে বৃটেন (৩ অক্টোবর ১৯৫২)।

৪। ইসরাইল পৃথিবীর একমাত্র দেশ যারা পারমাণবিক কর্মসূচির কথা সম্পূর্ণ গোপন রেখেছে।

৫। ২০১৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত ২০৪৮ টির বেশি পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।

৬। সবচেয়ে বেশি পরীক্ষামূলকভাবে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় যুক্তরাষ্ট্র ১০৩২ টি।

৭। মুসলিম বিশ্বে পাকিস্তান বেলুচিস্তানে প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।

৮। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সর্বপ্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা হয়।

পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা কেন ফেল করে?

সালমান আহমেদ

শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ২৯৩১০

পরীক্ষায় ফেল করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা দায়ী নয়। দায়ী হচ্ছে সময়। কারণ বছরে মাত্র ৩৬৫ দিন। একজন ছাত্রের ১ বছরের খতিয়ান দেখলেই তা প্রমাণিত হয়।

১। বছরে শুক্রবার ৫২ দিন। যা বিশ্রামকাল। তা হলে বাকি থাকে ৩১৩ দিন।

২। প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা ঘুমালে বছরে ১২১ দিন তাহলে বাকি থাকে ১৪২ দিন।

৩। খেলা-ধুলায় প্রতিদিন ১ঘণ্টা করে খরচ বাড়ে (অবশ্যই স্বাস্থ্য রক্ষায় খেলাধুলার প্রয়োজন) বছরে ১৫ দিন। বাকি থাকে ১২৭ দিন।

৪। মানুষ সামাজিক প্রাণী। তাই কথাবার্তায় প্রতিদিন ১ ঘণ্টা করে খরচ করলে ১৫ দিন। বাকি থাকে ১১২ দিন।

৫। খাওয়াদাওয়া ২ ঘণ্টা করে বছরে ৩০ দিন। অবশিষ্ট ৮২ দিন।

৬। বছরে ৩ টি সেমিস্টার অনুষ্ঠিত হয় এতে কমপক্ষে ৩৫ দিন খরচ হয় আর বাকি থাকে ৪৭ দিন।

৭। উৎসবের জন্য (ঈদ, পূজা) কমপক্ষে ৪০ দিন ছুটি থাকে। বাকি থাকে ৭ দিন।

৮। দেবতা যেহেতু নই অসুস্থ হতেই পারি তার জন্য ৪ দিন, বাকি থাকে ৩ দিন।

৯। সিনেমা, নাটক অনুষ্ঠান দেখার জন্য যায় ২ দিন। অবশিষ্ট থাকে ১ দিন।

১০। আর ঐ এক দিন (১) ই হল আমার জন্মদিন।

তাইতো ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় ফেল করে।

বি:দ্রঃ "ঢাকা কমার্স কলেজের কোন ছাত্র-ছাত্রী উপরের খতিয়ান ভুলেও চিন্তা করে না"।

জানা অজানা তথ্য

জমি মন্ডল

শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩১৫০৩

১। আমেরিকার ৪১ জন প্রেসিডেন্টের মধ্যে ৯জনই কলেজ পর্যন্ত যেতে পারেন নি।

২। একজন মানুষের শরীরে চামড়ার পরিমাণ হচ্ছে ২০ বর্গফুট।

৩। বাংলাদেশের পূর্বের ২ টাকার নোট পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নোট বলে ঘোষিত হয়েছে।

৪। তেলাপোকা তার মাথা ছাড়া ৯ দিন বাঁচে।

৫। ফ্রান্সের প্যারিসে রাবারের রাস্তা আছে।

৬। জিরাফ একমাত্র প্রাণী, যার জন্মের সময়ই শিং থাকে।

৭। চীনের মহাপ্রাচীর একমাত্র স্থান যা চাঁদ থেকে দেখা যায়।

৮। দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর অ্যাঙ্গোলার লুয়ান্ডা।

৯। পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দেহে যে পরিমাণ তড়িৎ আছে তা দিয়ে ২৫ পাওয়ারের ১টি বাল্ব অন্তত ৫ মিনিট জ্বালিয়ে রাখা যাবে।

—†KŠZzK —avuav I —ig¨ iPbv

নাম	লেখক
আধুনিক যুগে এক কথায় প্রকাশ	মো: রাসেল
....	সামি ইসলাম
....	মো: আরিফুর রহমান
একটি ছাত্রের মৌখিক পরিক্ষা	....
একটি ভাঙা সেতু পার হচ্ছে মা আর ছেলে	মোঃ রাজু আহমেদ
....	কানিজ পারভিন অর্থী
....	সামি ইসলাম
....	আফরা ফারহানা
	মোঃ সোহাগ ভূইয়া
খোঁজ দ্য সার্চ	রত্না খানম
....	আব্দুল কাদের
পাস করা বড়ই কঠিন	....
....	সৈয়দা আফসানা খানম
....	কায়েস ঢালী নির্জন
....	মাহমুদ হাসান মাহ্দী
....	মোঃ রাসেল
....	আশিকুল ইসলাম (রাকিব)
....	আব্দুল কাদের
....	ফারজানা আক্তার
....	জেবা আতুকীয়া
....	রিতা ইসলাম
....	জান্নাতুল ফেরদাউস (রথী)
....	সুমাইয়া আক্তার (মেঘলা)
....	সুমি
....	সোহানুর রহমান সোহান
....	মোঃ শামীম আল মামুন (সৌমিক)
....	মোঃ আশরাফুল আলম
....	প্রিয়া বাগ্চী
....	মোঃ রায়হান চৌধুরী শিফাত
....	শ্রাবণ আরেফিন
....	সুমাইয়া ইয়াসমিন দিপা
কালো পাথড়ে চুম্বন	আব্দুল কাদের
কচ্ছপ, খরগোশ ও একটি স্মার্টফোন	আশফাক মাসুদ দিব্য

আধুনিক যুগে এক কথায় প্রকাশ

মো: রাসেল
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩০৯৯৫

১। অহংকার নেই যার - পুস্তক।
২। যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে - সন্ত্রাস।
৩। উড়ে যাচ্ছে যা - সততা।
৪। হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ যে বন - সমাজ।
৫। মমতা নেই যার - মশা।
৬। কোথাও হতে ভয় নেই যার - ট্রাক-ড্রাইভার।
৭। অনেক কষ্টে যেখানে যাওয়া যায় - সদরঘাট।
৮। কর্মে তৎপর যিনি - ছিনতাইকারি।
৯। খাইবার যোগ্য - ঘুস।
১০। যা অবশ্যই ঘটবে - হরতাল।
১১। যা অতি কষ্টে লাভ করা যায় - চাকরি।
১২। যা নিয়ত পরবর্তন হচ্ছে - নকলের কায়দা।

সামি ইসলাম
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩১২২১

পাঁচ অক্ষরে নাম যার একটি দেশের নাম হয়, মাঝের অক্ষর বাদ দিলে দুইটি ফলের নাম হয়।
উত্তর: বেলজিয়াম।

মো: আরিফুর রহমান
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩২০৭২

ঘর আছে তার
দরজা নেই।
মানুষ আছে তার
শব্দ নেই। কবর।

চার অক্ষরে নাম তার,
যেথা সেথা ঘোরে।
প্রথম দুটো বাদ দিলে,
টোপর মাথায় পড়ে। যাযাবর।

জলের মধ্যে জন্ম তার,
জলে ঘরবাড়ি।
মোল্লা নয়, মুনসি নয়,
মুখে আছে দাঁড়ি। চিংড়ি মাছ।

তিন অক্ষরে নাম তার সর্বাঙ্গ কালো,
মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে খেতে লাগে ভালো কয়লা।

দিন রাত পড়ে থাকে,
লাথি মারলে চলে।
গ্রামের মধ্যে থাকে,
সে কথা নাহি বলে। ঢেঁকি।

না মিললে হবে না,
ভেবে চিন্তে বলো না। হিসাব।

দুই অক্ষরে নাম তার,
মাছ ধরে খায়।
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে,
বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম অক্ষর হয়। বক।

একটি ছাত্রের মৌখিক পরিক্ষা

মোঃ রাজু আহমেদ
রোল: ৩২০২৪, শ্রেণি : একাদশ

স্যার: নেপোলিয়ান কোন যুদ্ধে মারা যান?
ছাত্র: জীবনের শেষ যুদ্ধে।

স্যার: ভারতের স্বাধীনতা চুক্তি কোথায় সই হয়েছিল?
ছাত্র: চুক্তিপত্রের একেবারে নিচের দিকে।

স্যার: তুমি কলেজে কখন এসেছ?
ছাত্র: কলেজ খোলা থাকা অবস্থায়।

স্যার: ব্রেকফাস্টে কী কী খাওয়া যায় না?
ছাত্র: শুধু লাঞ্চ আর ডিনার।

স্যার: একজন মানুষ কিভাবে ৮ দিন না ঘুমিয়ে কাটাতে পারে?
ছাত্র: ৮ রাত ঘুমিয়ে।
স্যার: ৮ জন মানুষ যে বাড়ি ১৮ দিনে তৈরি করেছে। ২ জন মানুষ সেই বাড়ি তৈরি করতে কত দিন লাগবে?
ছাত্র: একদিনও লাগবে না। কারণ বাড়ি তো বানানোই আছে।

একটি ভাঙা সেতু পার হচ্ছে মা আর ছেলে

মা: আমার হাত ধরো।
ছেলে: না, মা, তুমি আমার হাত ধরো।
মা: (অবাক হয়ে) কেন? পার্থক্য কোথায়?
ছেলে: (মৃদু হেসে) আমি যদি তোমার হাত ধরি কোন সমস্যা হলে আমি হাত ছেড়ে দিতে পারি কিন্তু তুমি যদি আমার হাত ধরো আমি জানি যত বড় সমস্যাই হোক তুমি ঐ হাত কখনোই ছাড়বে না।
মা: তোমাকে ভালোবাসি।

কানিজ পারভিন অর্থী

রোল : ৩০৩৭০, শ্রেণি : একাদশ

আমি একদিন পার্কে হাটছিলাম এমন সময় দেখি আমার এক পরিচিত চাচা উলটা হয়ে হাটছে। আমি বললাম, চাচা আপনি উলটা হয়ে হাটছেন কেন?
চাচা উত্তরে বললেন, ওজন কমানোর জন্য ডাক্তার হাটছে বলেছিলো। তো হাটা-হাটি করার কয়েক দিন পর ওজন দিয়ে দেখি বেশি কমে গেছে। তাই এখন আবার উলটা হাঁটছি।

সামি ইসলাম

রোল: ৩১২২১, শ্রেণি: একাদশ

প্রেমিকা: তুমি আমার জন্য কি জীবন দিতে পারবে?
প্রেমিক: হ্যাঁ, পারবো।
প্রেমিকা: তা হলে দিয়ে দাও।
প্রেমিক: পানি এগিয়ে দিলো।
প্রেমিকা: এটা কেন করলে?
প্রেমিক: কেন, তুমি জানো না, পানির আরেক নাম জীবন!

ক্রেতা: গতকাল আমি এনার্জি সেভিং বাল্ব কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। কোনো ভাবেই জ্বললো না।
বিক্রেতা: আলো জ্বলার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? প্যাকেটে তো লেখাই আছে এনার্জি সেভিং বাল্ব। এক বছরের ওয়ারেন্টি।

আফরা ফারহানা

রোল: ২৭৬০৫, শ্রেণি: দ্বাদশ

স্ত্রী: দেখ বাইরে থেকে একটা জুতো এসে ঘরে পড়ল।
স্বামী: তুমি গাইতে থাক, অপর জুতোটাও চলে আসবে।

এক ব্যক্তি রেলওয়ে প্লাটফর্মে পায়চারি করছিল। সে এক বগিতে উঁকি দিয়ে দেখে খুব মোটা এক ব্যক্তি একটা পুরো বেঞ্চ জুড়ে শুয়ে আছে। লোকটা রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করল, “এ বগীটা কি শুধু হাতিদের জন্য?
মোটা ব্যক্তি- না না, তা হবে কেন? ঘোড়া, গাধা, কুকুর, ছাগল সবার জন্যই আসুন আসুন বসুন!

ডাক্তার (রোগীর প্রতি) - আপনি বলুন তো আপনি কি সব সময় তোতলান। রোগী - কিছুক্ষণ ভেবে বলল না ন না ডা ডা ক তা আর, শু শু ধু যখন আমি ক ক থা বলি।

একবার ক্লাসে শিক্ষক ছাত্রদের বললেন, “তোমরা কয়েকটি বড় বড় শব্দ বল।”
মাহমুদা: পর্যালোচনা।
শিক্ষক : সাদিয়া, বলো তুমি।
সাদিয়া :বিকৃত মস্তিষ্ক।
শিক্ষক : বেশ, তুমি বল।
রেহানা : রবার।
শিক্ষক : এ শব্দটাতো তত বড় নয়।
রেহানা : কিন্তু টানলে খুব বড় হয় স্যার।

একটা বাচ্চা ছেলে জীবনে প্রথম সাপ দেখে চেঁচিয়ে উঠল, “মা, মা শিগগির এস, দেখ এখানে লেজ লড়ছে কিন্তু কুকুর নেই।”

টাই কিনতে গিয়েছেন একজন ভদ্রলোক, দোকানিকে জিজ্ঞেস করলেন, টাই আছে?
দোকানি : আছে। কী রকম চাই বলুন?
ভদ্রলোক : কফি রঙের একটা দিন তো - ঠিক কফির সঙ্গে দুধ মেলালে যেমন হয়।
দোকানি : বেশ চিনি দেওয়া না চিনি ছাড়া।

মা : তোমাকে আমি বার বার বলেছি যে, আর সন্দেশ দেবো না, তবু কেন তুমি আমাকে বিরক্ত করছ?
ছেলে: তুমিই তো বলেছিলে, “একবার না পারিলে দেখ শতবার।”

স্কুলে বাৎসরিক পরীক্ষা দিয়ে এসেছে তোরণ। আব্বা জিজ্ঞেস করলেন, ‘সবগুলো শব্দের লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পেরছ তো তোরণ?’
তোরণ: জী না আব্বা, ভীষণ শক্ত সব শব্দ আমি শুধু একটি পেরেছি।
আব্বা: কোনটা লিখেছ তুমি?
তোরণ: রূপবান। লিঙ্গ পরিবর্তন করে লিখেছি “রহিম।”

একজন: বাথরুমে আমার গাইবার অভ্যাস আছে।
অপরজন: আমাদের বাড়ীত সবাই, মা, বাবা, দিদি, ছোট বোনেরা, ভাইয়েরা ও আমি মানে সবাই বাথরুমে গান গেয়ে থাকি।
একজন: গানের ভক্ত ফ্যামিলি বুঝি তোর? গাইবার আনন্দে বুঝি গান করে সবাই?
অপরজন: না, আসলে গাইবার আনন্দে গান করে না। নাইবার প্রয়োজনে গান গাইতে হয়। কারণ আমাদের বাথরুমে দরজাটা আটকানো যায় না তো।
গোল বাবু: কী আমার রান্না খেতে কেমন হয়েছে?
গোলাপ মিয়া: একদম স্বপ্নের মতো।
গোল বাবু: ও, এত ভাল লেগেছে তা হলে
গোলাপ মিয়া: না মানে, স্বপ্নে কিছু খেলে যেমন কোনো স্বাদ লাগে সে রকম লেগেছে।

এক ভদ্রলোক অনেক কষ্ট করে আমেরিকা গেলেন। একদিন তার ঘরের বেড়া কেটে এক চোর ভেতরে ঢুকল। ভদ্রলোক টের পেয়ে পুলিশের কাছে ফোন করলেন। কিন্তু তিনি ভালো ইংরেজি জানেন না। তো ফোন করে বললেন-হ্যালো পুলিশ ষ্টেশন?
অপরদিক থেকে বললেন-ইয়েস। ইন্সপেক্টর স্পিকিং।
তখন তিনি বললেন-কাটিং দ্যা বাঁশের বেড়া, ঢুকিং দ্যা চোর; লয়িং দ্যা আসবাবপত্র, গোয়িং দ্যা ডোর।
তখন ইনসপেক্টর বললেন-হোয়াট ইজ বাঁশের বেড়া?
তখন ভদ্রলোক বললেন–বাঁশের বেড়া ইজ খাঁড়া খাঁড়া ওপর দিয়ে পেরেক মারা। ইট ইজ কলড বাঁশের বেড়া।

এক শিক্ষক সিলেটি এক ছাত্র আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন?
শিক্ষক : বলো তো বাবা Hors এর বাংলা কী?
আব্বাস : গুড়া।
শিক্ষক : গুড়া, আচ্ছা Tum এর বাংলা কী
আব্বাস : গুড়া।
শিক্ষক : কিছুটা রেগে গিয়ে তা হলে Powder মানে কী?
আব্বাস : গুড়া।
পুরো রেগে গিয়ে শিক্ষক বললেন : সবকিছু গুড়া নাকি?
আব্বাস : হ্যাঁ স্যার; একটা লাফাইন্যা গুড়া, একটা মুড়াইন্যা গুড়া আর শেষেরটা গুড়া–গুড়া।

মোঃ সোহাগ ভূইয়া

রোলঃ ২৯২২১, শ্রেণিঃ দ্বাদশ

১। শিক্ষক: রহিম বল তো রোম শহর কখন তৈরি হয়েছিল?
ছাত্রঃ রাতে স্যার।
শিক্ষক: তার মানে? কী বলতে চাও তুমি?
ছাত্রঃ কেন স্যার? একটু আগে আপনিই তো বললেন। Rome was not built in a day.

২। কথা হচ্ছে দুই বন্ধুর মধ্যে:
১ম বন্ধু: আচ্ছা বল তো, হাসপাতালে যখন রোগীর অপারেশন চলে, তখন ডাক্তার তার মুখ ও মাথা ডেকে রাখে কেন?
২য় বন্ধু: অপারেশনে ডাক্তার যদি কোনো ভুল করে ফেলে তাহলে রোগী যেন চিনতে না পারে।

৩। বিজ্ঞান ক্লাস শেষে শিক্ষক ছাত্রকে বললেন:
শিক্ষক: এখন বলতো মরু কাকে বলে?
ছাত্রঃ যেখানে কিছু জন্মায় না।
শিক্ষক: ভাল একটি উদাহরণ দাও তো?
ছাত্রঃ দাদুর মাথা!

৪। গাড়ি কিনতে গেছেন এক কৃপণ। গাড়ি বিক্রেতা বুঝতে পেরে বলল, এটা এক চামচ তেলেও ৫০কিলোমিটার যায়।
কৃপন ঃ কোন চামচ চা চামচ নাকি টেবিল চামচ?
৫। দোকান থেকে একটা তেলের বোতল কিনেই হৈ চৈ বাধিয়ে দিল বাপ্পি, এবার ফ্রিটা দিন।
দোকানি: তেলের বোতলের সাথে কিছুই ফ্রি নেই।
বাপ্পি: বললেই হলো, এই যে তেলের গায়ে লেখা, কোলেস্টরেল ফ্রি।
৬। দুই মায়ের কথোপকথন:
ভাবি আপনার ছেলে পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছে? ৯৫ শতাংশ। ওরে বাবা একাই এত! এই নম্বরে তো আমার দুটো ছেলে পাশ করে যেত।
৭। চার অক্ষরের জিনিস আমি খুশির সময় বাজি
শেষের দুটি অক্ষর কেটে দিলে মানুষের অঙ্গ হয়ে পরি। প্রথম দুটি অক্ষর কেটে দিলে জোড়া দিতে হয়।
মধ্যের দুটি অক্ষর কেটে দিলে সংখ্যায় হয় চার।
উত্তর: হাততালি।

খোঁজ দ্য সার্চ

রত্না খানম

শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩০৩৬২

১ম ব্যক্তি: আচ্ছা আঙ্কেল স্বপ্নধারা বাসাটা কই বলতে পারেন?
২য় ব্যক্তি: অবশ্যই, এখান থেকে সোজা যাবা, গেলে দেখবা দুই দিকে দুইটা গলি গেছে। তুমি ডান দিকটা না বাঁ দিকটায় যাবা।

১ম ব্যক্তি: জি, আচ্ছা
২য় ব্যক্তি: তারপর কিছুক্ষণ হাটার পর দেখবা কোনাকুনি একটা রাস্তা গেছে। সেখানে ডুকবা।
১ম ব্যক্তি: জি।
২য় ব্যক্তি: এরপর ডানে আর একটা গলি সেখানে ডুকবা। এরপর সোজা গেলে একটা বাসা দেখবা নাম কাদের হাউস। ওটাতে ভুলেও ডুকবা না। যাবা ডান দিকটায়। পেয়ে যাবা তোমার স্বপ্নধারা গিয়ে কলবেল বাজলে গেট খুলবে শওকত হোসেন সাহেবের একমাত্র মেয়ে শিপু।
১ম ব্যক্তি: জি, আঙ্কেল। অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আপনার নামটা জানা হলো না....
২য় ব্যক্তি: আমার নামই শওকত হোসেন। তা বাবা ওই বাসায় তোমার কাজটা কী?
১ম ব্যক্তি: না স্যার মানে মানে.......
শিক্ষক: এই বিটু তোমার ড্রইং খাতা কই দেখাও।

ছাত্র: এই তো স্যার আমার গরুর ঘাস খাওয়ার চিত্র।
শিক্ষক: (সাদা কাগজ হাতে) কই তোমার ঘাস।
ছাত্র: স্যার ঘাস তো গরুতে খেয়ে ফেলেছে।
শিক্ষক: তবে রে তোর গরু কোথায়।
ছাত্র: স্যার গরু তো ঘাস খেয়ে দৌড়ে পালিয়েছে।

আব্দুল কাদের
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩১৬৯০

ডাক্তার ও রোগীর মধ্যে কথোপকথন :
ডাক্তার: আমার দেয়া প্রেসক্রিপসন ফলো করেছেন তো?
রোগী: না।
ডাক্তার: কেন?
রোগী: ফলো করলে আমি মরে যেতাম।
ডাক্তার: কেন?
রোগী: প্রেসক্রিপসনটা ছয় তলা থেকে নিচে পড়ে যায়। বুঝুন তা হলে!

সহজ সরল এক কৃষকের বাড়িতে এক গোয়েন্দা হানা দিলেন।
গোয়েন্দা: সরে দাঁড়াও, আজ তোমার বাড়িতে তল্লাসি করব।
কৃষক: তল্লাসি করতে চান, করুন। কিন্তু দয়া করে বাড়ির দক্ষিণ দিকের মাঠটাতে যাবেন না স্যার। কারণ-
গোয়েন্দা: (কৃষককে কারণ বলতে না দিয়ে তাকে নিজের পরিচয়পত্রটা দেখিয়ে) এটা দেখ, এখানে লেখা আছে আমার নাম গোয়েন্দা বাহাদুর! এটা দেখলে যে কেউ ভয়ে কুঁকড়ে যায়! আর তুমি কি না আমার কাজে বাধা দিতে চাও?
(ধমক খেয়ে কৃষক চুপ। গোয়েন্দা তল্লাসি করতে মাঠেই গেল এবং কিছুক্ষণ পর)
গোয়েন্দা: বাঁচাও আমাকে বাঁচাও। কৃষক ছুটে গিয়ে দেখল একটা ষাঁড় গোয়েন্দা বাহাদুরকে তাড়া করছে। কৃষক দূর থেকে-
কৃষক: স্যার, ওকে আপনার পরিচয়পত্রটা দেখান!

দুই বন্ধু:

১ম বন্ধু: এই শ্রবণ যন্ত্রটি দিয়ে আমি কয়েক মাইল দূরের শব্দও স্পষ্ট শুনতে পাই।
২য় বন্ধু: চমৎকার! তা এটা কত দিয়ে কিনলি?
১ম বন্ধু: এইতো, এখন বাজে সাড়ে দশটা।

বাথরুমে বসে বসে শুভ প্রাকৃতিক কাজ করার পাশাপাশি মোবাইল টিপছিল, হঠাৎ মোবাইল পড়ে ভিতরে ঢুকে গেল। আর পাওয়া যাবে না ভেবে মন খারাপ করে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ একটা দৈত্য প্রকট হয়ে-
দৈত্য: কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?
শুভ: মোবাইল ভিতরে পড়ে গেল। একটা সোনার মোবাইল দেখিয়ে-
দৈত্য: এটা তোমার?
শুভ: (কাঠুরিয়া ও জলপরীর গল্প মনে পড়ায়) না, ভাই এটা আমার না।
দৈত্য: চোপ, নাটক কত! রূপকথার গল্প আমরাও পড়ি। এটা তোরই মোবাইল। বিশ্বাস না হলে পানি দিয়ে ধুয়ে এরপর দেখ।

দীর্ঘ ৬ বছর ধরে ৩ পাগলের চিকিৎসা করে এক পাগলের ডাক্তার। তারা ভালো হয়ে গেছে কি না তার পরীক্ষা নিচ্ছে- (১ম পাগলকে)
ডাক্তার: বল তো, ৯ কে ৩ দিয়ে গুণ করলে কত হয়?
১ম পাগল: মঙ্গলবার
ডাক্তার: (হতাশ ভঙ্গিতে) হায় রে। আমার ২ বছর নষ্ট হয়ে গেল। (২য় পাগলকে)
ডাক্তার: তুমি বল তো ৯ কে ৩ দিয়ে গুণ করলে কত হয়?
২য় পাগল: ৯
ডাক্তার: (হতাশ ভঙ্গিতে) গেল আমার চার বছর। ৩য় পাগলকে-
ডাক্তার: তুমিই বলো, ৯ কে ৩ দিয়ে গুণ করলে কত হয়?
৩য় পাগল: ২৭
ডাক্তার: (খুসি হয়ে) কিভাবে বের করলে বাবা?
৩য় পাগল: মঙ্গলবার থেকে ৯ বাদ দিয়ে বের করেছি।

একটা ছেলে সাঁতার জানে না। পুকুরের পানিতে পড়ে গিয়ে-

ছেলেটা: বাঁচাও, আমাকে কেউ বাঁচাও।
পাড়ের দর্শকরা: (মোবাইল, ক্যামেরা বের করে) এই তোল তোল, ছবি তোল। এমন সট আর পাবি না। ফেসবুকে ছাড়লে তো লাইক, লাইক আর শেয়ার।
(হঠাৎ ফাহিম পানিতে নেমে সাঁতার কেটে বাচ্চার কাছে গিয়ে মোবাইল বের করে)

ফাহিম: পাড় থেকে ছবি ভালো আসছিল না। এই ছেলে, স্মাইল কর তো!
[বি.দ্র; ফাহিমের মোবাইলটি ছিল ওয়াটারপ্রুফ।]

Somebody, Nobody ও Mad তিন বন্ধু। হঠাৎ বেড়ানোর সময় Somebody, Nobody কে মেরে ফেলল। পুলিশকে ফোনে Mad -)
Mad : হ্যালো, পুলিশ স্টেশন। এখানে একটা সমস্যা

হয়েছে। Somebody killed Nobody.
(ওপাশ থেকে)
পুলিশঃ Somebody killed Nobody? Are you mad?
Mad: Yes, I am mad.

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

দেশে যত তরুণসমাজ ও যুবসমাজ আজ তাড়াতাড়ি দেশকে বদলে দেয়ার চেষ্টা করে। দুই দিন পর যখন তোমাদের বিয়ে হবে, তার দুই দিন পর নিজের টিভির চ্যানেলেও বদলাতে পারবে না।

পাস করা বড়ই কঠিন

Fun জরিপ

আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখন থেকেই ঠিক করতে হবে। কেন না পড়া-শোনার চাপ আছে কিন্তু সময় নেই। আসলে বছরে মাত্র ৩৬৫ দিন। এর মধ্যে-

১। বছরে শুক্রবার রয়েছে ৫২ টি। সবাই জানে দিনটি আরামের। তাই বাকি থাকে ৩১৩ দিন।

২। গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন ছুটি ৪০ দিন। যেহেতু ছুটি, এসময় আর কে পড়ে? তা ছাড়া গরমে তো পড়া-লেখা করা খুব কষ্টকর আর শীতে তো আমরা লেপের নিচেই থাকি। বাকি থাকে ১৫১ দিন।

৩। প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে ঘুমালে বছরে হয় ১২২ দিন। বাকি থাকে ২৭৩ দিন।

৪। প্রতিদিন ১ ঘণ্টা করে খেলাধুলা (অবশ্যই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো) করাতে বছরে খেলাধুলা করা হয় ১৫ দিন। বাকি থাকে ১৩৬ দিন।

৫। ১.৫ (দেড়) ঘণ্টা তো আমাদের খেতেই চলে যায়। অর্থাৎ বছরে যায় ২৩ দিন। বাকি থাকে ১১৩ দিন।

৬। পরীক্ষার দিন পড়লেও পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে তো (২-৩ ঘণ্টা) আমরা খাতায় লিখি তখন তো আর পড়া যায় না সে হিসেবে প্রতিটি বিষয়ের ৩ টার্ম পরীক্ষায়। এভাবে বছরে ধরা যাক ৪ দিন। বাকি থাকে ১০৯ দিন।

৭। প্রতিদিন কমপক্ষে ১.৫ (দেড়) ঘণ্টা গল্প, গুজব, ফোন সব মিলে বছরে হয় ২৩ দিন। বাকি থাকে ৮৬ দিন।

৮। দিনে আধ-এক ঘণ্টা ফেসবুকে বসলে কোনো ক্ষতি নেই। বছরে যায় ১৫ দিন বাকি থাকে ৭১ দিন।

৯। আবার রয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, উৎসব। অর্থাৎ ঈদ, পূজা-বিয়ে, শবে-কদর, রমজান, শবে-বরাত এসব দিনে আর পড়া হয়। বছরে এভাবে দিন কাটে প্রায় ৪৫ দিন। পড়াশুনা চাড়া বাকি থাকে ২৬ দিন।
গোসল, ছোট-খাট কাজ, ত্বক চর্চা এসব নিয়ে দিনে ১ ঘন্টা করে ধরলে বছরে হয় ১৫ দিন বাকি থাকে ১১ দিন।

১০। আমরা তো মানুষ। তাই অসুখ হতেই পারে। বছরে ধরা যাক ৫ দিন। বাকি থাকে ৬ দিন।

১১। টিভি, সিনেমা, কনসার্ট, শপিংয়ে লেগে যায় ৫ দিন। বাকি থাকে ১ দিন।

১২। সারা বছরে যা হলো না, এক দিনে তা কী হবে? তা ছাড়া দিনটি তো আমার জন্মদিন। সেদিন তো বাবা-মাও পড়তে বলে না। কী করে পড়ি। তাই ব্যালেন্স ০ দিন। অতএব ফেল করলে শিক্ষার্থীর কোনো দোষ নেই।

বি. দ্র. : উক্ত খতিয়ান ঢাকা কমার্স কলেজের কোনো শিক্ষার্থী চিন্তাও করবে না। করলে আমলনামায় যা আসবে তার দায় আমার না।

সৈয়দা আফসানা খানম
শ্রেণিঃ দ্বাদশ, রোলঃ ২৭৬০৩

টিচার ছাত্রকে প্রশ্ন করলঃ

টিচারঃ এই আবুল বলতো জনক কয় প্রকার?
ছাত্রঃ সোজা প্রশ্ন শুনে সে বলল, স্যার জনক হইলো ২ প্রকার। একটি “জাতির জনক” আর একটি হলো “আশঙ্কাজনক।”
টিচারঃ রেগে বলল তোর উত্তর হয় নি। আরও এক প্রকার জনক আছে। আমি তোরে এখন বেত দিয়া পিটামু, সেটাই হবে তোর জন্য “বিপজ্জনক।”
ছাত্রঃ স্যার আপনারটাও হয় নি। আরও এক প্রকার জনক আছে। আমি এখন খিচ্চা দৌড় দিয়া পালামু আর সেটা হলো “সুবিধাজনক।”
(আশেপাশের ছাত্ররা পাশ থেকে বলল)
ছাত্ররাঃ স্যার আরেক প্রকার জনক আছে। আপনি যদি দৌড়াইয়া আবুল্লাইরে ধরনে না পারেন। তবে সেটা হবে আপনার জন্য “লজ্জাজনক”।

কায়েস ঢালী নির্জন
শ্রেণিঃ একাদশ, রোলঃ ৩২৩৮১

ছেলে ও বাবার কথাবার্তাঃ

একটা ছেলে সব পরীক্ষায় শুধু ফেল করে। একদিন তার বাবা বলেন ছেলেকে, তোর সামনে যে পরীক্ষা আছে সেটাতে যদি তুই পাস না করতে পারিস তা হলে তুই আমাকে বাবা বলে ডাকবি না। কিছু দিন পর পরীক্ষা দিল। পরীক্ষার ফলাফল বের হলো। তখন বাবা ও ছেলের মধ্যে যা কথা হলো:

বাবা: ছেলের কাছ থেকে জানতে চাইলেন তোর রেজাল্ট কী?

ছেলে: আমাদের স্কুলের হেড মাস্টার এর ছেলে ফেল করেছে।

বাবা: তোর রেজাল্ট কী?

ছেলেঃ আমাদের স্কুলে যে উকিলের ছেলে পড়তো সে ফেল করেছে।

বাবা: তোর রেজাল্ট কী?

ছেলেঃ করিম সাহেব আমি কোন জমিদারের ছেলে যে পাশ করবো।

বাবা: তুই আমার নাম ধরে ডাকলি?

ছেলেঃ কেন তুমি তো বলেছ আমি যদি ফেল করি তা হলে যেন তোমাকে বাবা বলে না ডাকি। তাই তো তোমার নাম ধরে ডেকেছি।

বাবা-ছেলের কথাবার্তা:

ছেলেঃ তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো আচ্ছা বাবা বাবারা কি সব সময় ছেলে-মেয়ের চেয়ে বেশি জানে?

বাবা: অবশ্যই।

ছেলে: তা হলে বল তো কম্পিউটারের উদ্ভাবনের জনক কে?

বাবা: কেন চালর্স ব্যাবেজ।

ছেলেঃ বাবা যদি ছেলে-মেয়েদের চেয়ে বেশি জানত তাহলে কম্পিউটার চার্লস ব্যাবেজ আবিষ্কার না করে তার বাবা আবিষ্কার করলো না কেন।

মাহমুদ হাসান মাহ্‌দী

শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ২৮৯০২

* এক লোক নাপিতের দোকানে ঢুকে খুব হম্বিতম্বি করে বলল, আমার চুলটা নেইমারের মতো করে কেটে দিন তো।

একটু পরেই লোকটি দিব্যি নাক ডেকে ঘুমোতে শুরু করল। উঠে দেখে চুলের যাচ্ছেতাই অবস্থা! রেগেমেগে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, এ কী! আমার চুল নেইমারের মতো করে দিতে বললাম। আর আপনি আমার চুলের এ কী হাল করেছেন?

নাপিত হাত চুলকোতে চুলকোতে বলল, ভাই, নেইমার তো আর আমাদের এখানে চুল কাটায় না। কাটালে তার চুলের স্টাইলও এমন হতো!

* মা তার ছেলেকে ঘুম থেকে উঠানোর চেষ্টা করছেন, এই খোকা, উঠ। তোর স্কুলের টাইম হয়ে যাচ্ছে তো! একটা বিশাল হাই তুলে ছেলে জড়ানো গলায় বলল, বিরক্ত করো না তো মা! আজ আমি স্কুলে যাব না।

মা: এভাবে অকারণে প্রতিদিন স্কুলে যাব না বললে তো হবে না। কেন স্কুলে যাবি না তার অন্তত দুইটা কারণ দেখা।

ছেলেঃ প্রথম কারণ কোনো ছাত্র-ছাত্রী আমাকে দুই চোখে দেখতে পারে না। আর দ্বিতীয়, শিক্ষক-শিক্ষিকারাও আমাকে পছন্দ করে না।

মাঃ এটা কোনো জোরালো কারণ না, এসব বলে তুই স্কুল ফাঁকি দিতে পারিবি না।

ছেলেঃ আচ্ছা, তা হলে তুমি আমাকে দুইটা কারণ দেখাও, আমার কেন স্কুলে যাওয়া উচিত?

মাঃ ঠিক আছে, বলছি। প্রথম কারণ, তুই এখন আর কচি খোকা না। তোর বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। আর দ্বিতীয় কারণ, তুই হচ্ছিস স্কুলের হেডমাস্টার। তুই না গেলে চলবে কী করে?

*** মা ও ছেলের কথোপকথনঃ**

মাঃ কিরে, তোকে না বলেছি দোকান থেকে দেয়াশলাই কেনার আগে জ্বলে কি না টেস্ট করে নিবি। এখন তো একটা কাঠিও জ্বলছে না।

ছেলেঃ কিন্তু মা, আমি তো দেয়াশলাই কেনার আগে প্রত্যেক কাঠি টেস্ট করে দেখেছি।

* নিবন্ধ লেখা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে সোহান। পুরস্কার হাতে পাওয়ার পর তাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হলো। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করল সোহান, “প্রথমেই আমি ধন্যবাদ দিতে চাই ইন্টারনেট, গুগল, উইকিপিডিয়া, মাইক্রোসফ্‌ট অফিস এবং কপি পেস্ট কে.....”

শিক্ষক: পৃথিবীতে মোট কয়টা দেশ?

ঝন্টু: একটাই দেশ।

শিক্ষক: মানে?

ঝন্টু: হ্যাঁ স্যার, বাকিগুলো তো সব বিদেশ!

মোঃ রাসেল

শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩০৯৯৫

উচ্চারণ:

ছেলে শব্দ করে পড়ছে আর তার বাবা পাশে বসে আছে।

ছেলে: পিকটুর (Picture) অর্থ ছবি, লিকটুর (Lecture) মানে ভাষণ।
বাবা: (অবাক হয়ে) তুই এসব কী পড়ছিস? তোর ফুটুরি (Future) তো দেখছি খুব খারাপ।

মামা ভাগ্নে কথা হচ্ছে:
মামা: আচ্ছা ধরো, তোমার কাছে কেউ দুটো বস্তা নিয়ে এল, যার একটিতে আছে টাকা অন্যটিতে বুদ্ধি। তুমি কোনটা নিবে?
ভাগ্নে: অবশ্যই টাকার বস্তাটা নেব মামা।
মামা: আমি কিন্তু বুদ্ধির বস্তাটাই নিতাম।
ভাগ্নে: যার যেটা অভাব সে তো সেটাই নেবে মামা!

ইলেকট্রিক মৃত্যুদণ্ড:
* বিচারক রায় দিয়েছেন, আসামির মৃত্যুদণ্ড ইলেকট্রিক চেয়ারে কার্যকর হবে।
বিচারক: তোমার শেষ ইচ্ছে কী? আমি সবার শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করি।
আসামি: আমি আপনার হাত ধরে মরতে চাই।

তাজমহল :

একটা ছেলে ও একটা মেয়ের মধ্যে কথোপকথন-

মেয়ে: তুমি আমাকে কতটা ভালবাসো?
ছেলে: সীমাহীন।
মেয়ে: তবে তাজমহল গড়ছো না কেন?
ছেলে: নিশ্চয়ই গড়বো! জমি কেনা হয়ে গেছে, এখন তোমার মরার অপেক্ষায় আছি।

Translation :

শিক্ষক ও ছাত্র :
শিক্ষক: বল তো বল্টু। "তোমার মামা বিশ্বরোডে থাকেন"-এর ইংরেজি কী?
ছাত্র: স্যার, আমি পারি।
শিক্ষক: না বল্টু বলবে।
বল্টু: স্যার, My mother mother live in world road.

আশিকুল ইসলাম (রাকিব)
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩০৯০৯

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পড়াচ্ছেন-রক্ত মানুষের শরীরের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান। রক্ত দান করা মানুষের ভাল গুণাবলির মধ্যে একটি।
শিক্ষক: সাঈদ তুই কি কখনো কাউকে রক্ত দান করেছিস?
সাঈদ: কী যে বলেন স্যার, আমি তো প্রতিদিনই বিনামূল্যে রক্ত দান করি।
শিক্ষক: বলিস কি? এতো রক্ত কাকে দিস?
সাঈদ: কেন স্যার মশাকে!

বাবা এবং ছেলে দুই জনের মধ্যে কথা হচ্ছে-
বাবা: পরীক্ষা কেমন হলো?
ছেলে: একটি প্রশ্ন ভুল হয়েছে!
বাবা: বেশ, বেশ, বাকিগুলো?
ছেলে: বাকিগুলো তো লিখতেই পারিনি।

*** হোটেল বয় এবং ভদ্রলোকের মধ্যে কথা হচ্ছে-**
হোটেল বয়: আপনার ছেলে আমাদের হোটেলে খেয়ে অপনার চেয়ে বেশি বখশিশ দেয়।
ভদ্রলোক: দিতেই পারে, তার বড়লোক বাবা আছে। কিন্তু আমার তো নেই।

* তৌহিদ এবং মুহিত দুই বন্ধু। তারা বিশেষ কিছু নিয়ে আলোচনা করে।
তৌহিদ: জানিস দোস্ত, আমাদের বাড়িতে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে দাঁড়ানো যায় না, সাথে সাথে নিচের দিকে যেতে হয়।
মুহিত: তাই নাকি? কোন জায়গা?
তৌহিদ: আমাদের পুকুরটা

*** দুই বন্ধুর মধ্যে কথা হচ্ছে-**
১ম বন্ধু: জানিস, আমার মামার দশ তলা বাড়িটার ছাদ এতো বড়, মোটর সাইকেলে ঘুরে আসতেও প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক লাগে।
২য় বন্ধু: আরে শোন, আমার কাকার এত বড় একটা মই আছে, যা দিয়ে মাঝে মাঝে কাকা চাঁদটা পেড়ে আনে।
১ম বন্ধু: তাই নাকি! কিন্তু মইটা রাখিস কোথায়?
২ম বন্ধু: বাহ্‌রে! তোর মামার বাড়ির ছাদে!

ডাক্তার এবং রোগীর মধ্যে কথা হচ্ছে-

ডাক্তার: বাসে ধাক্কা খেয়ে আপনি সামান্য ব্যথা পেয়েছেন আর এখন তো আপনি সুস্থ। তার পরেও কাঁদছেন কেন?
রোগী: আমি কি শুধু শুধুই কাঁদছি ডাক্তার সাহেব, আমি যে বাসে ধাক্কা খাই ঐ বাসে লেখা ছিল- আবার দেখা হবে!

*** দুই বন্ধুর মাঝে কথা হচ্ছে-**

১ম বন্ধু: দোস্ত আমাদের টিইবওয়েলে পানি উঠছে না।

২য় বন্ধু: যদি পানি না ওঠে তা হলে তো তোদের টিউবওয়েল পানি শূন্যতায় ভুগছে।
১ম বন্ধু: দোস্ত, এখন আমি কী করবো বল তো?
২য় বন্ধু: আরে বুঝলি না, বাজার থেকে টেস্টি স্যালাইন এনে খাইয়ে দে। দেখবি তা হলে পানি শূন্যতা একেবারেই কেটে যাবে।

রেলওয়েতে চাকরির ইন্টারভিউ চলছে। একটি চটপটে ছেলেকে সবার পছন্দ হলো। তবে চেয়ারম্যান তাকে একটু বাজিয়ে নিতে চাইলেন।

চেয়ারম্যান: ধরো, একটা দ্রুতগামী ট্রেন আসছে। হঠাৎ দেখলে লাইন ভাঙা। ট্রেনটা থামানো দরকার। তখন কী করবে তুমি?
ছেলে: লাল নিশান ওড়াবো।
চেয়ারম্যান: যদি রাত হয়?
ছেলে: লাল আলো দেখাবো।
চেয়ারম্যান: লাল আলো যদি না থাকে?
ছেলে: তাহলে আমার ছোট ভাইকে ডাকবো......
চেয়ারম্যান: ছোট ভাইকে! তোমার ছোট ভাই এসে কী করবে?
ছেলে: কিছু করবে না। ওর অনেক দিনের শখ একটা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট দেখবে।

শিক্ষক ও আমিরের মধ্যে কথা হচ্ছে-

শিক্ষক: বল তো আমির, তোমার জীবনের লক্ষ্য কী?
আমির: স্যার, আমি একজন গবেষক হতে চাই।
শিক্ষক: খুব ভালো, তা তুমি কিসের গবেষক হতে চাও?
আমির: সেটারই তো এখন গবেষণা করছি স্যার।

*** ছেলে ও মার মধ্যে কথা হচ্ছে-**

ছেলে: আম্মু, আমি না আব্বুর ত্রিশ হাজার টাকা আয় করে দিলাম।
মা: তুই এতো টাকা কোথায় পেলি?
ছেলে: আব্বু বলেছিল, পরীক্ষায় পাস করতে পাড়লে আমাকে একটা কম্পিউটার কিনে দেবে। এটা আর দিতে হবে না।

*** ছেলে ও মার মধ্যে কথা হচ্ছে-**

ছেলে: আম্মু আম্মু সাবানটা একটু দাও তো।
আম্মু: তুই তো একটু আগে একটা সাবান নিয়ে গেলি। আবার সাবান চাচ্ছিস কেন?
ছেলে: আম্মু ওই সাবানটাতে ময়লা লেগেছে, তাই ওটা পরিষ্কার করবো।

আব্দুল কাদের
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩১৬৯০

সাঁতার জানে এমন এক লোক পানিতে পড়ে গেল। এমন সময় সে একটি মাছ হাতে পেল। তখন সে মাছটিকে ডাঙায় চালিয়ে দিয়ে বলল-
লোকটি: যা তুই অন্তত বেঁচে থাক।
মালিক: শোন কাল আমাকে খুব ভোরে ডেকে দিবি। একটু ঘোরাফেরা করতে হবে।

[পরদিন সকাল]
মালিক: তুই আমাকে ভোরে ডাক দিলি না কেন?
কাজের লোক: আমি আপনাকে ডাক দিতে গিয়েছিলাম। দেখলাম আপনি একবার এদিক আরেকবার ওদিক ঘুরে ঘুমাচ্ছেন। আপনি তো বড়লোক। আমি ভাবলাম বড়লোকেরা বুঝি এভাবেই ঘোরাফেরা করে।
এক শ্রমিক কারখানায় কাজ করার সময় তার মেশিনে বাম হাত কেটে যায়। হাসপাতালে মা আর তার কথোপকথন-

মা: থাক বাবা, দুঃখ করিস না। ডান হাত তো কাটে নি। এটাই অনেক ভাল খবর।
শ্রমিক: মা, আমার বুদ্ধি আছে না! যেই না দেখলাম মেশিনে আমার ডান হাত কাটা যাওয়ার অবস্থা তেমনি মেশিন থেকে বের করে বাম হাত ঢুকিয়ে দিয়েছি।

তিন বন্ধু একটা বিল্ডিংয়ের ২৫ তলায় থাকে। লিফট খারাপ কয়দিন থেকে। তারা ঠিক করেছে সিঁড়ি বেয়ে উঠার সময় তিনজন একটা গল্প বলবে এবং উঠবে। এতে সময় বুঝা যাবে না।
১ম বন্ধু: একটা সুখের গল্প বলল তারা ১৫ তলায় উঠল।
২য় বন্ধু: একটা দুঃখের গল্প বলল তারা ২২ তলায় পৌঁছাল। এবার
৩য় বন্ধু: দুঃখের গল্প আর কী বলব। আমাদের ফ্ল্যাটের চাবি নিচে গাড়িতে ফেলে এসেছি।

তিন চাপাবাজের মধ্যে কথোপকথন-

১ম চাপাবাজ : জানিস, আমি কাপে ঢালামাত্র গরম চা খেয়ে ফেলতে পারি।

২য় চাপাবাজ : এ আর এমন কী? আমি এমন গরম চা খাই

যে, কেটলি থেকে কাপে, কাপ থেকে মুখে।

৩য় চাপাবাজ : তা হলে তো তোরা ঠাণ্ডা চা খাস। আমি তো চা, চিনি, দুধ একসাথে মুখে দিয়ে আগুনে বসে যাই।

চিড়িয়াখানায় হাতি মারা যাওয়ায় হাতির খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে এক লোক মাথা ঠুকে কাঁদছে। একজন দেখে বলল- "আহারে! হাতিটার জন্য লোকটার কী মায়া! নিশ্চয়ই ওর দেখাশোনা করত। লোকটি তখন কাঁদতে কাঁদতে চেচায়- দূর মিয়া ... আমি এ চিড়িয়াখানায় কবর খোঁড়ার কাজ করি।

বাংলাদেশী একজন তার ব্রাজিলের ও আফ্রিকার দুই বন্ধুকে নিয়ে হেলিকপ্টারে ঢাকা ঘুরছে।

আফ্রিকান বন্ধু : (দুই বন্ধুকে তার স্বর্ণের চেন দেখিয়ে) এই দেখ। এই চেনটি স্বর্ণের। এর দাম প্রায় ২,০০,০০০ টাকা হবে। (-এ কথা কলে সে চেন নিচে ফেলে দিল।)

বাংলাদেশী : এ কী করলি? এত দামি চেন ফেলে দিলি?
আফ্রিকান বন্ধু : আরে আমাদের দেশে কত স্বর্ণ আছে। এই জন্য ফেলে দিলাম। একটা কমলো। (অতঃপর ব্রাজিলের বন্ধু তার হীরার আংটি তাদের দেখিয়ে)

ব্রাজিলের বন্ধু : এই দেখ, আমার হীরার আংটি। এর দাম প্রায় ১০,০০,০০০ টাকা। (অতঃপর সেও আংটিটি ফেলে দিল নিচে)

বাংলাদেশী : এ তুই কী করলি? এত দামি আংটি ফেলে দিলি?

ব্রাজিলের বন্ধু : আরে, আমাদের দেশে কত হীরা আছে।
বাংলার মান রক্ষা করতে বাংলাদেশী বন্ধু এবার তাদের দুইজনকে নিচে ফেলে দিয়ে বলল-)

বাংলাদেশী : আরে, আমাদের দেশে মানুষের কোনো অভাব নাই। তাই দুটো মানুষ কমিয়ে দিলাম।

*** দুই ভিক্ষুকের কথোপকথন-**

১ম ভিক্ষুক : আচ্ছা, হঠাৎ এক সঙ্গে অনেক টাকা পেলে কী করবি?
২য় ভিক্ষুক : ভাবছি, একটা স্কুটার কিনব। আর হেঁটে হেঁটে ভিক্ষা করতে পারছি না। পাঁ ব্যাথা করে।
*** ডাক্তার ও রোগীর কথোপকথন-**

ডাক্তার : তা আপনার দুই কান পুড়ে গেল কী করে?
রোগী : কাপড় ইস্ত্রি করে পাশে চেয়ারে বসেছিলাম। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। ফোন না ধরে ভুল করে গরম ইস্ত্রি কানে লাগিয়েছিলাম তাই।
ডাক্তার : ও আই সি। ভেরি ব্যাড। তা অন্য কানটা কী করে পুড়ল।
রোগী : কী করব বলুন। ফোনটা যে আবার বেজেছিল।

ফারজানা আক্তার
রোল: ৩০৬৭১

এক ব্যক্তি জ্বর হওয়ার ফলে ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার বললেন, আগে এই বিশটা টেস্ট করাইয়া আসেন। তারপর দেখব আপনার জ্বর কত?
রোগী বললেন, ডাক্তার সাব, আরও কয়ডা টেস্ট দিতেন। তাহলে টেস্টে শচীনের রেকর্ড তাড়াতাড়ি ভাঙতে পারতাম।
দুই ব্যক্তির মধ্যে কথা হচ্ছে-
১ম ব্যক্তি : আচ্ছা ভাই বলুন তো, যে লোক তার দুই কানে তুলা গুজেঁ রাখে, তাকে কী বলা যায়?
২য় ব্যক্তি : তাকে যা ইচ্ছা তাই বলা যায়।

তিন পাগলের মধ্যে আলাপ হচ্ছে–তারা তিনজন বলল, চল আমরা কবিতা বানাই:
১ম পাগল : আকাশটা উড়ু উড়ু।
২য় পাগল : বাতাসটা সুরু সুরু।
৩য় পাগল : নদীর ধারে বসে আছি আমরা তিন গরু।

রোগী ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলো-

রোগী : ডাক্তার সাব, শত বছর বাঁচার কোনো উপায় আছে?
ডাক্তার : যান, বিয়ে করেন গিয়ে
রোগী : ক্যান? বিয়ে করলে কমপক্ষে শত বছর বাঁচন যায়?
ডাক্তার : না। বিয়ের পর আর শত বছর বাঁচার ইচ্ছা করবে না।

জেবা আতুকীয়া
রোল : ২৭৫৮২, শ্রেণি: দ্বাদশ

পর্যটক : আচ্ছা এই পাহাড় থেকে লোকজন প্রায়ই পড়ে যায় না তো?

গাইড : না, একবার পড়লেই হয়।

পরীক্ষার আগের রাতে এক ছাত্র পয়সা দিয়ে টস করছে। যদি শাপলা আসে, ঘুমিয়ে পড়ব। যদি মানুষ আসে, তাইলে টিভি দেখব। যদি দাঁড়ায়ে থাকে, তাইলে গেমস খেলব। আর যদি পয়সাটা আকাশে ভাসে, তাইলে কথা দিলাম, সারা রাত পড়মু।

দুষ্টু ছেলে : এই রিকশা, যাবা?

রিকশাওয়ালা : যামু।

দুষ্টু ছেলে : যাও গা।

জনৈক ব্যক্তি একটি গাড়ি কিনতে গেছে। দোকানদার গাড়ির মূল্য চেয়েছে পাঁচ লাখ টাকা। এক টাকাও কমে সে দেবে না। ক্রেতার কাছে ছিল চার লাখ ৯৯ হাজার ৯৯৮ টাকা। দুই টাকা কম বলে সে গেল এক ভিক্ষুকের কাছে-

লোকটা : দুইটা টাকা দেন, গাড়ি কিনব।

ভিক্ষুক : এই নেন চার টাকা, আমার জন্যও একটা আনবেন।

দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে :

১ম বন্ধু : কী রে, তুই নাকি সব সাবজেক্টে ফেল করেছিস?

২য় বন্ধু : হুঁ। শুধু অঙ্ক ছাড়া।

১ম বন্ধু : বলিস কী? অঙ্কে পাস করেছিস?

২য় বন্ধু : পরীক্ষাই দিইনি।

পথিক : এই রাস্তা কোথায় গেছে, ভাই?

দোকানদার : কোথাও যায়নি। ২০০ বছর ধরে এখানেই আছে।

ফকির : দুইটা টাকা দেন স্যার।

ভদ্রলোক : এখন ভাংতি নাই, পরে এসো।

ফকির : এই ভাংতির চক্করে আমার প্রায় লাখ খানেক টাকা এই পাড়ায় আটকে আছে।

বাবা : সারা দিন আড্ডাবাজি! পড়াশোনা নেই?

ছেলে : আমি কাল রাত ১২টা পর্যন্ত পড়েছি।

বাবা : বাহ! তা কখন পড়তে বসেছিলি?

ছেলে : ১২টা বাজার ১৫ মিনিট আগে!

শিক্ষক : বলো তো, নাথিং মানে কী?

ছাত্র : (ভয়ে ভয়ে)– জানি না, স্যার!

শিক্ষক : কী বললে?

ছাত্র : কিছুই না।

শিক্ষক : গুড, বসো।

এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে বলছে, 'জানিস, আমার দুই সপ্তাহের ছুটি। কাল থেকে আমি যাচ্ছি এক সপ্তাহের ছুটিতে আর পরের সপ্তাহে আমার বস যাচ্ছেন এক সপ্তাহের ছুটিতে।

মৃত্যুশয্যায় এক কৃপণ লোক :

আমার বউ কই?

বউ : এই তো, এখানে।

লোক : আমার ছেলে কই?

ছেলে : আমি এখানে।

তা হলে পাশের রুমে ফ্যানটা চলছে কেন?

রিতা ইসলাম

শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩০৪৭২

বউ : আমি মরে গেলে তুমি কী করবে?

জামাই : আমিও মরে যাব।

বউ : কেন আমার জন্য তুমি মরতে যাবে? তুমি কি আমাকে খুব ভালবাসো?

জামাই : জি..না। কারণ বিয়ের পর থেকে এই পর্যন্ত তোমার জন্য যত জিনিস ধার করে কিনেছি। সেই পাওনাদাররা আমাকে মেরে ফেলবে।

একটা ছেলে ৫ তলার ছাদ থেকে লাফ দেবে তখন নিচের মেয়েটির উদ্দেশ্যে বলতে লাগল তুমি যদি আমাকে I Love U না বল আমি এখনি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ব। সাথে সাথে মেয়েটি চেচিয়ে বলল: I Love U ছেলেটি ছাদ থেকে নিচে নেমে এসে বলল ভাগ্য ভাল তুমি তাড়াতাড়ি I Love U বলেছ। আর না হলে তোমার মতো মেয়ের জন্য আমার জীবনটা এখনই শেষ হয়ে যেত।

স্যার : ছেলেদের মেমোরি কত GB হয়?

ছাত্রী : Unlimited

স্যার : কিভাবে?

ছাত্রী : যেখানেই মেয়ে দেখে ডাউনলোড করে নেয় তবুও কখনও ফুল হয় না।

স্ত্রীর অনেকদিন ধরে পেট ব্যথা হচ্ছে। তাই সে ডাক্তারের কাছে গেল। এদিকে স্বামী অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছে। স্ত্রী ঘরে ঢোকার সাথে সাথে চিৎকার করে বলল একটা খুশির খবর

আছে। স্বামী বলল- নিশ্চয়ই আমি বাবা হব?
স্ত্রী- না গো। আসলে তোমার সোনার আংটিটা আমার পেটে পাওয়া গেছে।

একটা ছেলে ৫ টাকার টিকিটে I Love U লিখে একটা মেয়ের দিকে ছুড়ে মারল। তখন মেয়েটা কাগজটা খুলে পড়ে তো বাঘিনীর মতো গর্জে উঠে বলল- তুমি আমাকে ৫ টাকার টিকিটে I Love U লিখেছ? কেন আমার কি কোনো স্টেটাস নেই? তুমি তো আমাকে ১০ টাকার টিকিটে I Love U লিখে দিতে পারতে..?

মেয়ে : আম্মু ছোট খালা মনে হয় না মানুষ।
মা : মানুষ না মানে?
মেয়ে : না মা আমি নিজ কানে শুনেছি।
মা : কী শুনেছিস?
মেয়ে : আব্বু না কাল রাতে ছোট খালার গাল ধরে বলতেছিল তুমি একটা পরি....!

জান্নাতুল ফেরদাউস (রথী)
রোল : ২৭৮১৬, শ্রেণি : দ্বাদশ

বাবা ও ছেলের মধ্যে কথা হচ্ছে-
ছেলে : বাবা তোমার মাথায় চুল কম কেন?
বাবা : যাদের ছেলে দুষ্ট হয় তাদের মাথায় চুল কমই থাকে।
ছেলে : তাই তো বলি দাদুর মাথায় চুল কম কেন?

জাহাজ ক্যাপটেন পদে নিয়োগ পেতে একলোক ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন–
নিয়োগকর্তা : তুমি কি সাঁতার জান?
চাকরি প্রার্থী : জি না স্যার।
নিয়োগকর্তা : সে কী? জাহাজের ক্যাপটেন পদে চাকরি করতে এসেছ অথচ সাঁতার জান না।
চাকরি প্রার্থী : কিছু মনে করবেন না স্যার পাইলটরা তো উড়োজাহাজ চালায় কিন্তু তারা কি উড়তে জানে?

সুমাইয়া আক্তার (মেঘলা)
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩০৫৯৪

Translate to 'নোয়াখাইল্যা' ভাষা
She is looking at me- হেতি আঁর মুই রেনি রইছে।
What's up? ভাইসা, খবর কিয়া?
Hurry up- ছোত কর।
It is raining- ঝড়ি হড়ে।
What do I do-আঁই কিত্তাম?
I shall not go- আঁই যাইতান্ন।
He tells a lie- হেতে মিছা কতা কয়।
The moon gives us light- চাঁদ আঙ্গোরে হ'র দেয়।
What are they doing- হেতেরা কিয়ারে?
Where are you from- তুঁই কোনান তন আইছছ?
Birds fly in the sky- হইক আশমানে উড়ে।
The sun rises in the east and sets in the west- সূর্য হুব মুই উডে আর হুশশুম মুই ডুবে।

কয়েক দিন আগে সিলেটের হবিগঞ্জে গিয়েছিলাম একটি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে। এখানকার কিছু রোগীর অভিযোগ শুনুন :
রোগী : ডাক্তার সাব, আমার ফেটে বেদনা সঙ্গে মাথাত বিষ, আর রইদে গেলে মাথাডা চক্কর মারে।
: স্যার, আমি তিনমাস ধইরা খালি শুকাইতাসি, খাইলেও হুকাই, না খাইলেও হুকাই।
: আমার বুকটায় কেডায় জানি চাক্কু দিয়া ফার মারে!
: বাজান! আমার মাইয়্যাডার মুখের দাগ যায় না ক্যারে! আয় মাসে কইন্যা দেখাইতাম।
: কিতা কইতাম? মাথাটা রাইত অইলে চিনচিনায়, দিন অইলে ফুরফুরায়।
: কইলে বিশ্বাস করবায়নি ডাক্তার, মাথা থাইক্যা একটা আগুনের বাতাস নামে, ফওত গিয়া কুলাইতে থাহে!
: একটা ফোড়া আইসিল! এইডা না কমলে ভালা আসিল, কইম্মা অক্ষণ আরো তিনডা অইসে।
: বুকের নিচের দিকে ডাইন ফাশটায় একটা চাক্কা অইসে, ধরন যায় না, নড়াচড়া করে।
: ডাক্তার সাব, কয়দিন ফরফর আমার পেট নামে।
: বাজান, জ্বিনে খুব ডিস্টাব দিতাছে, হেইডার চিকিৎসা ফকির বাবায় দিব, আফনে খালি আমার বুক ধরফরের চিকিৎসা দেইন।
: আমার কোনো অসুখ নাই, এক ফাইল গ্যাসের

অসুধ আর এক পাতা ভিটামিন দ্যান!

স্টেশনমাস্টারকে বলছেন একলোক:

ভদ্রলোক : ভাই, সিলেটের ট্রেনটা কখন ছাড়বে?
স্টেশনমাস্টার : সাড়ে আটটায়।
ভদ্রলোক : আর চট্টগ্রামেরটা?
স্টেশনমাস্টার : এগারোটায়।
ভদ্রলোক : তা হলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ট্রেন যাবে কখন?
স্টেশনমাস্টার : (এবার বিরক্ত হয়ে) আরে এত ট্রেনের খবর নিচ্ছেন, আপনি যাবেন কোথায়?
ভদ্রলোক : না, মানে আমি রেইললাইনটা পার হয়ে ওপাশের প্লাটফর্মে যাবো তো!

দুই ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবেলা নদী পার হচ্ছেন, এমন সময় তারা এক মহিলাকে নদীর পাড়ে বসে থাকতে দেখলেন-
মহিলা: দয়া করে আমাকে নদীটা পার করে দিবেন? অনেকক্ষণ থেকে বসে আছি, কোনো নৌকা নেই আর এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আমার অনেক সমস্যা হয়ে যাবে।
১ম জন : অসম্ভব, আমাকে স্পর্শ করবেন না, আমি অপবিত্র হয়ে যাবো। হায় ভগবান!
২য় জন : মহিলাটা বিপদে পরেছে, চলুন আমরা ওনাকে সাহায্য করি।
১ম জন : অসম্ভব, আমি পারবো না, আপনার দরকার হলে আপনি করুন।
২য় জন : মানব ধর্মের চেয়ে বড় কিছু নেই। (মহিলাকে) আপনি আসুন, আমার কাধে উঠুন। আমি আপনাকে পার করে দেই।
(পার হওয়ার পর মহিলা চলে গেল)
১ম জন : কী ব্যাপার! আপনি যে মহিলাটাকে কাধে নিয়ে পার হলেন কেমন লাগলো? (হেসে)
২য় জন : আমি তো মহিলাটিকে কাধে করে পার করে অনেক আগেই দিয়ে আসছি, কিন্তু আপনি তো মহিলাটাকে এখনো মাথায় নিয়ে ঘুরছেন!

সুমি

শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল: ২৮২৫৪

আব্দুল্লাহ নামে এক ছাত্র পরীক্ষার হলে বার্ষিক পরীক্ষা দিতে গেল। গিয়ে দেখল সে কিছুই পারে না। শেষে সে চিন্তাভাবনা করে স্যারের নামে পরীক্ষার খাতায় একটি ছড়া লিখে দিলো।
“খালেদ ভাই খালেদ ভাই
নাম্বার দিতে আপনার কোনো জুড়ি নাই”
শিক্ষক এই পরীক্ষার খাতা পড়ে লিখে দিল
‘‘আব্দুল্লাহ-আব্দুল্লাহ
তোমায় দিলাম দুই গোল্লা”

সোহানুর রহমান সোহান
রোল: ২৯৬৮২, শ্রেণি :দ্বাদশ

হিসাববিজ্ঞান রঙ্গ

এক হিসাববিজ্ঞান শিক্ষক তার ছাত্রদের প্রশ্ন করছেন:
শিক্ষক: বল তো নিরব, “খলিল সাহেব একটা আম ক্রয় করলেন” এর জাবেদা কী?
নিরব: স্যার, খলিল সাহেব হিসাব ডেবিট হবে। আর চড় হিসাব ক্রেডিট হবে।
শিক্ষক: কেন খলিল সাহেব হিসাব ডেবিট আর চড় হিসাব ক্রেডিট হল?
নিরব: কারণ, খলিল সাহেব আমওয়ালার কাছ থেকে আম নিয়ে খেলেন। তাই খলিল হিসাব ডেবিট। আর তিনি আমওয়ালাকে চড় মেরে আমটা নিয়ে গেলেন। তাই চড় হিসাবে ক্রেডিট হবে।
শিক্ষক: তারেক! বল, খতিয়ান কাকে বলে?
তারেক: স্যার, যে সর্বদা আমাদের মতো সাধারণ মানুষ, পশুপাখি ও পরিবেশের যথার্থ ক্ষতি করে থাকে তাকেই ক্ষতিয়ান বলে
শিক্ষক: তোমরা সবাই এখন বইয়ের দ্বিতীয় রেওয়ামিলটা কর।
সাইফ: স্যার, রেওয়ামিল করব? কিন্তু আমি তো এটা করতে পারি না।
শিক্ষক: তবে কী পারিস? ডিম?
সাইফ: না স্যার। টেবিল মিল করতে পারি।
শিক্ষক: (রেগে গিয়ে) তোরা সবগুলো এক একটা বেওকুফ হয়েছিস।
প্রাচুর্য: (লাফিয়ে উঠে) স্যার, আমার মা বলেছে, আমি নাকি কখনো কোনো কিছু হতে পারব না। কিন্তু আমার কী ভাগ্য!

আমি জীবনে একটা কিছুতো হতে পেরেছি।

গীতরঙ্গ:

এক গানের শিক্ষক ও তার ছাত্রের মধ্যে কথোপকথন:

শিক্ষক: অর্নব, তুমি নাকি নিজে গান রচনা করেছ? তা কী ধরনের গান রচনা করেছ?

অর্নব: রবীন্দ্র সংগীত।

মোঃ শামীম আল মামুন (সৌমিক)

রোল: ৩১০২০, শ্রেণি : একাদশ

একজন চোরকে ধরা হয়েছে :

চোরটাকে ধরার পর বহুলোক জড় হয়েছে।

কেউ বললো-একে আচ্ছা করে পিটাও।

কেউ বললো-থানায় নিয়ে চলো।

আবার অনেকে বললে- "গাছের সাথে বেঁধে আচ্ছা করে ধোলাই দাও।"

বিভিন্ন জনের পরামর্শ শুনতে শুনতে মধ্যরাত শেষ হয়ে রাত শেষ হবার জোগাড়।

চোরটা আর থাকতে না পেরে বলে উঠে-

"ভাইজানরা, যা করার তাড়াতাড়ি করেন। আরও দশ বারটা বাড়িতে যাইতে হইব। এক বাড়ি নিয়া পইড়া থাকলে আমার পেট চলব না।

দুষ্ট ছেলের প্রার্থনা :

বাড়িতে দুষ্টুমি করার জন্য বাবা-মা ছোট ছেলে সোহাগকে ঘরে বন্ধ রেখে বন-ভোজনে চলে গেলেন অন্য ছেলেদের নিয়ে।

পিকনিক করতে করতে হঠাৎ তাদের সোহাগের জন্য দুঃখ হল। তখন বড় ছেলেকে পাঠালেন সোহাগকে ডেকে নিয়ে আসতে গাড়ি করে।

বড় ভাইয়ের কথায় কিন্তু সোহাগ যেতে চাইল না। কারণ জিজ্ঞেস করায় সে বলল-আমি ইতোমধ্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে ফেলেছি। ওই পিকনিকের রান্না যে-যে খাবে তারা সবাই কলেরায় মারা যাবে।

মোঃ আশরাফুল আলম

রোল: ৩১২২৯, শ্রেণি : একাদশ

তিনটি কুকুর পরিকল্পনা করলো-এক বিয়ে বাড়িতে তারা খুব মজা করে খাওয়া-দাওয়া করবে।

কথা মতো পরদিন তারা বিয়ে বাড়িতে গেল। যেখানে রান্নাবান্না হচ্ছে সেখানে প্রথম কুকুরটি গেল, যাওয়ার সাথে সাথেই তার পিঠে গরম পানি ঢেলে দেয়া হলো।

দ্বিতীয় কুকুরটি গেল যেখান থেকে খানা পরিবেশন করা হয় সেখানে। যেতেই তাকে বেঁধে রাখা হলো।

তারপর তৃতীয় কুকুরটি গেল যেখানে খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে সেখানে। যাওয়া মাত্রই লোকেরা তার পিঠে বসিয়ে দিল এক ডাণ্ডা। পরদিন তারা একত্রিত হলো। তারা কথা বলছে, কার কেমন হলো। এই বিষয়ে প্রথম কুকুরটি বললো: আমি যেতেই গরম গরম যেহেতু তার গায়ে গরম পানি ঢেলে দেয়া হয়েছে।

তার কথায় দ্বিতীয় কুকুরটি বললো, আরে আমাকে তো আসতেই দেয় না।

যেহেতু তাকে বেধে রাখা হয়েছিল।

এদের কথার পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় কুকুরটি বললো, আমি যেতে না যেতেই বসিয়ে দিয়েছে। যেহেতু তারে পিঠে ডাণ্ডা বসিয়ে দেয়া হয়েছিল।

ডাক্তার ও রোগীর মধ্যে কথোপকথন-

ডাক্তার: আমার কাছে আসার আগে অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন?

রোগী: না ডাক্তার সাহেব, আমি এক ঔষধের দোকানে গিয়েছিলাম

ডাক্তার: ঔষুধের দোকানে? হায় আল্লাহ!

আপনাদের মতো রোগীরা এ জন্যই মরে। তা সেই দোকানদার আপনাকে ছাগলের মতো কী পরামর্শ দিল?

রোগী: উনি আমাকে আপনার কাছে আসতে বলেছেন।

প্রিয়া বাগ্চী

শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল: ২৮২১৪

শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে কথা হচ্ছে-

শিক্ষক: বলো তো বিদ্যুৎ চলে গেলে আমরা কী দেখতে পাই?
ছাত্র: আমাদের ভবিষ্যৎ।
শিক্ষক: কী ই ই ই ই!!! বিদ্যুৎ গেলে তোদের ভবিষ্যৎ কিভাবে দেখা যায়!
ছাত্র: কেন স্যার, আপনিই তো বলেছেন, আমাদের ভবিষ্যৎ নাকি অন্ধকার।

এক বৃদ্ধ বনে চলছিলেন। হঠাৎ এক বাঘ এল।
বাঘ: আমি তোমার রক্ত পান করব।
বৃদ্ধ: আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।
বাঘ: আমি মাঝে মধ্যে কোল্ড ড্রিংকসও খাই।
শ্রেণিকক্ষে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে কথোপকথন-
ছাত্র: জুন আই কাম ইন স্যার?
শিক্ষক: কিরে, এই নতুন ইংরেজি কবে আমদানি করলি?
ছাত্র: কেন স্যার, আপনিই তো গত মাসে ক্লাসে ঢোকার সময় বলেছিলেন।
শিক্ষক: আমি তো বলেছিলাম ‘মে আই কাম ইন’।
ছাত্র: কিন্তু স্যার মে মাস তো শেষ, এখন তো জুন মাস।

অবন্তীর ভালোবাসা

বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছে অরিত্র। দীর্ঘ কেমোর ফলে চুল, ভুরু কিছুই অবশিষ্ট নেই। ওর বয়স মাত্র ১১। ও লড়াই করছে ক্যান্সারের সঙ্গে। ওর দিনের পর দিন হাসপাতালে থাকতে আর ভালো লাগে না।
সেদিন ওর ছোট বোন অবন্তি এসেছিল। অবন্তী তো ওকে দেখে হেসেই খুন। বলে, ‘ভাইয়া, তোমাকে না ছিলা আলুর মতো লাগছে।’ ওর খুব খারাপ লেগেছিল। কিন্তু আম্মু বলল, ও তো ছোট মানুষ কিছু বোঝে না। তাই এমন বলছে। অবন্তী আসলেই ছোট। এর বয়স মাত্র আট বছর। আয়নায় শেষ বারের মতো নিজেকে দেখে নিল অরিত্র। আজকে সে আব্বুর সঙ্গে বাসায় যাবে। ‘নিশ্চয়ই অবন্তী আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে’ মনে মনে বলে অরিত্র। অরিত্র হলো তোমার? বাইরে থেকে ডাকলো ওর আব্বু। ‘আসছি’ বলে লাল ক্যাপ দিয়ে আস্তে করে তার মাথাটা ঢেকে দেয় অরিত্র।

অবন্তী বাসায় একা আব্বু-আম্মু ভাইয়াকে আনতে গিয়েছে ‘নাহ’ ভাইয়াকে এভাবে বলা সেদিন মোটেও ঠিক হয় নি’ মনে মনে বলে অবন্তী। ‘ভাইয়ার জন্য কিছু করতে পারলে ভালো হতো, যাতে ও খুশি হয়।’ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এ সব চিন্তা করছে অবন্তী। হঠাৎ করেই একটা চমৎকার বুদ্ধি এসে গেল অবন্তীর মাথায়। দৌঁড়ে বাথরুমের দিকে চলে গেল। তার হাতে মায়ের একটা বাক্স। মা এটাতে কী যে সব রাখেন! এর মধ্যে কী যেন খুঁজতে লাগল অবন্তী। হঠাৎ জিনিসটা সে পেয়েও যায়।

বেল বাজলে দৌঁড়ে দরজা খুলে দেয় অবন্তী। আব্বু-আম্মু, অরিত্র সবাই ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ওর মাথায় বেশ লম্বা চুল ছিল। কিন্তু এখন চুলগুলো ছোট ছোট আর এলোমেলো করে কাটা।
অবন্তী দুই হাত মুঠ করে এগিয়ে দেয় অরিত্রর দিকে। বলে, ‘ভাইয়া,আমার মাথায় তো অনেক চুল, তাই সেখান থেকে তোমাকে কিছু দিলাম। তা হলে তোমাকে আর আলুর মতো দেখাবে না।’
সামনে এগিয়ে আসে অরিত্র। ওর মাথার ক্যাপটা পরিয়ে দেয় অবন্তীকে। কারণ, ওর এই ক্যাপেরার আর দরকার নেই।

মোঃ রায়হান চৌধুরী শিফাত
শ্রেণি : একাদশ, রোল: ৩১২২০

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

পুরস্কার

১ম পুরস্কার-মৃত্যুবরণ
২য় পুরস্কার- ক্যান্সার
৩য় পুরস্কার- আলসার
৪র্থ পুরস্কার- যক্ষ্মা
এবং সর্বশেষ সান্ত্বনা পুরস্কার কাশি।
টিকিট ফি - ১,২,৩,৫,১০,২০ টাকা (মাত্র)।
টিকিট পাবেন- পান, বিড়ি- সিগারেটের দোকানে।
প্রধান অতিথি - মাননীয় আজরাইল (আ.)।
টর্চার- নিকটতম হাসপাতাল।
যোগাযোগ - কবরস্থান।
বিস্তারিত ও ফলাফল - দৈনিক ইন্তেকাল।

শ্রাবণ আরেফিন
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল: ২৯০৯৪

শিক্ষার্থী পরিচিতি
একাদশ শ্রেণি

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

ইফতি ২৯৯০৩	আশফিরুনা ২৯৯০৪	তাফান্নুম ২৯৯০৫	নাফিয়া ২৯৯০৬	ডানা ২৯৯০৭	চৈতি ২৯৯০৮	সোমা ২৯৯০৯

মীম ২৯৯১০	সিনথিয়া ২৯৯১১	মশিহা ২৯৯১২	শ্রাবণী ২৯৯১৩	জান্নাত ২৯৯১৪	বীথি ২৯৯১৫	তন্নী ২৯৯১৬

বৃষ্টি ২৯৯১৭	জাকিয়া ২৯৯১৮	রাশিদা ২৯৯১৯	ফারজানা ২৯৯২০	নাফিয়া ২৯৯২১	নাবিলা ২৯৯২২	সামিয়া ২৯৯২৩

মীম ২৯৯২৪	তামান্না ২৯৯২৫	সাদিয়া ২৯৯২৬	শিমি ২৯৯২৭	সুমাইয়া ২৯৯২৮	রাকা ২৯৯২৯	মীম ২৯৯৩০

আফিয়া ২৯৯৩১	নওমি ২৯৯৩২	তমা ২৯৯৩৩	রোকেয়া ২৯৯৩৪	শান্তা ২৯৯৩৫	কাজল ২৯৯৩৬	সুমাইয়া ২৯৯৩৭

তাহ্‌মিনা ২৯৯৩৮	নুবা ২৯৯৩৯	আছমা ২৯৯৪০	তাসফিয়া ২৯৯৪১	মিতু ২৯৯৪২	মনি ২৯৯৪৩	নুসরাত ২৯৯৪৪

সাইয়া ২৯৯৪৫	মিতু ২৯৯৪৬	ইশরাত ২৯৯৪৭	আশা ২৯৯৪৮	মমো ২৯৯৪৯	পিংকী ২৯৯৫০	আকলিমা ২৯৯৫১

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

ফারিয়া	মরিয়ম	আতিকা	সাম্মী	প্রভাতী	তাসনিম	সোমা
২৯৯৫২	২৯৯৫৩	২৯৯৫৪	২৯৯৫৫	২৯৯৫৬	২৯৯৫৭	২৯৯৫৮

নিপা	সুমাইয়া	লাবণী	ফাতেমা	সিনথিয়া	নাফিজা	মিম
২৯৯৫৯	২৯৯৬০	২৯৯৬১	২৯৯৬২	২৯৯৬৩	২৯৯৬৪	২৯৯৬৫

ইসরাত	শ্রাবণী	অহনা	সিমকী	অনন্যা	স্বর্ণা	মালিহা
২৯৯৬৬	২৯৯৬৭	২৯৯৬৮	২৯৯৬৯	২৯৯৭০	২৯৯৭১	২৯৯৭২

জয়তুন	রুমাইয়া	সম্পা	জান্নাতুল	লিমা	মারিয়া	লাবণী
২৯৯৭৩	২৯৯৭৭	২৯৯৭৫	২৯৯৭৬	২৯৯৭৭	২৯৯৭৮	২৯৯৭৯

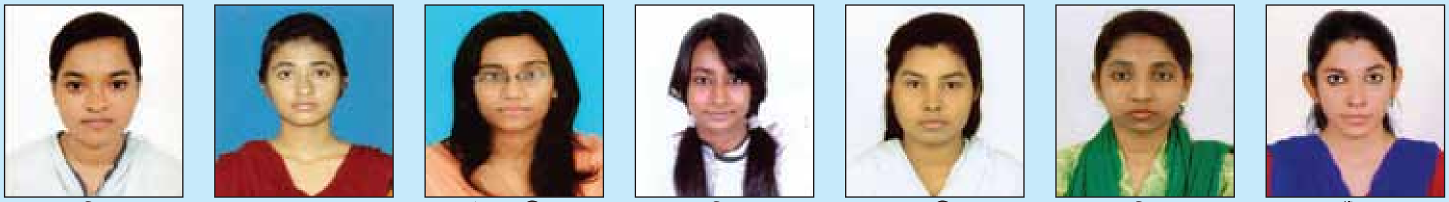

সামিয়া	আজরা	বৈশাখী	খাদিজা	যুথী	আনিকা	পুঁজা
২৯৯৮০	২৯৯৮১	২৯৯৮২	২৯৯৮৩	২৯৯৮৪	২৯৯৮৫	২৯৯৮৬

ইতি	সুমাইয়া	মেহরিন	মিতু	মিলা	মাইশা	সাইমা
২৯৯৮৭	২৯৯৮৮	২৯৯৮৯	২৯৯৯০	২৯৯৯১	২৯৯৯২	২৯৯৯৩

তাসমিয়া	ফাহমিদা	ফারজানা	লুবনা	ইসরাত	আছমা	সিমু
২৯৯৯৪	২৯৯৯৫	২৯৯৯৬	২৯৯৯৭	২৯৯৯৮	২৯৯৯৯	৩০০০০

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

আফসানা	লিমা	নাবিহা	নুসরাত	আনিকা	তিথী	সাওলা
৩০০০১	৩০০০২	৩০০০৩	৩০০০৪	৩০০০৫	৩০০০৬	৩০০০৭

রিহা	লামিয়া	সানজিদা	নিশী	জুহি	অনিকা	প্রান্তি
৩০০০৮	৩০০০৯	৩০০১০	৩০০১১	৩০০১২	৩০০১৩	৩০০১৪

আগামী	লামিয়া	তানজুম	নিশা	আফরিন	মিম	নিতু
৩০০১৫	৩০০১৬	৩০০১৭	৩০০১৮	৩০০১৯	৩০০২০	৩০০২১

সুমাইয়া	সালসাভি	শিমুল	মোহসিনা	জাহিদা	অর্পা	তাহ্নিয়া
৩০০২২	৩০০২৩	৩০০২৪	৩০০২৫	৩০০২৬	৩০০২৭	৩০০২৮

খাদিজা	নাজিফা	হুমায়রা	রিদুয়ানা	সুমনা	সায়মা	সুপ্তী
৩০০২৯	৩০০৩০	৩০০৩১	৩০০৩২	৩০০৩৩	৩০০৩৪	৩০০৩৫

প্রিয়া	মুনিয়া	অর্নি	নুরা	নিশা	ফাহিমা	ফাতেমাতুজ জোহরা
৩০০৩৬	৩০০৩৭	৩০০৩৮	৩০০৩৯	৩০০৪০	৩০০৪১	৩০০৪২

তাহমিনা	তেজস্বিতা	ফারহা	রিতু	মারুফা	নিপা	সুবর্ণা
৩০০৪৩	৩০০৪৪	৩০০৪৫	৩০০৪৬	৩০০৪৭	৩০০৪৮	৩০০৪৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

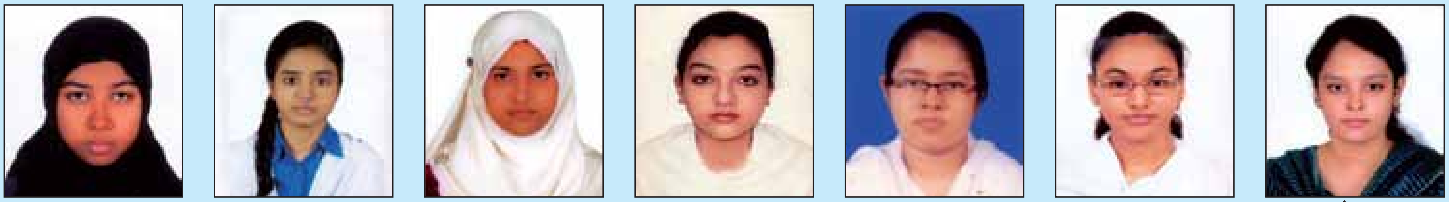

মুন্নি	সায়রা	ঝুমু	অন্নবা	তাকিয়া	পরমিতা	ঐশি
৩০০৫০	৩০০৫১	৩০০৫২	৩০০৫৩	৩০০৫৪	৩০০৫৫	৩০০৫৬

রিন্তী	নুজহাত	মণিষা	ফাতেমা	সাদিয়া	রিয়া	মুনিরা
৩০০৫৭	৩০০৫৮	৩০০৫৯	৩০০৬০	৩০০৬১	৩০০৬২	৩০০৬৩

শারমিন	তাসমি	সাদিয়া	সাবরিন	ফাহমিদা	কামরুননাহার	ফারিহা
৩০০৬৪	৩০০৬৫	৩০০৬৬	৩০০৬৭	৩০০৬৮	৩০০৬৯	৩০০৭০

মিম	রিশতা	তানজিলা	সাদিয়া	অনন্যা	আশরাফি	অপরাজিতা
৩০০৭১	৩০০৭২	৩০০৭৩	৩০০৭৪	৩০০৭৫	৩০০৭৬	৩০০৭৭

সাকিলা	লুবনা	প্রভা	তানি	কানিজ ফাতেমা	আনিকা	নাসরিন
৩০০৭৮	৩০০৭৯	৩০০৮০	৩০০৮১	৩০০৮২	৩০০৮৩	৩০০৮৪

মুক্তা	শ্যামলি	বিন্তী	স্বর্ণালী	লাকী	নাসরিন	পারমিতা
৩০০৮৫	৩০০৮৬	৩০০৮৭	৩০০৮৮	৩০০৮৯	৩০০৯০	৩০০৯১

সোনিয়া	সাকি	দিপা	ফাতেমা	তুলি	মিম	সাবিনা
৩০০৯২	৩০০৯৩	৩০০৯৪	৩০০৯৫	৩০০৯৬	৩০০৯৭	৩০০৯৮

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

জান্নাতুল ৩০০৯৯	আয়শা ৩০১০০	মনিকা ৩০১০১	শারিয়াত ৩০১০২	ফারজানা ৩০১০৩	জাফরিন ৩০১০৪	সুপ্তি ৩০১০৫

লিরা ৩০১০৬	সাদিয়া ৩০১০৭	জেরিন ৩০১০৮	ইফ্ফাতয়ারা ৩০১০৯	জেনিফার ৩০১১০	উপমা ৩০১১১	রিহা ৩০১১২

পিয়া ৩০১১৩	শারমিন ৩০১১৪	তাসনুভা ৩০১১৫	ফারজানা ৩০১১৬	সুমাইয়া ৩০১১৭	আর্খি ৩০১১৮	রিয়াজমিন ৩০১১৯

নিঝুম ৩০১২০	খুর্শিদা ৩০১২১	ইলা ৩০১২২	হিমী ৩০১২৩	সোনিয়া ৩০১২৪	অনামিকা ৩০১২৫	নিশা ৩০১২৬

মিথীলা ৩০১২৭	অনিকা ৩০১২৮	রুম্পা ৩০১২৯	সুমাইয়া ৩০১৩০	মিম ৩০১৩১	সাদিয়া ৩০১৩২	নাজিয়া ৩০১৩৩

সারিকা ৩০১৩৪	আনিকা ৩০১৩৫	তুহিলী ৩০১৩৬	নাদিয়া ৩০১৩৭	বন্যা ৩০১৩৮	স্বর্ণা ৩০১৩৯	তানজিলা ৩০১৪০

মিম ৩০১৪১	ঝুমা ৩০১৪২	নাবিলা ৩০১৪৩	এ্যামি ৩০১৪৪	লরিন ৩০১৪৫	কানিজ ৩০১৪৬	মিম ৩০১৪৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

রাইশা ৩০১৪৮ | শ্রাবণী ৩০১৪৯ | ইশরাত ৩০১৫০ | তামান্না ৩০১৫১ | আনিকা ৩০১৫২ | বর্ণা ৩০১৫৩ | ফৌজিয়া ৩০১৫৪

সামা ৩০১৫৫ | তনু ৩০১৫৬ | জেরিন ৩০১৫৭ | হাবিবা ৩০১৫৮ | মিম ৩০১৫৯ | সাদিয়া ৩০১৬০ | তৃপ্তি ৩০১৬১

ঈশিতা ৩০১৬২ | ফারিহা ৩০১৬৩ | মিম ৩০১৬৪ | হুমায়রা ৩০১৬৫ | মাহমুদা ৩০১৬৬ | কলি ৩০১৬৭ | তাহমিনা ৩০১৬৮

ফারজানা ৩০১৬৯ | সুলতানা ৩০১৭০ | অনিকা ৩০১৭১ | আফরিন ৩০১৭২ | আশা ৩০১৭৩ | রাত্রি ৩০১৭৪ | সাথী ৩০১৭৫

শিমা ৩০১৭৬ | তাবাস্সুম ৩০১৭৭ | কনিকা ৩০১৭৮ | হাজারিকা ৩০১৭৯ | আয়শা ৩০১৮০ | আইরিন ৩০১৮১ | চৈতী ৩০১৮২

ফাতিমা ৩০১৮৩ | ফারজিম ৩০১৮৪ | তারিশা ৩০১৮৫ | প্রিয়াংকা ৩০১৮৬ | সামছুননাহার ৩০১৮৭ | আনিকা ৩০১৮৮ | ঊর্মি ৩০১৮৯

আফরোজা ৩০১৯০ | তাসনিম ৩০১৯১ | প্রমা ৩০১৯২ | আফরিন ৩০১৯৩ | নাফিজা ৩০১৯৪ | সুমা ৩০১৯৫ | বৃষ্টি ৩০১৯৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

যুথী	ঈশিকা	আফিয়া	জয়া	নিসাত	জেনি	নাবিলা
৩০১৯৭	৩০১৯৮	৩০১৯৯	৩০২০০	৩০২০১	৩০২০২	৩০২০৩

সুমাইয়া	তামান্না	পরমা	উপমা	মিতু	রাবেয়া	মাইশা
৩০২০৪	৩০২০৫	৩০২০৬	৩০২০৭	৩০২০৮	৩০২০৯	৩০২১০

রিমি	ইসরাত	নিতু	শাহরিণ	মৌ	জয়া	সাম্মি
৩০২১১	৩০২১২	৩০২১৩	৩০২১৪	৩০২১৫	৩০২১৬	৩০২১৭

জাফরিনা	ফাহমিনা	কানিজ ফাতেমা	আছমা-উল-হুসনা	ঈষিকা	সম্পা	মিম
৩০২১৮	৩০২১৯	৩০২২০	৩০২২১	৩০২২২	৩০২২৩	৩০২২৪

পূঁজা	আফরোজা	ফারজানা	আশা	রুমানা	নাফিসা	অনুশ্রী
৩০২২৫	৩০২২৬	৩০২২৭	৩০২২৮	৩০২২৯	৩০২৩০	৩০২৩১

সাহরিন	রাফিয়া	সোনিয়া	নিতী	উপমা	অনিকা	অনিকা
৩০২৩২	৩০২৩৩	৩০২৩৪	৩০২৩৫	৩০২৩৬	৩০২৩৭	৩০২৩৮

প্রমি	তোহফা	মিতু	সুইতি	সাদিয়া	প্রিথা	শান্তা
৩০২৩৯	৩০২৪০	৩০২৪১	৩০২৪২	৩০২৪৩	৩০২৪৪	৩০২৪৫

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

ফাতেমা ৩০২৪৬	হাফিজা ৩০২৪৭	যুথী ৩০২৪৮	তিতি ৩০২৪৯	আদিবা ৩০২৫০	সারা ৩০২৫১	তাসনিম ৩০২৫২

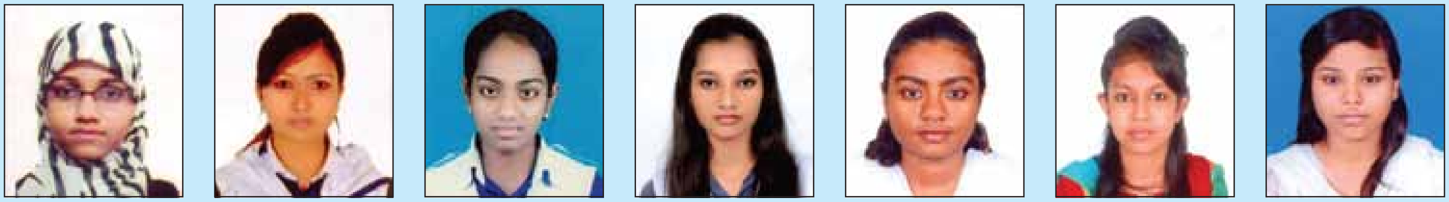

আনজুমান ৩০২৫৩	মৃত্তি ৩০২৫৪	কথা ৩০২৫৫	তন্নী ৩০২৫৬	মোহনা ৩০২৫৭	তানতা ৩০২৫৮	তাহসিন ৩০২৫৯

জান্নাতুল ৩০২৬০	সুস্মি ৩০২৬১	তাসফিয়া ৩০২৬২	নাবিলা ৩০২৬৩	সুসিতা ৩০২৬৪	ফারজানা ৩০২৬৫	চৈতী ৩০২৬৬

বৈশাখী ৩০২৬৭	রহিমা ৩০২৬৮	অন্নি ৩০২৬৯	ফাহিমা ৩০২৭০	সুমাইয়া ৩০২৭১	আর্খি ৩০২৭২	তানজুম ৩০২৭৩

নিশাত ৩০২৭৪	মার্জিহা ৩০২৭৫	মালিহা ৩০২৭৬	ফাতেমা ৩০২৭৭	স্মৃতি ৩০২৭৮	তানহা ৩০২৭৯	সমিত্র ৩০২৮০

রাইমা ৩০২৮১	রিয়া ৩০২৮২	মিম ৩০২৮৩	হিমা ৩০২৮৪	মিম ৩০২৮৫	পাঁপড়ী ৩০২৮৬	রাবেয়া ৩০২৮৭

রাবেয়া ৩০২৮৮	ফারজানা ৩০২৮৯	সিনথিয়া ৩০২৯০	শাহিনুর ৩০২৯১	ইভা ৩০২৯২	দোলন ৩০২৯৩	আকলিমা ৩০২৯৪

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

বিজলী	শ্রাবন্তী	সাথী	মিম	শুকলা	আফরিন	লোপা
৩০২৯৫	৩০২৯৬	৩০২৯৭	৩০২৯৮	৩০২৯৯	৩০৩০০	৩০৩০১

লাবণী	নিশু	নিকিতা	সাদিয়া	সাথী	ফারদিনা	লিমা
৩০৩০২	৩০৩০৩	৩০৩০৪	৩০৩০৫	৩০৩০৬	৩০৩০৭	৩০৩০৮

রিসাত	অর্থি	তানজিল	সুমাইয়া	দৃষ্টি	জেনি	মৌনু
৩০৩০৯	৩০৩১০	৩০৩১১	৩০৩১২	৩০৩১৩	৩০৩১৪	৩০৩১৫

তাহমিনা	রুমানা	সামিয়া	নাবিলা	রিয়া	কাকন	সাদিয়া
৩০৩১৬	৩০৩১৭	৩০৩১৮	৩০৩১৯	৩০৩২০	৩০৩২১	৩০৩২২

চৈতী	প্রমা	নাহিদা	শিখী	উসমি	সামছুননাহার	স্বর্ণা
৩০৩২৩	৩০৩২৪	৩০৩২৫	৩০৩২৬	৩০৩২৭	৩০৩২৮	৩০৩২৯

আফিয়া	পূঁজা	মিতু	আশা	সাদিয়া	নওরা	অরিত্র
৩০৩৩০	৩০৩৩১	৩০৩৩২	৩০৩৩৩	৩০৩৩৪	৩০৩৩৫	৩০৩৩৬

পিয়া	বিথী	সৃষ্টি	নওশিন	সান্তা	খাদিজা	সাবাবা
৩০৩৩৭	৩০৩৩৮	৩০৩৩৯	৩০৩৪০	৩০৩৪১	৩০৩৪২	৩০৩৪৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

অনিকা ৩০৩৪৪	নাজিয়া ৩০৩৪৫	সুমাইয়া ৩০৩৪৬	ফারজানা ৩০৩৪৭	সুমাইয়া ৩০৩৪৮	মঞ্জুরি ৩০৩৪৯	অনিকা ৩০৩৫০

সুমাইয়া ৩০৩৫১	মালিহা ৩০৩৫২	সুমনা ৩০৩৫৩	আয়শা ৩০৩৫৪	ফায়রুজ ৩০৩৫৫	লাকি ৩০৩৫৬	বর্ণি ৩০৩৫৭

ইসরাত ৩০৩৫৮	লুৎফুন্নেসা ৩০৩৫৯	নিগার ৩০৩৬০	সাবরিনা ৩০৩৬১	রত্না ৩০৩৬২	নিপা ৩০৩৬৩	শিউলী ৩০৩৬৪

সুপ্তি ৩০৩৬৫	তৃপ্তি ৩০৩৬৬	অনি ৩০৩৬৭	সামিয়া ৩০৩৬৮	তামান্না ৩০৩৬৯	অর্থি ৩০৩৭০	লিমা ৩০৩৭১

সাকিনা ৩০৩৭২	শারমিন ৩০৩৭৩	আশা ৩০৩৭৪	রিমা ৩০৩৭৫	মুস্তারি ৩০৩৭৬	জান্নাতুল ৩০৩৭৭	নাদিয়া ৩০৩৭৮

তাসনিম ৩০৩৭৯	জিম ৩০৩৮০	নিলীমা ৩০৩৮১	রিপা ৩০৩৮২	জিনী ৩০৩৮৩	মার্জিয়া ৩০৩৮৪	ফারিয়া ৩০৩৮৫

ফারজানা ৩০৩৮৬	সাদিয়া ৩০৩৮৭	নাসরিন ৩০৩৮৮	পিংকী ৩০৩৮৯	আকলিমা ৩০৩৯০	ঈশা ৩০৩৯১	সূচি ৩০৩৯২

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সুচিত্রা	জান্নাতুল	ইশরাত	নাদিয়া	শাহনাজ	খাদিজা	অনিকা
৩০৩৯৩	৩০৩৯৪	৩০৩৯৫	৩০৩৯৬	৩০৩৯৭	৩০৩৯৮	৩০৩৯৯

তামান্না	মার্জিয়া	তাহমিনা	সুমাইয়া	কনা	আফসানা	মৌ
৩০৪০০	৩০৪০১	৩০৪০২	৩০৪০৩	৩০৪০৪	৩০৪০৫	৩০৪০৬

অনিকা	সায়মা	তাহা	সাকিন	লাবিবা	প্রভা	তায়েবা
৩০৪০৭	৩০৪০৮	৩০৪০৯	৩০৪১০	৩০৪১১	৩০৪১২	৩০৪১৩

তারিহা	আসমা	তামান্না	মিম	রিতু	নিশাত	জান্নাতুল
৩০৪১৪	৩০৪১৫	৩০৪১৬	৩০৪১৭	৩০৪১৮	৩০৪১৯	৩০৪২০

জান্নাতুল	জাকিয়া	বুশরা	পূঁজা	লিমা	অনন্যা	মমতাজ
৩০৪২১	৩০৪২২	৩০৪২৩	৩০৪২৪	৩০৪২৫	৩০৪২৬	৩০৪২৭

ফারিয়া	সুমাইয়া	মুক্তা	সূচি	প্রিয়ংকা	হাফসা	রহিমা
৩০৪২৮	৩০৪২৯	৩০৪৩০	৩০৪৩১	৩০৪৩২	৩০৪৩৩	৩০৪৩৪

তিশা	রুমানা	নিশী	লামিয়া	মেহনাজ	রিজিয়া	রিতু
৩০৪৩৫	৩০৪৩৬	৩০৪৩৭	৩০৪৩৮	৩০৪৩৯	৩০৪৪০	৩০৪৪২

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

তাবান্নুম	শারমিন	নিশীতা	তানিয়া	শারমিন	ফারজানা	সাউদা
৩০৪৪৩	৩০৪৪৪	৩০৪৪৫	৩০৪৪৬	৩০৪৪৭	৩০৪৪৮	৩০৪৪৯

আনিসা	রেহানা	রাত্রি	ইতি	মাহমুদা	সুমা	আরবি
৩০৪৫০	৩০৪৫১	৩০৪৫২	৩০৪৫৩	৩০৪৫৪	৩০৪৫৫	৩০৪৫৬

রিয়া	শ্রাবণী	সায়মা	ফাতেমা	নিশাত	তাসমিম	মাহফুজা
৩০৪৫৭	৩০৪৫৮	৩০৪৫৯	৩০৪৬০	৩০৪৬১	৩০৪৬২	৩০৪৬৩

সুমাইয়া	শ্রাবণী	জিম	সুমিয়া	ইশরাত	আশা	নাহার
৩০৪৬৪	৩০৪৬৫	৩০৪৬৬	৩০৪৬৭	৩০৪৬৮	৩০৪৬৯	৩০৪৭০

জান্নাতুল	রিতা	এ্যানি	রাবেয়া	মিম	মিম	বুশরা
৩০৪৭১	৩০৪৭২	৩০৪৭৩	৩০৪৭৪	৩০৪৭৫	৩০৪৭৬	৩০৪৭৭

সানজিদা	ঐশি	রনি	সাদিয়া	আফিয়া	মায়শা	প্রেমা
৩০৪৭৮	৩০৪৭৯	৩০৪৮০	৩০৪৮১	৩০৪৮২	৩০৪৮৩	৩০৪৮৪

মেদুরি	আফসানা	মিষ্টি	মুন	শিখা	আফসারা	শান্তা
৩০৪৮৫	৩০৪৮৬	৩০৪৮৭	৩০৪৮৮	৩০৪৮৯	৩০৪৯০	৩০৪৯১

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

রাইশা	সানজিদা	নিশা	মিম্মা	লামিয়া	লতা	পিংকি
৩০৪৯২	৩০৪৯৩	৩০৪৯৪	৩০৪৯৫	৩০৪৯৬	৩০৪৯৭	৩০৪৯৮

বৃষ্টি	সুক্তি	দিতি	তানিয়া	সানজিদা	মিম	রুহি
৩০৪৯৯	৩০৫০০	৩০৫০১	৩০৫০২	৩০৫০৩	৩০৫০৪	৩০৫০৫

জুই	অনিকা	আরিফা	নাদিয়া	লতা	তুসি	সঞ্চরি
৩০৫০৬	৩০৫০৭	৩০৫০৮	৩০৫০৯	৩০৫১০	৩০৫১১	৩০৫১২

বিনা	নাজনিন	মৃদুলা	ইমু	মলি	তুশি	তানজিলা
৩০৫১৩	৩০৫১৪	৩০৫১৫	৩০৫১৬	৩০৫১৭	৩০৫১৮	৩০৫১৯

সানজিদা	কেয়া	নাদিয়া	মিম	ফারিন	শ্রাবণী	শিরোপা
৩০৫২০	৩০৫২১	৩০৫২২	৩০৫২৩	৩০৫২৪	৩০৫২৫	৩০৫২৬

মনিষা	সানজিদা	শ্যামলী	ফারিয়া	খাদিজা	প্রিয়া	অর্নি
৩০৫২৭	৩০৫২৮	৩০৫২৯	৩০৫৩০	৩০৫৩১	৩০৫৩২	৩০৫৩৩

তাজরিন	মাহি	সঞ্চিতা	ফাহিমা	সুমাইয়া	মারিয়া	পিংকি
৩০৫৩৪	৩০৫৩৫	৩০৫৩৬	৩০৫৩৭	৩০৫৩৮	৩০৫৩৯	৩০৫৪০

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সেতু	জেবিন	যুথী	মরিয়ম	অনিকা	মাইশারা	নিধি
৩০৫৪১	৩০৫৪২	৩০৫৪৩	৩০৫৪৪	৩০৫৪৫	৩০৫৪৬	৩০৫৪৭

মিমি	ফারিয়া	সালফা	ঊর্মি	মিম	রুমি	তানহা
৩০৫৪৮	৩০৫৪৯	৩০৫৫০	৩০৫৫১	৩০৫৫২	৩০৫৫৩	৩০৫৫৪

অনিকা	মুনিরা	তৃষা	আরিফা	অন্বেষা	ফারহানা	কেয়া
৩০৫৫৫	৩০৫৫৬	৩০৫৫৭	৩০৫৫৮	৩০৫৫৯	৩০৫৬০	৩০৫৬১

ইতি	ফাইজা	মনিষা	মনিরা	সোনিয়া	হিয়া	এশিয়া
৩০৫৬২	৩০৫৬৩	৩০৫৬৪	৩০৫৬৫	৩০৫৬৬	৩০৫৬৭	৩০৫৬৮

রুবিনা	মৌমিতা	নিশি	ফারিন	রোকসানা	আঁখি	লিজা
৩০৫৬৯	৩০৫৭০	৩০৫৭১	৩০৫৭২	৩০৫৭৩	৩০৫৭৪	৩০৫৭৫

স্বর্ণালী	আয়শা	জুঁই	তানিয়া	খাদিজা	রাফিন	সুমনা
৩০৫৭৬	৩০৫৭৭	৩০৫৭৮	৩০৫৭৯	৩০৫৮০	৩০৫৮১	৩০৫৮২

কেয়া	প্রিতি	পারিশা	রিমা	রিমু	রাখি	নিথী
৩০৫৮৩	৩০৫৮৪	৩০৫৮৫	৩০৫৮৬	৩০৫৮৭	৩০৫৮৮	৩০৫৮৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সাবিহা	হাফিজা	আফরোজা	রুচিরা	সুমাইয়া	সেতু	মনিকা
৩০৫৯০	৩০৫৯১	৩০৫৯২	৩০৫৯৩	৩০৫৯৪	৩০৫৯৫	৩০৫৯৬

নিশী	সুস্মি	মিতু	সুমাইয়া	রিয়া	শামিমা	সানজিদা
৩০৫৯৭	৩০৫৯৮	৩০৬০০	৩০৬০১	৩০৬০২	৩০৬০৩	৩০৬০৪

কানিজ	তামান্না	তামান্না	খালেদা	সুমনা	রোকসানা	লাকি
৩০৬০৫	৩০৬০৬	৩০৬০৭	৩০৬০৮	৩০৬০৯	৩০৬১০	৩০৬১১

নুরি	সুমা	নিলা	দুর্দানা	মিম	সুমাইয়া	আয়রিন
৩০৬১২	৩০৬১৩	৩০৬১৪	৩০৬১৫	৩০৬১৬	৩০৬১৭	৩০৬১৮

আঁখি	শবনম	নুপুর	ইরিন	আলিশা	রত্না	সাম্মি
৩০৬১৯	৩০৬২০	৩০৬২২	৩০৬২৩	৩০৬২৪	৩০৬২৫	৩০৬২৬

চুমকি	নাবিলা	রাজিয়া	তানিয়া	তাসমিয়াহ	জয়া	ময়না
৩০৬২৭	৩০৬২৮	৩০৬২৯	৩০৬৩০	৩০৬৩১	৩০৬৩২	৩০৬৩৩

আজমিন	মিম	ছবি	জোহরা	ফারহানা	তায়েবা	জান্নাতুল
৩০৬৩৪	৩০৬৩৫	৩০৬৩৬	৩০৬৩৭	৩০৬৩৮	৩০৬৩৯	৩০৬৪০

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

কাকন ৩০৬৪১	দিপ্তী ৩০৬৪২	নাজনিম ৩০৬৪৩	আনাম ৩০৬৪৪	মৌরিন ৩০৬৪৫	অনিমা ৩০৬৪৬	নাহিদা ৩০৬৪৭

মরিয়ম ৩০৬৪৮	ঝুমুর ৩০৬৪৯	খাদিজাতুল ৩০৬৫০	তিথী ৩০৬৫১	ইয়াছমিন ৩০৬৫২	হাদলি ৩০৬৫৩	লাবণ্য ৩০৬৫৪

ফাতেমা ৩০৬৫৫	তামান্না ৩০৬৫৬	শামরিন ৩০৬৫৭	রুকসাত ৩০৬৫৮	সুমাইয়া ৩০৬৫৯	রত্না ৩০৬৬০	মনিষা ৩০৬৬১

মিম ৩০৬৬২	আয়শা ৩০৬৬৩	ইমা ৩০৬৬৪	ফাহমিদা ৩০৬৬৫	ইসরাত ৩০৬৬৬	সায়মা ৩০৬৬৭	মাহমুদা ৩০৬৬৮

নুজহাত ৩০৬৬৯	সাদিয়া ৩০৬৭০	ফারজানা ৩০৬৭১	রিমা ৩০৬৭২	মিম ৩০৬৭৩	রিভা ৩০৬৭৪	নীদ ৩০৬৭৫

ফারিহা ৩০৬৭৬	ফাতেমা ৩০৬৭৭	তানমিম ৩০৬৭৮	আসমা ৩০৬৭৯	আশা ৩০৬৮০	নুশরাত ৩০৬৮১	জান্নাতুল ৩০৬৮২

উপা ৩০৬৮৩	তামান্না ৩০৬৮৪	পিয়া ৩০৬৮৫	ঈশা ৩০৬৮৬	তিথী ৩০৬৮৭	সাদিয়া ৩০৬৮৮	ফাতেমা ৩০৬৮৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

পান্না	মৃদুলা	তাহেরা	রিতু	বৃষ্টি	তানিয়া	বীথি
৩০৬৯০	৩০৬৯১	৩০৬৯২	৩০৬৯৩	৩০৬৯৪	৩০৬৯৫	৩০৬৯৬

স্বর্ণালী	আয়শা	নাজনিন	লাবণী	লিমা	হানি	আফরিনা
৩০৬৯৭	৩০৬৯৮	৩০৬৯৯	৩০৭০০	৩০৭০১	৩০৭০২	৩০৭০৩

নাদিয়া	শোভা	তাহমিনা	সামিয়া	তনিমা	টুম্পা	মাহফুজা
৩০৭০৪	৩০৭০৫	৩০৭০৬	৩০৭০৭	৩০৭০৮	৩০৭০৯	৩০৭১০

মুনা	সুমি	সৃষ্টি	আকলিমা	সাদিয়া	মার্সিয়া	জান্নাহ
৩০৭১১	৩০৭১২	৩০৭১৩	৩০৭১৪	৩০৭১৫	৩০৭১৬	৩০৭১৭

ফারজানা	জান্নাতুন	সুদিপ্তা	পপি	লিজা	মেঘলা	রিপা
৩০৭১৮	৩০৭১৯	৩০৭২০	৩০৭২১	৩০৭২২	৩০৭২৩	৩০৭২৪

তাজরি	তানিয়া	সারাহ	রাফি	সুমাইয়া	সাথী	তানজুম
৩০৭২৫	৩০৭২৬	৩০৭২৭	৩০৭২৯	৩০৭৩০	৩০৭৩২	৩০৭৩৩

পৌশি	আজমেরি	সাইকা	হেনা	সুস্মিতা	মলি	নাজনিন
৩০৭৩৪	৩০৭৩৫	৩০৭৩৬	৩০৭৩৭	৩০৭৩৮	৩০৭৩৯	৩০৭৪০

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

লিজা	নিপু	সুমাইয়া	জাইমা	সাম্মি	রিফিয়া	স্বপ্নিল
৩০৭৪১	৩০৭৪২	৩০৭৪৩	৩০৭৪৪	৩০৭৪৫	৩০৭৪৬	৩০৭৪৭

তৃষা	নিলা	মিম	সানজিদা	তামান্না	শাহনাজ	বীথি
৩০৭৪৮	৩০৭৪৯	৩০৭৫০	৩০৭৫১	৩০৭৫২	৩০৭৫৩	৩০৭৫৪

সুচনা	নজহাত	শবনম	নাফিসা	অনিকা	পার্বনী	নুদমিলা
৩০৭৫৫	৩০৭৫৬	৩০৭৫৭	৩০৭৫৮	৩০৭৫৯	৩০৭৬০	৩০৭৬১

শাহরিন	নাজিয়া	শাবিহা	নাজিয়া	রাকা	বর্ণালী	রাইশা
৩০৭৬২	৩০৭৬৩	৩০৭৬৪	৩০৭৬৫	৩০৭৬৬	৩০৭৬৭	৩০৭৬৮

মাধুরী	আফরিদা	জেমিন	নাবিহা	রুবি	ইফতাতুন	আসিফ
৩০৭৬৯	৩০৭৭০	৩০৭৭১	৩০৭৭২	৩০৭৭৩	৩০৭৭৪	৩০৭৭৫

ফাতিন	আনাস	শাফি	তুয়ান	অনিম	ইরফান	আহসান
৩০৭৭৬	৩০৭৭৭	৩০৭৭৮	৩০৭৭৯	৩০৭৮০	৩০৭৮১	৩০৭৮২

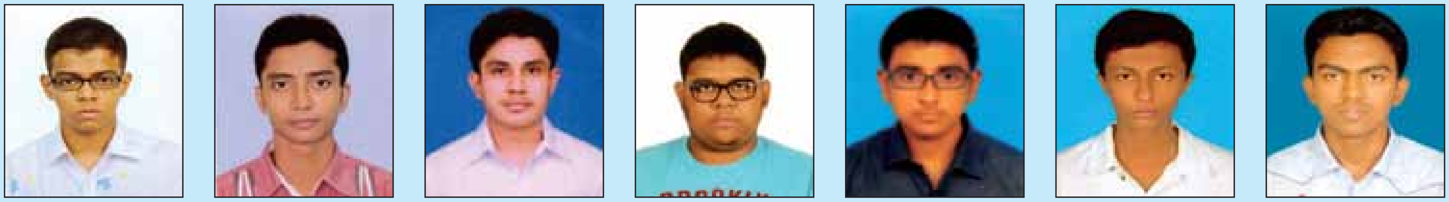

আলভি	তাসদিদুল	মাহমুদুর	আসিক	ফারহান	ইমতিয়াজ	রায়হান
৩০৭৮৩	৩০৭৮৪	৩০৭৮৫	৩০৭৮৬	৩০৭৮৭	৩০৭৮৮	৩০৭৮৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

ফারহান
৩০৭৯০

ইফাজ
৩০৭৯১

ফাইজুল
৩০৭৯২

সাকিব
৩০৭৯৩

নুহাস
৩০৭৯৪

হামিম
৩০৭৯৫

তাহমিন
৩০৭৯৬

নাহিদ
৩০৭৯৭

তানভির
৩০৭৯৮

নাভেদ
৩০৭৯৯

জামান
৩০৮০০

আবির
৩০৮০১

শিবলি
৩০৮০২

মাহফুজ
৩০৮০৩

আবু তালেব
৩০৮০৪

রাকিব
৩০৮০৫

বাপ্পি
৩০৮০৬

মুহাইমিনুল
৩০৮০৭

সাব্বির
৩০৮০৮

ফারহান
৩০৮০৯

মাশরুর
৩০৮১০

রাজিব
৩০৮১১

সাইদ
৩০৮১২

শোভন
৩০৮১৩

আবদুল্লাহ
৩০৮১৪

সাকলাইন
৩০৮১৫

শাওন
৩০৮১৬

জাওয়াদ
৩০৮১৭

পারভেজ
৩০৮১৮

ফাহাদ
৩০৮১৯

রায়হান
৩০৮২০

আরাফাত
৩০৮২১

ফরহাদ
৩০৮২২

মিজানুর
৩০৮২৩

কাউছার
৩০৮২৪

মাহতাব
৩০৮২৫

বিপু
৩০৮২৬

কাদিরিল
৩০৮২৭

রাকিবুল
৩০৮২৮

তারিকুল
৩০৮২৯

রেদওয়ানুল
৩০৮৩০

নাহিমুর
৩০৮৩১

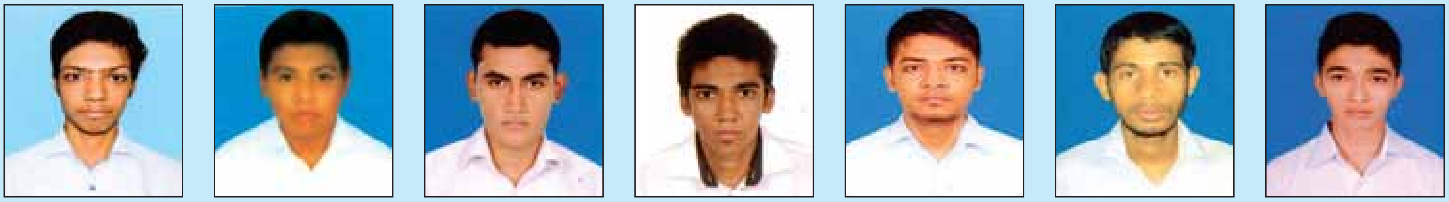

কৌশিক
৩০৮৩২

অভি
৩০৮৩৩

উমর ফারুক
৩০৮৩৪

নাবিদ
৩০৮৩৫

সানি
৩০৮৩৬

সাইদ
৩০৮৩৭

মুহাইমিনুল
৩০৮৩৮

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

উমর ফারুক	রাব্বি	রিপন	পলাশ	উজ্জল	নাছির	শাফ্ফাত
৩০৮৩৯	৩০৮৪০	৩০৮৪১	৩০৮৪২	৩০৮৪৩	৩০৮৪৪	৩০৮৪৫

ইমন	লিমন	মুনতাসির	আবদুল্লাহ	ফয়সাল	রিফাত	হৃদয়
৩০৮৪৬	৩০৮৪৭	৩০৮৪৮	৩০৮৪৯	৩০৮৫০	৩০৮৫১	৩০৮৫২

জুবায়ের	কথা	অতিশ	ফয়সাল	অজয়	রবিন	আশিক
৩০৮৫৩	৩০৮৫৪	৩০৮৫৫	৩০৮৫৬	৩০৮৫৭	৩০৮৫৮	৩০৮৫৯

অমি	ফেরদৌস	পলাশ	আবিদ	বাদন	শাহাদাত	সিরাজুস
৩০৮৬০	৩০৮৬১	৩০৮৬২	৩০৮৬৩	৩০৮৬৪	৩০৮৬৫	৩০৮৬৬

ইবনে সিনা	তারভীর	তানজিল	তৌফিকুল	মুজিবুর	শুভ	তকবির
৩০৮৬৭	৩০৮৬৮	৩০৮৬৯	৩০৮৭০	৩০৮৭১	৩০৮৭২	৩০৮৭৩

আবদুল্লাহ	আলভী	মুফাজ্জল	রায়হানুল	ফারিহিন	আল-আমিন	শুভম
৩০৮৭৪	৩০৮৭৫	৩০৮৭৬	৩০৮৭৭	৩০৮৭৮	৩০৮৭৯	৩০৮৮০

রফিবুল	শাহাবুদ্দিন	ফরহাদ	রুবায়েত	ইনজামুল	এমাজ	আবজাল
৩০৮৮১	৩০৮৮২	৩০৮৮৩	৩০৮৮৪	৩০৮৮৫	৩০৮৮৬	৩০৮৮৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

আশিস	ফারহান	নাবিল	জনি	শালেহিন	মুশফিকুর	তাহমিদুল
৩০৮৮৮	৩০৮৮৯	৩০৮৯০	৩০৮৯১	৩০৮৯২	৩০৮৯৩	৩০৮৯৪

হাবিব	ইরফান	পারভেজ	তানভীন	মোয়াজ্জেম	রাজু	শাখাওয়াত
৩০৮৯৫	৩০৮৯৬	৩০৮৯৭	৩০৮৯৮	৩০৮৯৯	৩০৯০০	৩০৯০১

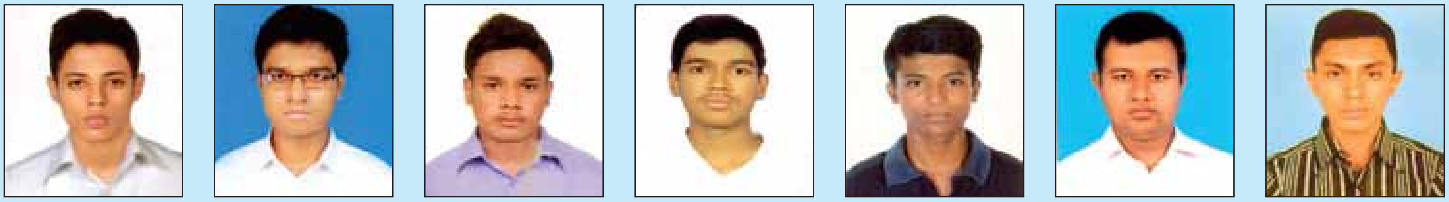

হাসিন	রুপম	সাইমন	রায়হান	আবরার	সামিউল	আরিফ
৩০৯০২	৩০৯০৩	৩০৯০৪	৩০৯০৫	৩০৯০৬	৩০৯০৭	৩০৯০৮

রাকিব	ফেরদৌস	আকিব	রাব্বি	ফয়সাল	সাইদ	রাফি
৩০৯০৯	৩০৯১০	৩০৯১১	৩০৯১২	৩০৯১৩	৩০৯১৪	৩০৯১৫

রবিন	রাকিব	জুয়েল	আল-আমিন	শামিম	মুহাইমিনুল	তানজিল
৩০৯১৬	৩০৯১৭	৩০৯১৮	৩০৯১৯	৩০৯২০	৩০৯২১	৩০৯২২

জামি	মিরাজুল	বিজয়	রাকিব	সিফাত	রহিম	শুভ
৩০৯২৩	৩০৯২৪	৩০৯২৫	৩০৯২৬	৩০৯২৭	৩০৯২৮	৩০৯২৯

শান্ত	মামুন	মাহবুব	ইমন	তাজবিউল	আহসান	শুভদিপ
৩০৯৩০	৩০৯৩১	৩০৯৩২	৩০৯৩৩	৩০৯৩৪	৩০৯৩৫	৩০৯৩৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

ফরিদ	ফাইম	আরিবুল	হিমাদ্রী	শাহরুখ	কামরুল	রানা
৩০৯৩৭	৩০৯৩৮	৩০৯৩৯	৩০৯৪০	৩০৯৪১	৩০৯৪২	৩০৯৪৩

সাজ্জাত	সাব্বির	আরিফুল	শাহরিয়ার	আবু বকর	নয়ন	সাবিত
৩০৯৪৪	৩০৯৪৫	৩০৯৪৬	৩০৯৪৭	৩০৯৪৮	৩০৯৪৯	৩০৯৫০

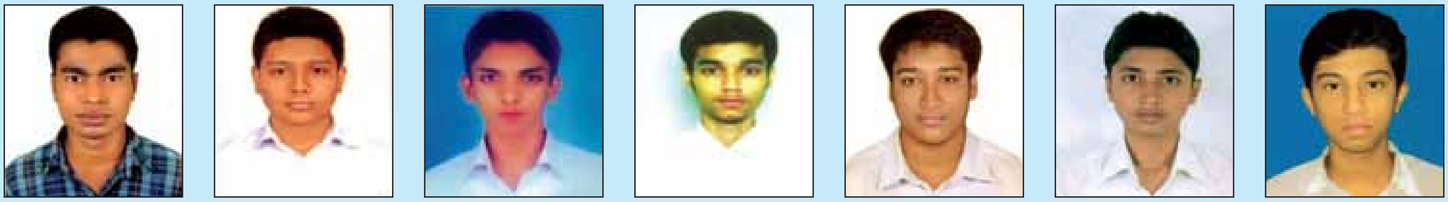

শরিফ	আরিফুল	সাদমান	ধ্রুব	সোহিব	অর্নব	রাফি
৩০৯৫১	৩০৯৫২	৩০৯৫৩	৩০৯৫৪	৩০৯৫৫	৩০৯৫৬	৩০৯৫৭

অনিন্দ	ইউসুফ	আরমান	হিরা	মোতাফিজ	আতিক	রাসেল
৩০৯৫৮	৩০৯৫৯	৩০৯৬০	৩০৯৬১	৩০৯৬২	৩০৯৬৩	৩০৯৬৪

রাকিবুল	ইউসুফ	অনুপম	নাহিদ	সাইদ	নাইমুর	সোহেল
৩০৯৬৫	৩০৯৬৬	৩০৯৬৭	৩০৯৬৮	৩০৯৬৯	৩০৯৭০	৩০৯৭১

সজিব	কামরুল	ফয়সাল	রাফি	তউসিফ	অনিক	রাফি
৩০৯৭২	৩০৯৭৩	৩০৯৭৪	৩০৯৭৫	৩০৯৭৬	৩০৯৭৭	৩০৯৭৮

বাহারুল	ইসতিয়াক	শফিকুল	মাহাবুব	রাহাত	রাব্বি	সাইফ
৩০৯৭৯	৩০৯৮০	৩০৯৮১	৩০৯৮২	৩০৯৮৩	৩০৯৮৪	৩০৯৮৫

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

শাওন	সাকিব	রাকিব	সুজন	সাব্বির	ফারহান	রাকিবুল
৩০৯৮৬	৩০৯৮৭	৩০৯৮৮	৩০৯৮৯	৩০৯৯০	৩০৯৯১	৩০৯৯২

মিনহাজুল	রিয়াজুল	রাসেল	মামুন	নাছির	রাব্বি	নূর
৩০৯৯৩	৩০৯৯৪	৩০৯৯৫	৩০৯৯৬	৩০৯৯৭	৩০৯৯৮	৩০৯৯৯

জোবায়েত	আরিফুল	ইমু	আহনাফ	সজিব	তানজিল	তানজিমুল
৩১০০০	৩১০০১	৩১০০২	৩১০০৩	৩১০০৪	৩১০০৫	৩১০০৬

রাসেদুল	সাব্বির	রাফিউল	মোস্তাক	ফায়জুল	অনিক	তুর্জ
৩১০০৭	৩১০০৮	৩১০০৯	৩১০১০	৩১০১১	৩১০১২	৩১০১৩

সানি	সাজ্জাত	নাবিদ	সিরাজুল	সাবিদ	রবিউল	শামীম
৩১০১৪	৩১০১৫	৩১০১৬	৩১০১৭	৩১০১৮	৩১০১৯	৩১০২০

রিহান	তুষার	জাহিন	প্রান্ত	আল-আমিন	মিঠুন	আরেফিন
৩১০২১	৩১০২২	৩১০২৩	৩১০২৪	৩১০২৫	৩১০২৬	৩১০২৭

রাকিব	রাসেল	প্রিতম	ফয়সাল	প্রণয়	আহসান	সাকিল
৩১০২৮	৩১০২৯	৩১০৩০	৩১০৩১	৩১০৩২	৩১০৩৩	৩১০৩৪

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

শামীম ৩১০৩৫	হাবিব ৩১০৩৬	ওবায়দুর ৩১০৩৭	রনি ৩১০৩৮	শাওন ৩১০৩৯	আশাবুল ৩১০৪০	মুনতাকিম ৩১০৪১

আজিজ ৩১০৪২	মৃদুল ৩১০৪৩	রাহাত ৩১০৪৪	রাব্বি ৩১০৪৫	শাহরিয়ার ৩১০৪৬	আশিফুর ৩১০৪৭	কামাইফ ৩১০৪৮

পাবেল ৩১০৪৯	সাইফুল ৩১০৫০	সাইফ ৩১০৫১	রিফাত ৩১০৫২	হাসিবুর ৩১০৫৩	মিনহাজ ৩১০৫৪	শাফি ৩১০৫৫

মোহাইমিন ৩১০৫৬	তমাল ৩১০৫৭	আলিফ ৩১০৫৮	খোরশেদ ৩১০৫৯	রেদোয়ানুল ৩১০৬০	মুহ্তাসিন ৩১০৬১	রায়হান ৩১০৬২

রেদোয়ান ৩১০৬৩	সাজ্জাদ ৩১০৬৪	রউফ ৩১০৬৫	আরমান ৩১০৬৬	রাজন ৩১০৬৭	রিফাত ৩১০৬৮	কাজল ৩১০৬৯

পারভেদ ৩১০৭০	সজিব ৩১০৭১	ফাহাদ ৩১০৭২	ইমন ৩১০৭৩	মুশফিক ৩১০৭৪	সাব্বির ৩১০৭৫	শরিফুল ৩১০৭৬

ইশতিয়াক ৩১০৭৭	শুভ ৩১০৭৮	শুভদা ৩১০৭৯	সোলায়মান ৩১০৮০	পিয়াস ৩১০৮১	নাহিদ ৩১০৮২	সাকিব ৩১০৮৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

খালেদ	সামির	হাসিবুল	তানভীর	মেহেদী	আশিক	নাসিব
৩১০৮৪	৩১০৮৫	৩১০৮৬	৩১০৮৭	৩১০৮৮	৩১০৮৯	৩১০৯০

রবিউল	ফয়েজ	রহমান	আবদুল্লাহ	হৃদয়	সাকিব	মুনির
৩১০৯১	৩১০৯২	৩১০৯৩	৩১০৯৪	৩১০৯৫	৩১০৯৬	৩১০৯৭

মইন	মাহমুদুল	রাকিব	মেহরাজুল	আল-নূর	প্রিতম	শুভ
৩১০৯৮	৩১০৯৯	৩১১০০	৩১১০১	৩১১০২	৩১১০৩	৩১১০৪

আশিকুর	শামস	নাহিদ	বেলায়েত	শাজিদুর	আরাফাত	সাব্বির
৩১১০৫	৩১১০৬	৩১১০৭	৩১১০৮	৩১১০৯	৩১১১০	৩১১১১

রাব্বি	প্রাপ্পা	আবির	আলিফ	রাহাত	সৌরভ	নাজমুল
৩১১১২	৩১১১৩	৩১১১৪	৩১১১৫	৩১১১৬	৩১১১৭	৩১১১৮

শাকিল	শুভ	আকিব	সোয়েব	রাহান	মোস্তফা	অপু
৩১১১৯	৩১১২০	৩১১২১	৩১১২২	৩১১২৩	৩১১২৪	৩১১২৫

পারভেজ	উজ্জল	হাসিব	শাহরিয়ার	সাহা	সালেহ	ওয়ায়েস
৩১১২৬	৩১১২৭	৩১১২৮	৩১১২৯	৩১১৩০	৩১১৩১	৩১১৩২

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

রাফসান ৩১১৩৩	রাব্বি ৩১১৩৪	সাজিদ ৩১১৩৫	রিফাত ৩১১৩৬	লিঙ্কন ৩১১৩৭	মেহেদী ৩১১৩৮	গালিব ৩১১৩৯

সালমান ৩১১৪০	শফিকুল ৩১১৪১	রাব্বানী ৩১১৪২	আমিনুল ৩১১৪৩	অপু ৩১১৪৪	সাফিজ ৩১১৪৫	আরাফাত ৩১১৪৬

জাকির ৩১১৪৭	রফিকুল ৩১১৪৯	হাসিবুল ৩১১৫০	সবুর ৩১১৫১	সুদিপ্ত ৩১১৫২	সোহাগ ৩১১৫৩	নায়িম ৩১১৫৪

হাবিব ৩১১৫৫	বিদ্বান ৩১১৫৬	সাইদ ৩১১৫৭	সিয়াম ৩১১৫৮	ইমরান ৩১১৫৯	তানভীন ৩১১৬০	মেহেদী ৩১১৬১

ইমতিয়াজ ৩১১৬২	ইসতিয়াক ৩১১৬৩	আহাদ ৩১১৬৪	মঈন ৩১১৬৫	সাফায়ত ৩১১৬৭	তাহমিদুল ৩১১৬৮	ফাহনুল ৩১১৬৯

দিপ্ত ৩১১৭০	রাকিবুল ৩১১৭১	আবির ৩১১৭২	শাহদাত ৩১১৭৩	রাকিব ৩১১৭৪	মাহবুব ৩১১৭৫	রনি ৩১১৭৬

রাফি ৩১১৭৭	সুমন ৩১১৭৮	অনিক ৩১১৭৯	রিশাত ৩১১৮০	সেলিম ৩১১৮১	সাব্বির ৩১১৮২	মঞ্জুর ৩১১৮৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

মুকিত ৩১১৮৪	ফয়সাল ৩১১৮৫	বাশার ৩১১৮৬	মেহেদী ৩১১৮৭	তোজাম্মেল ৩১১৮৮	তাসমির ৩১১৮৯	শরিফ ৩১১৯০

রিদম ৩১১৯১	মুহিন ৩১১৯২	রাজন ৩১১৯৩	দিবস ৩১১৯৪	সোহান ৩১১৯৫	হাবিব ৩১১৯৬	আরেফিন ৩১১৯৭

ইফাজ ৩১১৯৮	নাহিয়ান ৩১১৯৯	ফাহাদ ৩১২০০	নাজমুল ৩১২০১	মুহিবুল ৩১২০২	রিপন ৩১২০৩	মুহাইমিনুল ৩১২০৪

হামিদ ৩১২০৫	রাব্বি ৩১২০৬	সজল ৩১২০৭	তানভীর ৩১২০৮	মাসুদ ৩১২০৯	মাসুম ৩১২১০	আরজু ৩১২১১

বাপ্পি ৩১২১২	পারভেজ ৩১২১৩	সাব্বির ৩১২১৪	রানা ৩১২১৫	শান্ত ৩১২১৬	হৃদয় ৩১২১৭	মেহেদী ৩১২১৮

আনিস ৩১২১৯	রায়হান ৩১২২০	সামি ৩১২২১	ফাহাদ ৩১২২২	আতিক ৩১২২৩	পরশ ৩১২২৪	সাজ্জাদ ৩১২২৫

কামরুল ৩১২২৬	সুদিপ্ত ৩১২২৭	সাকিব ৩১২২৮	আশরাফুল ৩১২২৯	বাছির ৩১২৩০	সিদ্দিক ৩১২৩১	বায়রন ৩১২৩২

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সাজ্জাদ	জাহিদ	ফয়সাল	সাইফুল	আকাশ	নাজিম	বাপ্পি
৩১২৩৩	৩১২৩৪	৩১২৩৫	৩১২৩৬	৩১২৩৭	৩১২৩৮	৩১২৩৯

অরবি	নাদভি	তন্ময়	হেমায়েত	মুহসিন	আকন	শাখাওয়াত
৩১২৪০	৩১২৪১	৩১২৪২	৩১২৪৩	৩১২৪৪	৩১২৪৫	৩১২৪৬

ফরহাদ	আল-আমিন	মাহমুদ	মেহরাব	ফয়সাল	কাশিক	হাসান
৩১২৪৭	৩১২৪৮	৩১২৪৯	৩১২৫০	৩১২৫১	৩১২৫২	৩১২৫৩

জাহিদ	শুভ	ফাহিম	রাশেদুর	রায়হান	আরাফাত	মল্লিক
৩১২৫৪	৩১২৫৫	৩১২৫৬	৩১২৫৭	৩১২৫৮	৩১২৫৯	৩১২৬০

জিসান	আলিফ	আওরাঙ্গজেব	রাজু	কাউছার	মুশফিক	মিজান
৩১২৬১	৩১২৬২	৩১২৬৩	৩১২৬৪	৩১২৬৫	৩১২৬৬	৩১২৬৭

আসিফ	বাব্বি	জামান	ফয়সাল	সাকিব	অবিজিত	শরিফ
৩১২৬৮	৩১২৬৯	৩১২৭০	৩১২৭১	৩১২৭২	৩১২৭৩	৩১২৭৪

মিরাজ	শান্ত	মুসা	রিজন	আশিক	আমির	সোহান
৩১২৭৫	৩১২৭৬	৩১২৭৭	৩১২৭৮	৩১২৭৯	৩১২৮০	৩১২৮১

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

জাহিদ ৩১২৮২	নিলয় ৩১২৮৩	ইয়াছিন ৩১২৮৪	সিদ্দিক ৩১২৮৫	নুহাস ৩১২৮৬	নয়ন ৩১২৮৭	আবিদ ৩১২৮৮

সজিব ৩১২৮৯	মুজাম্মেল ৩১২৯০	রাব্বি ৩১২৯১	ইজেল ৩১২৯২	বর্ণ ৩১২৯৩	মুনির ৩১২৯৪	আবিদ ৩১২৯৫

শিহাব ৩১২৯৬	হৃদয় ৩১২৯৭	আল-আমিন ৩১২৯৮	উমর ৩১২৯৯	মনোয়ার ৩১৩০০	ফুয়াদ ৩১৩০১	সাইফ ৩১৩০২

হিমেল ৩১৩০৩	মোস্তাসিম ৩১৩০৪	আসাদ ৩১৩০৫	ওফাজ ৩১৩০৬	সোহেল ৩১৩০৭	শিথিল ৩১৩০৮	রানা ৩১৩০৯

হৃদয় ৩১৩১০	নাহিয়ান ৩১৩১১	কাউছার ৩১৩১২	তনয় ৩১৩১৩	মারুফ ৩১৩১৪	তন্ময় ৩১৩১৫	রবিন ৩১৩১৬

মুজাহিদ ৩১৩১৭	আকিবুল ৩১৩১৮	জুবায়ের ৩১৩১৯	মিজান ৩১৩২০	আসাদ ৩১৩২১	হিমেল ৩১৩২২	সামিউল ৩১৩২৩

রফিকুল ৩১৩২৪	রাহাদ ৩১৩২৫	আশিক ৩১৩২৬	তোহা ৩১৩২৭	রায়হান ৩১৩২৮	তুষার ৩১৩২৯	আবদুল্লাহ ৩১৩৩০

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

তানভীর ৩১৩৩১	আবির ৩১৩৩২	রনি ৩১৩৩৩	টুটুল ৩১৩৩৪	মুরছালিন ৩১৩৩৫	হাসান ৩১৩৩৬	রিদওয়ান ৩১৩৩৭

তামিম ৩১৩৩৮	শান্ত ৩১৩৩৯	আল-আমিন ৩১৩৪০	আয়ন ৩১৩৪১	তাহমিদ ৩১৩৪২	তানজিম ৩১৩৪৩	জিসান ৩১৩৪৪

আরগুদে ৩১৩৪৫	ইমন ৩১৩৪৬	কবির ৩১৩৪৭	তুর্জ ৩১৩৪৮	ফারজান ৩১৩৪৯	আশরাফুল ৩১৩৫০	সিয়াম ৩১৩৫১

হাকিম ৩১৩৫২	সালভী ৩১৩৫৩	আলভী ৩১৩৫৪	আকবর ৩১৩৫৫	আশিফ ৩১৩৫৬	জামিল ৩১৩৫৭	পারভেজ ৩১৩৫৮

অনন্ত ৩১৩৫৯	আর্কু ৩১৩৬০	অরূপ ৩১৩৬১	দিপ্ত ৩১৩৬২	মেহেদী ৩১৩৬৩	শান্ত ৩১৩৬৪	হৃদয় ৩১৩৬৫

আরেফিন ৩১৩৬৬	ইমরান ৩১৩৬৭	ইমন ৩১৩৬৮	হামজা ৩১৩৬৯	আরেফিন ৩১৩৭০	নূর আলম ৩১৩৭১	রিয়াজুল ৩১৩৭২

অর্গ ৩১৩৭৩	আদনান ৩১৩৭৪	নয়ন ৩১৩৭৫	হৃদয় ৩১৩৭৬	মেহেরুল ৩১৩৭৭	রবিউল ৩১৩৭৮	অদিত্ত ৩১৩৭৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

কুশিকুর ৩১৩৮০	সাদেক ৩১৩৮১	আরিফিন ৩১৩৮২	তন্ময় ৩১৩৮৩	সাকিব ৩১৩৮৪	রাব্বি ৩১৩৮৫	তৌহিদ ৩১৩৮৬

রাহাতুল ৩১৩৮৭	আকমল ৩১৩৮৮	শফিকুল ৩১৩৮৯	আরমান ৩১৩৯০	আরিফ ৩১৩৯১	রাফসান ৩১৩৯২	সাজেদ ৩১৩৯৩

সাখাওয়াত ৩১৩৯৪	শুভ ৩১৩৯৫	আল-আমিন ৩১৩৯৬	হৃদয় ৩১৩৯৭	মিজান ৩১৩৯৮	শাহরিয়ার ৩১৩৯৯	অর্নব ৩১৪০০

দিদার ৩১৪০১	করিম ৩১৪০২	তারিকুল ৩১৪০৩	রাব্বি ৩১৪০৪	তানজিমুল ৩১৪০৫	তুষার ৩১৪০৬	তুষার ৩১৪০৭

জামান ৩১৪০৮	করিম ৩১৪০৯	মাসনুর ৩১৪১০	আনোয়ার ৩১৪১১	রফিকুল ৩১৪১২	শরিফুল ৩১৪১৩	মুন ৩১৪১৪

সামসুজ্জামান ৩১৪১৫	ইকবার ৩১৪১৬	শরিফ ৩১৪১৭	আবির ৩১৪১৮	মুহেবুল্লাহ ৩১৪১৯	শাফি ৩১৪২০	দস্তগির ৩১৪২১

তৌহিদুল ৩১৪২২	নিবিড় ৩১৪২৩	পারভেজ ৩১৪২৪	নাঈম ৩১৪২৫	রাজিব ৩১৪২৬	সুমন ৩১৪২৭	আরিফুল ৩১৪২৮

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

রাফাত	শেহাবুল	রকি	সাফকাত	সালেকীন	মেহেদী	মুরাদ
৩১৪২৯	৩১৪৩০	৩১৪৩১	৩১৪৩২	৩১৪৩৩	৩১৪৩৪	৩১৪৩৫

অমিত	নয়ন	তৌফিক	দিপু	জয়	রাব্বি	আকিব
৩১৪৩৬	৩১৪৩৭	৩১৪৩৮	৩১৪৩৯	৩১৪৪০	৩১৪৪১	৩১৪৪২

কামাল	জাহিদ	রায়হান	সুলতান	তাসিন	মাহতাব	সায়েম
৩১৪৪৩	৩১৪৪৪	৩১৪৪৫	৩১৪৪৬	৩১৪৪৭	৩১৪৪৮	৩১৪৪৯

আজাজুল	শিমুল	তানজিম	শাওন	নাসিম	নাফিজ	সাইফ
৩১৪৫০	৩১৪৫১	৩১৪৫২	৩১৪৫৩	৩১৪৫৪	৩১৪৫৫	৩১৪৫৬

রিপন	শিমন	শান্ত	সায়ফুর	রিপন	ফাহিম	সুমন
৩১৪৫৭	৩১৪৫৮	৩১৪৫৯	৩১৪৬০	৩১৪৬১	৩১৪৬২	৩১৪৬৩

সৌরভ	মান্নান	সিফাত	দিদার	রাফাত	সালাহউদ্দিন	মিতু
৩১৪৬৪	৩১৪৬৫	৩১৪৬৬	৩১৪৬৭	৩১৪৬৮	৩১৪৬৯	৩১৪৭০

শান্ত	কুড়ি	মাহমুদ	আকাশ	জালাল	মুন্না	আরমান
৩১৪৭১	৩১৪৭২	৩১৪৭৩	৩১৪৭৪	৩১৪৭৫	৩১৪৭৬	৩১৪৭৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

আজাহার ৩১৪৭৮	সজিব ৩১৪৭৯	শিহাব ৩১৪৮০	আল-আমিন ৩১৪৮১	সৈকত ৩১৪৮২	তামজিদ ৩১৪৮৩	মিথুন ৩১৪৮৪

নিশাথ ৩১৪৮৫	নায়মুর ৩১৪৮৬	ফারুক ৩১৪৮৭	রিসাদ ৩১৪৮৮	রিয়াদ ৩১৪৮৯	তারিকুল ৩১৪৯০	আরিফ ৩১৪৯১

ইফতেখার ৩১৪৯২	ইমদাদুল ৩১৪৯৩	জামান ৩১৪৯৪	রবিউল ৩১৪৯৫	বরেণ্য ৩১৪৯৬	রনবির ৩১৪৯৭	মাহমুদুল ৩১৪৯৮

মোহন ৩১৪৯৯	রায়হান ৩১৫০০	মুসাল্লিম ৩১৫০১	আহাদ ৩১৫০২	জীম ৩১৫০৩	সাগর ৩১৫০৪	রাফি ৩১৫০৫

সোহান ৩১৫০৬	রাব্বি ৩১৫০৭	নাবিল ৩১৫০৮	ইমন ৩১৫০৯	আজাদ ৩১৫১০	শুভ ৩১৫১১	রুহুল আমিন ৩১৫১২

তৌফিকুল ৩১৫১৩	রাব্বি ৩১৫১৪	রাকিব ৩১৫১৫	আবরার ৩১৫১৬	রাকিব ৩১৫১৭	রেজওয়ান ৩১৫১৮	ইয়াছিন ৩১৫১৯

রাব্বি ৩১৫২০	নীরব ৩১৫২১	সাইদ ৩১৫২২	মারুফ ৩১৫২৩	মেহেদী ৩১৫২৪	হিমেল ৩১৫২৫	আজাদ ৩১৫২৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সোহাগ ৩১৫২৮	রেহান ৩১৫২৯	ফরহাদ ৩১৫৩০	নাজমুল ৩১৫৩১	হাসিবুল ৩১৫৩২	আশিক ৩১৫৩৩	ওমর ৩১৫৩৪

শ্রাবণ ৩১৫৩৫	তানভীর ৩১৫৩৬	জিসান ৩১৫৩৭	দিপ্ত ৩১৫৩৮	ফরহাদ ৩১৫৩৯	ইকবাল ৩১৫৪০	সানি ৩১৫৪১

রাহি ৩১৫৪২	এহতেসাম ৩১৫৪৩	সাগর ৩১৫৪৪	মাহতাব ৩১৫৪৫	আবদুল্লাহ ৩১৫৪৬	আমির ৩১৫৪৭	নাঈম ৩১৫৪৮

রনি ৩১৫৪৯	এমরান ৩১৫৫০	রাফি ৩১৫৫১	আসিফ ৩১৫৫২	মুবাশ্বের ৩১৫৫৩	রহমান ৩১৫৫৪	টনি ৩১৫৫৫

মেহেদী ৩১৫৫৬	শুভ ৩১৫৫৭	ওমর ৩১৫৫৮	সজিব ৩১৫৫৯	নবেল ৩১৫৬০	মুন ৩১৫৬১	কাদের ৩১৫৬২

নাঈম ৩১৫৬৩	মানিক ৩১৫৬৪	মেহেদী ৩১৫৬৫	শাহাদাত ৩১৫৬৬	সাকিবুল ৩১৫৬৭	ফাহাদ ৩১৫৬৮	রানা ৩১৫৬৯

জুবাইদ ৩১৫৭০	জামিল ৩১৫৭১	অমিত ৩১৫৭২	সুলতান ৩১৫৭৩	তামিম ৩১৫৭৪	অনিক ৩১৫৭৫	মিজান ৩১৫৭৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

জিলন	রিয়াদ	নীরব	ফাহিম	পিয়াস	মেহেদী	মামুন
৩১৫৭৭	৩১৫৭৮	৩১৫৭৯	৩১৫৮০	৩১৫৮১	৩১৫৮২	৩১৫৮৩

রিফাত	সামিউল	সাঈম	রিয়াজ	সাকিব	আনোয়ার	সিমান্ত
৩১৫৮৪	৩১৫৮৫	৩১৫৮৬	৩১৫৮৭	৩১৫৮৮	৩১৫৮৯	৩১৫৯০

ইমন	আতিক	রিয়াদ	তাজুদুল	অনুপম	এহসান	ফরহাদ
৩১৫৯১	৩১৫৯২	৩১৫৯৩	৩১৫৯৪	৩১৫৯৫	৩১৫৯৬	৩১৫৯৭

ইব্রাহিম	আলবাব	তুহিন	মেহেদী	সোহান	তুহিন	মুহাইমিনুল
৩১৫৯৮	৩১৫৯৯	৩১৬০০	৩১৬০১	৩১৬০২	৩১৬০৩	৩১৬০৪

সাজ্জাদ	তৌসিফ	রাজুল	সাদমান	মুশফিকুর	সাইদুল	নাবিদ
৩১৬০৫	৩১৬০৬	৩১৬০৭	৩১৬০৮	৩১৬০৯	৩১৬১০	৩১৬১১

তন্ময়	মুর্শেদ	মুবিন	আবদুল্লাহ	সাদমান	এরশাদুল	ফারহান
৩১৬১২	৩১৬১৩	৩১৬১৪	৩১৬১৫	৩১৬১৬	৩১৬১৭	৩১৬১৮

শাহজালাল	মেহেদী	হাসিব	নাহিদ	ইসমাহিল	রানা	রনন
৩১৬১৯	৩১৬২০	৩১৬২১	৩১৬২২	৩১৬২৩	৩১৬২৪	৩১৬২৫

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

আকাশ	সিফাত	সিরাজ	রিয়াজ	আযম	আরাফাত	আসিফ
৩১৬২৬	৩১৬২৭	৩১৬২৮	৩১৬২৯	৩১৬৩০	৩১৬৩১	৩১৬৩২

সাকিব	রাব্বি	সাদমান	রাফি	ওবায়দুল	তানজিল	জহিরুল
৩১৬৩৩	৩১৬৩৪	৩১৬৩৫	৩১৬৩৬	৩১৬৩৭	৩১৬৩৮	৩১৬৩৯

শাহরিয়া	তানভীর	ওমর ফারুক	শিশির	জুবায়ের	ইসহাক	শরিফ
৩১৬৪০	৩১৬৪১	৩১৬৪২	৩১৬৪৩	৩১৬৪৪	৩১৬৪৫	৩১৬৪৬

মেহেদী	নাঈম	সাজ্জাদ	ফাহাদ	মাহিদুল	শামীম	মংসুপ্রু
৩১৬৪৭	৩১৬৪৮	৩১৬৪৯	৩১৬৫০	৩১৬৫১	৩১৬৫২	৩১৬৫৩

অর্ন	রেজওয়ান	জামিউর	তামিম	নূর মোহাম্মদ	সোহান	সামিউল
৩১৬৫৪	৩১৬৫৫	৩১৬৫৬	৩১৬৫৭	৩১৬৫৮	৩১৬৫৯	৩১৬৬০

ফাহিম	শুভ্রত	সাঈম	নবেল	সাম্মো	তাহসিন	সিফাত
৩১৬৬১	৩১৬৬২	৩১৬৬৩	৩১৬৬৪	৩১৬৬৫	৩১৬৬৬	৩১৬৬৭

রাফি	সানি	সাইমুন	মুহিউদ্দিন	মুহিন	মুশফিক	জয়
৩১৬৬৮	৩১৬৬৯	৩১৬৭০	৩১৬৭১	৩১৬৭২	৩১৬৭৩	৩১৬৭৪

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

ফারহান	জাহিদ	আশরাফুজ্জামান	জুবায়ের	তৌসিফ	ইয়াছিন	সেতু
৩১৬৭৫	৩১৬৭৬	৩১৬৭৭	৩১৬৭৮	৩১৬৭৯	৩১৬৮০	৩১৬৮১

সাদমান	তুরন	ইয়েন	নুহিন	তারেকুল	শাওন	খায়রুল
৩১৬৮২	৩১৬৮৩	৩১৬৮৪	৩১৬৮৫	৩১৬৮৬	৩১৬৮৭	৩১৬৮৮

সৌরভ	কাদের	তাজবেউজ্জামান	শিফাত	অমিত	মেহেদী	শাওন
৩১৬৮৯	৩১৬৯০	৩১৬৯১	৩১৬৯২	৩১৬৯৩	৩১৬৯৪	৩১৬৯৫

শাখাওয়াত	হাবিব	রাদ	শাদাদ	আরিফুল	ফারদিন	খালেদ
৩১৬৯৬	৩১৬৯৭	৩১৬৯৮	৩১৬৯৯	৩১৭০০	৩১৭০১	৩১৭০২

আজিজুল	মোশারফ	ইয়াকুব	আফসার	আশিকুর	রিয়াদ	আরাফাত
৩১৭০৩	৩১৭০৪	৩১৭০৫	৩১৭০৬	৩১৭০৭	৩১৭০৮	৩১৭০৯

শহিদুল	মেহেদী	ফাহিম	ফাহাদ	আসিফ	সাইফুল	নাজিম
৩১৭১০	৩১৭১১	৩১৭১২	৩১৭১৩	৩১৭১৪	৩১৭১৫	৩১৭১৬

নীলয়	মোজাহিদ	তাসমাইদ	নাসির	জয়	সাদ	তানভীর
৩১৭১৭	৩১৭১৮	৩১৭১৯	৩১৭২০	৩১৭২১	৩১৭২২	৩১৭২৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

হযরত ৩১৭২৪	বেল্লাল ৩১৭২৫	পারভেজ ৩১৭২৬	খালেদ ৩১৭২৭	জাবেদ ৩১৭২৮	আমিনুল ৩১৭২৯	সাগর ৩১৭৩০

মুশফিক ৩১৭৩১	রায়হান ৩১৭৩২	হিমেল ৩১৭৩৩	ফিরোজ ৩১৭৩৪	নাসির ৩১৭৩৫	শাখাওয়াত ৩১৭৩৬	রাফি ৩১৭৩৭

রিফাত ৩১৭৩৮	ওবায়েদ ৩১৭৩৯	ইয়ামিন ৩১৭৪০	শাহাদাত ৩১৭৪১	জুবায়ের ৩১৭৪২	রাহাত ৩১৭৪৩	শাহরিয়ার ৩১৭৪৪

নাঈম ৩১৭৪৫	আশিকুল ৩১৭৪৬	তালহা ৩১৭৪৭	হাবিবুর ৩১৭৪৮	সামিনুর ৩১৭৪৯	তৌহিদ ৩১৭৫০	রাইসুল ৩১৭৫১

তুষার ৩১৭৫২	জুয়েল ৩১৭৫৩	মোস্তাফিজ ৩১৭৫৪	ফাইজুল ৩১৭৫৫	রাহাত ৩১৭৫৬	সালাম ৩১৭৫৭	তারেক ৩১৭৫৮

আরিফ ৩১৭৫৯	লিওন ৩১৭৬০	তানভীর ৩১৭৬১	তামজিদুল ৩১৭৬২	মিশাত ৩১৭৬৩	সোহেল ৩১৭৬৪	হৃদয় ৩১৭৬৫

পুলক ৩১৭৬৬	মিজানুর ৩১৭৬৭	আকরাম ৩১৭৬৮	সাকিবুল ৩১৭৬৯	অভি ৩১৭৭০	শুভন ৩১৭৭১	রিমন ৩১৭৭২

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

তানজিল	মেহেদী	সাজ্জাদ	সালমান	রাব্বি	আরমান	সুমন
৩১৭৭৩	৩১৭৭৪	৩১৭৭৫	৩১৭৭৬	৩১৭৭৭	৩১৭৭৮	৩১৭৭৯

মাহমুদুল	নয়ন	মিজানুর	আলিম	ফাহিম	শান্ত	ফয়সাল
৩১৭৮০	৩১৭৮১	৩১৭৮২	৩১৭৮৩	৩১৭৮৪	৩১৭৮৫	৩১৭৮৬

আশিক	আল-আমিন	রাজিব	ইসমাইল	সাদবিন	রাকিব	তৌকির
৩১৭৮৭	৩১৭৮৮	৩১৭৮৯	৩১৭৯০	৩১৭৯১	৩১৭৯২	৩১৭৯৩

তুষাদ	আরিফ	মেহেদী	ফয়সাল	আবদুল্লাহ	হাম্মাদ	অনিক
৩১৭৯৪	৩১৭৯৫	৩১৭৯৬	৩১৭৯৭	৩১৭৯৮	৩১৭৯৯	৩১৮০০

নাজমুল	আকাশ	আলিফুর	নাফিজ	রায়হানুল	রাইসুল	আরাফাত
৩১৮০১	৩১৮০২	৩১৮০৩	৩১৮০৪	৩১৮০৫	৩১৮০৬	৩১৮০৭

জহির	শরিফুল	অনিক	সৃজন	জিহাদ	আদিব	টুটুল
৩১৮০৮	৩১৮০৯	৩১৮১০	৩১৮১১	৩১৮১২	৩১৮১৩	৩১৮১৪

তুষার	আশিকুর	মেহেদী	সোভন	আকাশ	সামিউল	সজিব
৩১৮১৫	৩১৮১৬	৩১৮১৭	৩১৮১৮	৩১৮১৯	৩১৮২০	৩১৮২১

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

নাসির	মৃদুল	তানজিলুর	নোমান	আয়নুদ্দিন	সানজিদ	তানভীর
৩১৮২২	৩১৮২৩	৩১৮২৪	৩১৮২৫	৩১৮২৬	৩১৮২৭	৩১৮২৮

আবির	টুটুল	আরিফুল	আকিব	আকরাম	সাইদুল	সাঈফ
৩১৮২৯	৩১৮৩০	৩১৮৩১	৩১৮৩২	৩১৮৩৩	৩১৮৩৪	৩১৮৩৫

আরিফ	জিদান	আব্দুল্লাহ	রিমন	রাশেদ	হাসিব	পাভেল
৩১৮৩৬	৩১৮৩৭	৩১৮৩৮	৩১৮৩৯	৩১৮৪০	৩১৮৪১	৩১৮৪২

মিরহাজুল	জিম	কামরুল	মারুফ	আতিকুল	শাহরিয়ার	মেহেদী
৩১৮৪৩	৩১৮৪৪	৩১৮৪৫	৩১৮৪৬	৩১৮৪৭	৩১৮৪৮	৩১৮৪৯

রাফাত	বিজয়	ইহতেসাম	আকাশ	ফায়েজ	আব্দুল্লাহ	অপু
৩১৮৫০	৩১৮৫১	৩১৮৫২	৩১৮৫৩	৩১৮৫৪	৩১৮৫৫	৩১৮৫৬

ইমতিয়াজ	আহসান	আব্দুল্লাহ	সম্রাট	ফাহাদ	নীলয়	দিদারুল
৩১৮৫৭	৩১৮৫৮	৩১৮৫৯	৩১৮৬০	৩১৮৬১	৩১৮৬২	৩১৮৬৩

ফাহাদ	শাওন	তৌহিদুল	খলিলুর	আরাফাত	শারওয়ার	পিকাসু
৩১৮৬৪	৩১৮৬৫	৩১৮৬৬	৩১৮৬৭	৩১৮৬৮	৩১৮৬৯	৩১৮৭০

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

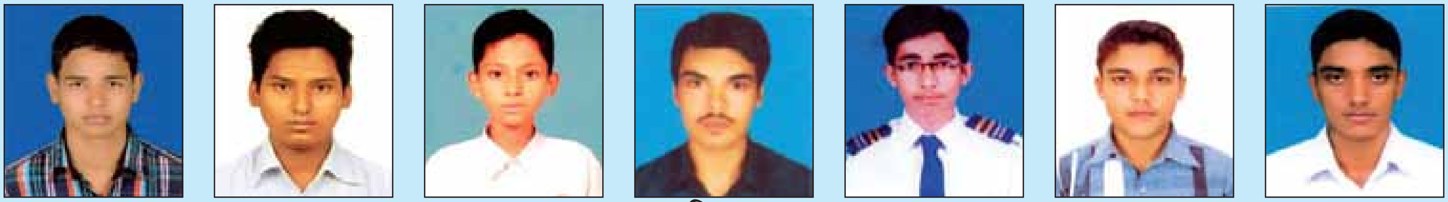

কাইয়ুম	শফিকুল	সায়েফ	আকিবুজ্জামান	জাহিদ	সামসুর	ফাহিম
৩১৮৭১	৩১৮৭২	৩১৮৭৩	৩১৮৭৪	৩১৮৭৫	৩১৮৭৬	৩১৮৭৭

সজিব	সাজেদ	রিদওয়ান	সাইফুল	আফনান	নিশান	উৎস
৩১৮৭৮	৩১৮৭৯	৩১৮৮০	৩১৮৮১	৩১৮৮২	৩১৮৮৩	৩১৮৮৪

সজিব	রনি	শুভ	ইমন	জুবায়ের	আশিকুজ্জামান	পারভেজ
৩১৮৮৫	৩১৮৮৬	৩১৮৮৭	৩১৮৮৮	৩১৮৮৯	৩১৮৯০	৩১৮৯১

রনি	সামসুস	নাজমুল	নাফিউল	শরিফুল	ট্রয়	সাগর
৩১৮৯২	৩১৮৯৩	৩১৮৯৪	৩১৮৯৫	৩১৮৯৬	৩১৮৯৭	৩১৮৯৮

রিফাত	ইফতাহি	জয়	জুবায়েদ	খালেদ	রিফাত	নূর আলম
৩১৮৯৯	৩১৯০০	৩১৯০১	৩১৯০২	৩১৯০৩	৩১৯০৪	৩১৯০৫

আলামিন	শিহাব	মালিক	রাব্বি	রিয়াদ	আদনান	সাইফুর
৩১৯০৬	৩১৯০৭	৩১৯০৮	৩১৯০৯	৩১৯১০	৩১৯১১	৩১৯১২

চঞ্চল	রঙ্গন	সাকিব	রাহিদুজ্জামান	তরিকুল	অর্ঘ	শিহাব
৩১৯১৩	৩১৯১৪	৩১৯১৫	৩১৯১৬	৩১৯১৭	৩১৯১৮	৩১৯১৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

রাব্বি	ফাহাদ	মাজহারুল	আব্দুল্লাহ	শামীম	তোফায়েল	জয়
৩১৯২০	৩১৯২১	৩১৯২২	৩১৯২৩	৩১৯২৪	৩১৯২৫	৩১৯২৬

রিফাত	বিপু	অপু	ফোয়াদ	ইমন	সাদি	অভিজিদ
৩১৯২৭	৩১৯২৮	৩১৯২৯	৩১৯৩০	৩১৯৩১	৩১৯৩২	৩১৯৩৩

রাকিবুল	সবুজ	ইমতিয়াজ	আবির	ফয়সাল	প্রত্যয়	আবির
৩১৯৩৪	৩১৯৩৫	৩১৯৩৬	৩১৯৩৭	৩১৯৩৮	৩১৯৩৯	৩১৯৪০

তাসিন	তানজিল	ইয়াছিন	বিপ্লব	আরিফ	সুমন	ফাহিম
৩১৯৪১	৩১৯৪২	৩১৯৪৩	৩১৯৪৪	৩১৯৪৫	৩১৯৪৬	৩১৯৪৭

রনি	রফিকুল	মাইনুদ্দিন	জাফি	সাজিদুর	ইফাজ	কাজল
৩১৯৪৮	৩১৯৪৯	৩১৯৫০	৩১৯৫১	৩১৯৫২	৩১৯৫৩	৩১৯৫৪

তানজিম	আবির	রিসাদ	মোহাইমিনুল	শাকিল	মোজাহিদুল	আলিফ
৩১৯৫৫	৩১৯৫৬	৩১৯৫৭	৩১৯৫৮	৩১৯৫৯	৩১৯৬০	৩১৯৬১

আতিকুর	তারেকুল	শাহরিয়ার	মেহেদী	মিল্লাদ	আরাফাত	তানভীর
৩১৯৬২	৩১৯৬৩	৩১৯৬৪	৩১৯৬৫	৩১৯৬৬	৩১৯৬৭	৩১৯৬৮

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

তাজুদ্দিন	ইমাম	ফাহিম	রাহাদ	মহব্বত	নওসের	নাহিদুল
৩১৯৬৯	৩১৯৭০	৩১৯৭১	৩১৯৭২	৩১৯৭৩	৩১৯৭৪	৩১৯৭৫

মেঘনা	রাকিব	আহাদ	আব্দুল্লাহ	তাহসান	রেজাউল	রহমান
৩১৯৭৭	৩১৯৭৮	৩১৯৭৯	৩১৯৮০	৩১৯৮১	৩১৯৮২	৩১৯৮৩

ইমন	হাবিবুর	আলভি	মুজাহিদুল	দিপ্ত	তাহসিন	সাফায়াত
৩১৯৮৪	৩১৯৮৫	৩১৯৮৬	৩১৯৮৭	৩১৯৮৮	৩১৯৮৯	৩১৯৯০

সাম্য	আশরাফুজ্জামান	আমিনুল	সালাহউদ্দিন	সুজন	ইমাম	জাহিদ
৩১৯৯১	৩১৯৯২	৩১৯৯৩	৩১৯৯৪	৩১৯৯৫	৩১৯৯৬	৩১৯৯৭

আতিক	সাকিব	ফয়েদ	অয়ন	সিয়াম	শাহরিয়ার	তামিম
৩১৯৯৮	৩১৯৯৯	৩২০০০	৩২০০১	৩২০০২	৩২০০৩	৩২০০৪

তারিকুল	সঞ্জয়	আকিবুল	ইউসুফ	নজর	আশিক	মাহবুব
৩২০০৫	৩২০০৬	৩২০০৭	৩২০০৮	৩২০০৯	৩২০১০	৩২০১১

তানভীর	জিহাদ	কিবরিয়া	আব্দুল্লাহ	ফয়সাল	মিশুক	নাঈম
৩২০১২	৩২০১৩	৩২০১৪	৩২০১৫	৩২০১৬	৩২০১৭	৩২০১৮

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

বিজয় ৩২০১৯	আরিফুল ৩২০২০	শোভন ৩২০২১	হেলাল ৩২০২২	জাহিদ ৩২০২৩	রাজু ৩২০২৪	উৎসব ৩২০২৫

সাজিব ৩২০২৬	পারভেজ ৩২০২৭	মাশিকুর ৩২০২৮	আর্শেদ ৩২০২৯	আয়মুন ৩২০৩০	নাসিফ ৩২০৩১	সালমান ৩২০৩২

নাফিউল ৩২০৩৩	অমিত ৩২০৩৪	রাব্বি ৩২০৩৫	তন্ময় ৩২০৩৬	সাকিল ৩২০৩৭	সজিব ৩২০৩৮	পার্থ ৩২০৩৯

রাব্বি ৩২০৪০	মুজাহিদুর ৩২০৪১	জাহিদুল ৩২০৪২	নাঈম ৩২০৪৩	রায়হান ৩২০৪৪	ফয়সাল ৩২০৪৫	রিফাত ৩২০৪৬

পাভেল ৩২০৪৭	ইসমাইল ৩২০৪৮	তৌহিদুল ৩২০৪৯	সোহেল ৩২০৫০	আব্দুল্লাহ ৩২০৫১	আরাফ ৩২০৫২	নাভেদ ৩২০৫৩

দুর্জয় ৩২০৫৪	মিতুন ৩২০৫৫	ফাহিম ৩২০৫৬	শাওন ৩২০৫৭	সাকিল ৩২০৫৮	হিমেল ৩২০৫৯	শাওন ৩২০৬০

তানজীদ ৩২০৬১	আকন ৩২০৬২	মিনহাজুল ৩২০৬৩	নিজাম ৩২০৬৪	রাফি ৩২০৬৫	আরাফ ৩২০৬৬	রিপন ৩২০৬৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

আকাশ	তানভী	ডানিয়েল	সাজ্জাদ	আরিফুর	জাকের	মাইনুল
৩২০৬৮	৩২০৬৯	৩২০৭০	৩২০৭১	৩২০৭২	৩২০৭৩	৩২০৭৪

নাভিদ	ফাহিম	সাজ্জাদ	সাকিবুল	ইয়ামিন	সাগর	আসাদ
৩২০৭৫	৩২০৭৬	৩২০৭৭	৩২০৭৮	৩২০৭৯	৩২০৮০	৩২০৮১

আকাশ	প্রান্ত	সৈকত	ইমন	আরিফুল	জুবায়ের	সিফাত
৩২০৮২	৩২০৮৩	৩২০৮৪	৩২০৮৫	৩২০৮৬	৩২০৮৭	৩২০৮৮

রাহাত	নাহিদ	জাহিদ	নোমান	কাদির	নীলয়	ইমরান
৩২০৮৯	৩২০৯০	৩২০৯১	৩২০৯২	৩২০৯৩	৩২০৯৪	৩২০৯৫

দিবস	বায়েজিদ	জুহাইর	শুভ	সাকিল	মোহসিন	প্রান্ত
৩২০৯৬	৩২০৯৭	৩২০৯৮	৩২০৯৯	৩২১০০	৩২১০১	৩২১০২

ওয়াজুদ্দিন	রবিন	সালেহিন	তামিম	হৃদয়	শুভ	মাসুম
৩২১০৩	৩২১০৪	৩২১০৫	৩২১০৬	৩২১০৭	৩২১০৮	৩২১০৯

কামরান	জামিউর	সাইফ	শুভ	নিহাল	সজিব	আলভি
৩২১১০	৩২১১১	৩২১১২	৩২১১৩	৩২১১৪	৩২১১৫	৩২১১৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

আল-আমিন ৩২১১৭	সাকিবুল ৩২১১৮	নীরব ৩২১১৯	বিল্লাল ৩২১২০	অসিম ৩২১২১	সাদমান ৩২১২২	রাকীন ৩২১২৩

সেতু ৩২১২৪	সাজেদুল ৩২১২৫	রাফি ৩২১২৬	সুমু ৩২১২৭	হৃদয় ৩২১২৮	কাইয়ুম ৩২১২৯	প্রদিতি ৩২১৩০

মুহাইমেনুল ৩২১৩১	নাহিয়ান ৩২১৩২	ইমরান ৩২১৩৩	তাসনিম ৩২১৩৪	আবুল হাসনাত ৩২১৩৫	রফিকুল ৩২১৩৬	তালহা ৩২১৩৭

রামিম ৩২১৩৮	জুবায়ের ৩২১৩৯	শাহিন ৩২১৪০	অর্নব ৩২১৪১	মিম ৩২১৪২	আলিফ ৩২১৪৩	সালাম ৩২১৪৫

ফাহিম ৩২১৪৬	শিমুল ৩২১৪৭	রোমান ৩২১৪৮	সজিব ৩২১৪৯	সুমন ৩২১৫০	বন্ধন ৩২১৫১	সবুর ৩২১৫২

ফাহাদ ৩২১৫৩	একরামুল ৩২১৫৪	মুন্না ৩২১৫৫	রাকিব ৩২১৫৬	মেহেদী ৩২১৫৭	রাসেল ৩২১৫৮	সুজন ৩২১৫৯

রনি ৩২১৬০	রাসেল ৩২১৬১	নাদিম ৩২১৬২	নাজমুল ৩২১৬৩	সিয়াম ৩২১৬৪	সাইদুল ৩২১৬৫	মেহেদী ৩২১৬৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সাব্বির	আশরাফুল	সাব্বির	মেহেদী	আজমিন	মিলন	ফাহিম
৩২১৬৭	৩২১৬৮	৩২১৬৯	৩২১৭০	৩২১৭১	৩২১৭২	৩২১৭৩

তানজিম	সাদ	বিকাশ	সিয়াম	আব্দুল্লাহ	নাবিল	কামরুল
৩২১৭৪	৩২১৭৫	৩২১৭৬	৩২১৭৭	৩২১৭৮	৩২১৭৯	৩২১৮০

মুহিব	রানা	তন্ময়	নাজিবুল	আমান্ত	তনয়	সুমন
৩২১৮১	৩২১৮২	৩২১৮৩	৩২১৮৪	৩২১৮৫	৩২১৮৬	৩২১৮৭

ইরতিজা	আজিজুর	মিজান	তুহিন	তৌফিক	পিয়াল	ইমাম
৩২১৮৮	৩২১৮৯	৩২১৯০	৩২১৯১	৩২১৯২	৩২১৯৩	৩২১৯৪

সাদমান	সজিব	রব্বানী	সাকিব	রাজু	কামরুল	মাহমুদুল
৩২১৯৫	৩২১৯৬	৩২১৯৭	৩২১৯৮	৩২১৯৯	৩২২০০	৩২২০১

তুহিন	সাফায়েত	তানভীর	মাহফুজুর	ধ্রুব	অঙ্কন	মাহবুব
৩২২০২	৩২২০৩	৩২২০৪	৩২২০৫	৩২২০৭	৩২২০৮	৩২২০৯

রাব্বি	আলতাফ	ফাহিম	মারুফ	অজয়	রিদুয়ান	জীবন
৩২২১০	৩২২১১	৩২২১২	৩২২১৩	৩২২১৪	৩২২১৫	৩২২১৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

শাহিনুর	অপূর্ব	শহিদুল	সাদমান	সাদিব	ইমরান	শাওন
৩২২১৭	৩২২১৮	৩২২১৯	৩২২২০	৩২২২১	৩২২২২	৩২২২৩

আহাদ	হৃদয়	নাবিল	আবুবকর	স্বপ্নীল	সাদ্দাম	সজ্ঞিদ
৩২২২৪	৩২২২৫	৩২২২৬	৩২২২৭	৩২২২৮	৩২২২৯	৩২২৩০

সাঈফ	সাইফি	আসিফ	তানজীমুল	মামুন	এনামুল	শাহিন
৩২২৩১	৩২২৩২	৩২২৩৩	৩২২৩৪	৩২২৩৫	৩২২৩৬	৩২২৩৭

সাফিন	আরিফ	নুরুল ইসলাম	রাতুল	রাফেজ	মাহফুজ	হৃদয়
৩২২৩৮	৩২২৩৯	৩২২৪০	৩২২৪১	৩২২৪২	৩২২৪৩	৩২২৪৪

শুভ্র	শিহাবুল	গফ্ফার	আলামিন	মোস্তাফিজ	রিয়াদ	রাসেল
৩২২৪৫	৩২২৪৬	৩২২৪৭	৩২২৪৮	৩২২৪৯	৩২২৫০	৩২২৫১

আবির	আশরাফুল	রিদওয়ান	সাব্বির	ফেরদৌস	ফয়সাল	হাসিবুর
৩২২৫২	৩২২৫৩	৩২২৫৪	৩২২৫৫	৩২২৫৬	৩২২৫৭	৩২২৫৮

সামিউল	তুষার	আল-আমিন	রিদওয়ান	মনিরুল	তানজির	শ্রাবণ
৩২২৫৯	৩২২৬০	৩২২৬১	৩২২৬২	৩২২৬৩	৩২২৬৪	৩২২৬৫

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সিমান্ত	আসিফ	রাকিবুল	শাহনুর	আকাশ	সাকিব	নাহিদ
৩২২৬৬	৩২২৬৭	৩২২৬৮	৩২২৬৯	৩২২৭০	৩২২৭১	৩২২৭২

সাইফ	জামিল	নোমান	সায়েম	সাকিল	বকতিয়ার	শওকত
৩২২৭৩	৩২২৭৪	৩২২৭৫	৩২২৭৬	৩২২৭৭	৩২২৭৮	৩২২৭৯

এহছানুল	জাহিদুল	বাধঁন	তুহিন	আশিকুর	অশোক	ওমর ফারুক
৩২২৮০	৩২২৮১	৩২২৮২	৩২২৮৩	৩২২৮৪	৩২২৮৫	৩২২৮৬

শাহরিয়ার	রাকিব	তরিকুল	মাহফুজুর	আরাফাত	জামশেদ	আতিক
৩২২৮৭	৩২২৮৮	৩২২৮৯	৩২২৯০	৩২২৯১	৩২২৯২	৩২২৯৩

দিপ্ত	তানভীর	রাফিউল	ইব্রাহিম	ওমর	সাঈফ	ফাহিম
৩২২৯৪	৩২২৯৫	৩২২৯৬	৩২২৯৭	৩২২৯৯	৩২৩০০	৩২৩০১

ফজলে আলি	শান্ত	দিদারুল	পুলক	অনিক	সিয়াম	সুজন
৩২৩০২	৩২৩০৩	৩২৩০৪	৩২৩০৫	৩২৩০৬	৩২৩০৭	৩২৩০৮

মুয়াজ	রবিন	আকাশ	হাসান	মামুন	ফয়সাল	ফায়সাল
৩২৩০৯	৩২৩১০	৩২৩১১	৩২৩১২	৩২৩১৩	৩২৩১৪	৩২৩১৫

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

ইজাজ ৩২৩১৬ | অনিক ৩২৩১৭ | রাকিব ৩২৩১৮ | শাদাত ৩২৩১৯ | শাকিল ৩২৩২০ | ফারহান ৩২৩২১ | ইজাজুল ৩২৩২২

মাহমুদ ৩২৩২৩ | ফাহাদ ৩২৩২৫ | রাকিবুল ৩২৩২৬ | পারভেজ ৩২৩২৭ | আবুল ফজল ৩২৩২৮ | আতিকুল ৩২৩২৯ | আশফাক ৩২৩৩০

স্বপ্নীল ৩২৩৩১ | সবুজ ৩২৩৩২ | নওয়াজিস ৩২৩৩৩ | ফাহাদ ৩২৩৩৪ | সোহেল ৩২৩৩৬ | রাব্বি ৩২৩৩৭ | তানভীর ৩২৩৩৮

মেহেদী ৩২৩৩৯ | নাহিদুল ৩২৩৪০ | ইব্রাহিম ৩২৩৪১ | অনিক ৩২৩৪২ | আবিদুর ৩২৩৪৩ | আদিব ৩২৩৪৪ | সুদিপ্ত ৩২৩৪৫

তানভীর ৩২৩৪৬ | শিশির ৩২৩৪৭ | ফাহিম ৩২৩৪৮ | আলামিন ৩২৩৪৯ | সাদ্দাম ৩২৩৫০ | আবির ৩২৩৫১ | রিয়াদ ৩২৩৫২

মুবাশ্বের ৩২৩৫৩ | মাহাদি ৩২৩৫৪ | আবির ৩২৩৫৫ | নূর আলম ৩২৩৫৬ | ওহী ৩২৩৫৭ | রিয়াদ ৩২৩৫৮ | মোস্তাফিজ ৩২৩৫৯

রেজওয়ানুল ৩২৩৬০ | রবিন ৩২৩৬১ | আরিফ ৩২৩৬২ | রাসেল ৩২৩৬৩ | সাজান ৩২৩৬৪ | জাহিদ ৩২৩৬৫ | ফরহান ৩২৩৬৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সিক্ত	শাখাওয়াত	তানবির	হাবিব	আকিল	সিনফি	ফাহিম
৩২৩৬৭	৩২৩৬৮	৩২৩৬৯	৩২৩৭০	৩২৩৭১	৩২৩৭২	৩২৩৭৩

আলম	নূর	আমিনুল	মোবাশ্বির	হৃদয়	ইশতিয়াক	সাব্বির
৩২৩৭৪	৩২৩৭৫	৩২৩৭৬	৩২৩৭৭	৩২৩৭৮	৩২৩৭৯	৩২৩৮০

নির্জন	হাসিবুল	সাহরিয়ার	নাফিজ	সুজন	মোস্তাফিজ	মুন্তাসির
৩২৩৮১	৩২৩৮২	৩২৩৮৩	৩২৩৮৪	৩২৩৮৫	৩২৩৮৬	৩২৩৮৭

ওমর ফারুক	আব্দুল্লাহ	আশিকুর	রাসেল	তুষার	আব্দুল্লাহ	ইফেল
৩২৩৮৮	৩২৩৮৯	৩২৩৯০	৩২৩৯১	৩২৩৯২	৩২৩৯৩	৩২৩৯৪

রাফি	জাহিদুল	সুমেধ	ওয়ালিদ	মাসুদ	রাকিবুল	রাজু
৩২৩৯৫	৩২৩৯৬	৩২৩৯৭	৩২৩৯৮	৩২৩৯৯	৩২৪০০	৩২৪০১

মাহমুদুল	মিলন	সাব্বির	ইলিয়াস	আবুলায়েস	রাসেল	রাব্বি
৩২৪০২	৩২৪০৩	৩২৪০৪	৩২৪০৫	৩২৪০৬	৩২৪০৭	৩২৪০৮

মাহবুবুল	আরাফ	কামাল	রাকিব	তামিম	আকরাম	রেহান
৩২৪০৯	৩২৪১০	৩২৪১১	৩২৪১২	৩২৪১৩	৩২৪১৪	৩২৪১৫

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

অহন ৩২৪১৬	ফয়সাল ৩২৪১৭	শুভ ৩২৪১৮	প্রভাকর ৩২৪১৯	মেহেদী ৩২৪২০	মাকসুদ ৩২৪২১	রেশান ৩২৪২২

রাহুল ৩২৪২৩	আলীফ ৩২৪২৪	সিরাজ ৩২৪২৫	রেজা ৩২৪২৬	আরিফুল ৩২৪২৭	রাতুল ৩২৪২৮	নীলয় ৩২৪২৯

সাজিদ ৩২৪৩০	তানভীর ৩২৪৩২	শাহজাদা ৩২৪৩৩	ইমরান ৩২৪৩৪	রেসালাত ৩২৪৩৫	নীলয় ৩২৪৩৬	খায়রুল ৩২৪৩৭

জয় ৩২৪৩৮	বায়েজিদ ৩২৪৩৯	শাহ আলম ৩২৪৪১	ফেরদৌস ৩২৪৪২	আরিফুল ৩২৪৪৩	মঞ্জুরুল ৩২৪৪৪	সাইফুল ৩২৪৪৫

মুকিত ৩২৪৪৬	মেহেদী ৩২৪৪৭	মিলু ৩২৪৪৮	আশিফ ৩২৪৪৯	ফয়সাল ৩২৪৫০	আশরাফুন নূর ৩২৪৫১	আকিব ৩২৪৫২

ফয়সাল ৩২৪৫৩	তুষার ৩২৪৫৪	রোমান ৩২৪৫৫	রাকিব ৩২৪৫৬	ইমতিয়াজ ৩২৪৫৭	মাহতাব ৩২৪৫৮	আলভী ৩২৪৫৯

সাব্বির ৩২৪৬০	রবিন ৩২৪৬১	সোহেল ৩২৪৬২	ওমর ফারুক ৩২৪৬৩	ইয়াছিন ৩২৪৬৪	প্রান্ত ৩২৪৬৫	জামিল ৩২৪৬৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সাব্বির	হাসিবুল	আনাস	আমিনুল	ফাহিম	আনিছ	সায়মন
৩২৪৬৭	৩২৪৬৮	৩২৪৬৯	৩২৪৭০	৩২৪৭১	৩২৪৭২	৩২৪৭৩

আকাশ	জামশেদ	আল-আমিন	মোস্তাফিজ	মুহাইমিনুল	ফাহিম	সাজ্জাদ
৩২৪৭৪	৩২৪৭৫	৩২৪৭৬	৩২৪৭৭	৩২৪৭৮	৩২৪৭৯	৩২৪৮০

মুসাদ্দিক	আশরাফুল	রবিন	সোহেল	কামরুল	জিম	সোহান
৩২৪৮১	৩২৪৮২	৩২৪৮৩	৩২৪৮৪	৩২৪৮৫	৩২৪৮৬	৩২৪৮৭

সায়েম	হিমেল	সুমিত	সাদুল	ইমতিয়াজ	তৌহিদ	হাফিজ
৩২৪৮৮	৩২৪৮৯	৩২৪৯০	৩২৪৯১	৩২৪৯২	৩২৪৯৩	৩২৪৯৫

আরমান	তারেক	আলম	শাওন	আকতার	লাভলু	হায়দার
৩২৪৯৬	৩২৪৯৭	৩২৪৯৮	৩২৪৯৯	৩২৫০০	৩২৫০১	৩২৫০২

আকবার	আব্দুল্লাহ	সানি	মাশরুর	আবির	সানাউল্লাহ	জুলফিকার
৩২৫০৩	৩২৫০৪	৩২৫০৫	৩২৫০৬	৩২৫০৭	৩২৫০৮	৩২৫০৯

কবির	জাহিদ	মাহদি	আশকুর	শরিফুল	জুনায়েদ	জাহিদুর
৩২৫১০	৩২৫১১	৩২৫১২	৩২৫১৩	৩২৫১৪	৩২৫১৫	৩২৫১৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

মাসুম ৩২৫১৭	আরিফুল ৩২৫১৮	আরাফাত ৩২৫১৯	বুরহান ৩২৫২০	জাহিদুল ৩২৫২১	তাসফির ৩২৫২২	মামুন ৩২৫২৩

মুন্না ৩২৫২৪	রাফি ৩২৫২৫	সুমন ৩২৫২৬	রাহাত ৩২৫২৭	সাজ্জাদ ৩২৫২৮	মেহেদী ৩২৫২৯	আশিক ৩২৫৩০

ইমরান ৩২৫৩১	শোভন ৩২৫৩২	সাফিল ৩২৫৩৩	সৌরভ ৩২৫৩৪	জুনায়েদ ৩২৫৩৫	হৃদয় ৩২৫৩৭	ফাহিম ৩২৫৩৮

জুবায়ের ৩২৫৩৯	সোহান ৩২৫৪০	রাফি ৩২৫৪১	তাহমিদ ৩২৫৪২	সাজিদ ৩২৫৪৩	তানভীর ৩২৫৪৪	রাকিবুল ৩২৫৪৫

ইব্রাহিম ৩২৫৪৬	ইশতিয়াক ৩২৫৪৭	শাহরিয়ার ৩২৫৪৮	সাদমান ৩২৫৪৯	ফাহিম ৩২৫৫০	আহসান ৩২৫৫১	ইয়াছিন ৩২৫৫২

মেহেদী ৩২৫৫৩	আবুসাইদ ৩২৫৫৪	মুহাইমিনুল ৩২৫৫৫	আশরাফুল ৩২৫৫৬	মিরাজ ৩২৫৫৭	ইমরান ৩২৫৫৮	কাউছার ৩২৫৫৯

ইয়াছিন ৩২৫৬০	তানভীর ৩২৫৬১	জয় ৩২৫৬২	রাব্বি ৩২৫৬৩	ফজলে রাব্বি ৩২৫৬৪	সামিউল ৩২৫৬৫	প্রিতম ৩২৫৬৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

তৌকির ৩২৫৬৭	জাহিদ ৩২৫৬৮	জয় ৩২৫৬৯	ইনজামামুল ৩২৫৭০	আফ্রিদি ৩২৫৭১	সৈকত ৩২৫৭২	সোহরাব ৩২৫৭৩

সাকিল ৩২৫৭৪	শিহাব ৩২৫৭৫	হানিফ ৩২৫৭৬	মেহেদী ৩২৫৭৭	শাওন ৩২৫৭৯	শাওন ৩২৫৮০	মেদেহী ৩২৫৮১

মঈনুল ৩২৫৮২	শাকিল ৩২৫৮৩	তারিকুল ৩২৫৮৪	রনি ৩২৫৮৫	ইব্রাহিম ৩২৫৮৭	কাফি ৩২৫৮৮	রিজভী ৩২৫৮৯

মেহেদী ৩২৫৯০	মেহেদী ৩২৫৯১	রব্বানী ৩২৫৯২	আফনান ৩২৫৯৩	জিয়া ৩২৫৯৪	সৌমো ৩২৫৯৫	ফজলে রাব্বি ৩২৫৯৬

খালিদ ৩২৫৯৭	নাজমুল ৩২৫৯৮	ফাহাদ ৩২৫৯৯	সাদমান ৩২৬০০	রাশেদ ৩২৬০১	নাঈমুল ৩২৬০২	আরিফ ৩২৬০৩

সুমন ৩২৬০৪	নিয়াজ ৩২৬০৫	মোস্তফা ৩২৬০৬	আহাদ ৩২৬০৭	সিফাত ৩২৬০৮	মোবিন ৩২৬০৯	সাজ্জাদুল ৩২৬১০

সাইফুল ৩২৬১১	ফাহিম ৩২৬১২	ইমন ৩২৬১৩	সাজ্জাদ ৩২৬১৪	মুহ ৩২৬১৫	অরণ্য ৩২৬১৮	লিজা ৩২৬১৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সাদিয়া
৩২৬২০

নাজমা
৩২৬২১

হাবিবা
৩২৬২২

জাহিন
৩২৬২৩

আদনিনা
৩২৬২৪

ইশরাত
৩২৬২৫

নিবেদিতা
৩২৬২৬

তৃণা
৩২৬২৭

বাদন
৩২৬২৮

ফেরদৌসি
৩২৬২৯

সায়মা
৩২৬৩০

সাবিনা
৩২৬৩১

লুনা
৩২৬৩২

লাকি
৩২৬৩৩

ঢাকা কমার্স কলেজ

স্থাপিত

১৯৮৯ ● ১৩৯৬

DHAKA COMMERCE COLLEGE

শিক্ষার্থী পরিচিতি

অনার্স ও মাস্টার্স

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বি বি এ (অনার্স) পার্ট-১, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

সাজ্জাদ ১০২৫ | রিয়াদ ১০৩৬ | নুসরাত ১০৪২ | মৌসুমী ১০৪৪ | আফসানা ১০৪৫ | আল-আমিন ১০৪৬ | সামিয়া ১০৪৭

মাহ্ফুজা ১০৪৮ | মাইনুল ১০৫১ | সাকিল ১০৫২ | সাজ্জাদ ১০৫৫ | মাসুম ১০৫৭ | রুম্মান ১০৫৮ | আশরাফুল ১০৫৯

মেহেদী ১০৬০ | ফারজানা ১০৬১ | বৃষ্টি ১০৬২ | মারিয়া ১০৬৩ | সোহেল ১০৬৫ | ইমরান ১০৬৬ | আয়শা ১০৬৭

স্বর্ণা ১০৬৮ | আকিব ১০৭০ | পলাশ ১০৭৩ | মাহামুদুর ১০৭৪ | নাজমুল ১০৭৯ | রফিকুল ১০৮০ | রব্বানি ১০৮১

ফারুক ১০৮২ | তানবীর ১০৮৪ | বাধন ১০৮৫ | নাসির ১০৮৬ | রিফাত ১০৮৭ | বেল্লাল ১০৮৮ | শিমুল ১০৮৯

ইব্রাহিম ১০৯০ | মানিক ১০৯২ | লোকনাথ ১০৯৩ | ইমরান ১০৯৪ | রিয়া ১০৯৫ | তাহ্সিন ১০৯৬

বি বি এ (অনার্স) পার্ট-২, শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

দেলোয়ার
৯৪৭

শর্মী
৯৯৯

তানজিদা
১০০১

সানজিদা
১০০২

সায়মুন
১০০৪

আজিজুল
১০০৫

গিয়াস
১০০৬

নাদিম
১০০৭

ইশরাত
১০০৮

মাজহারুল
১০০৯

শোভন
১০১০

রিফাত
১০১১

একরাম
১০১২

আনিছুর
১০১৩

মাসুদ
১০১৪

মিঠুন
১০১৫

মুনতাসির
১০১৬

তাজিমুল
১০১৭

ছাদেকুর
১০১৮

নাছিরুল
১০২০

তানভীর
১০২১

শাহরিয়ার
১০২৩

তানজির
১০২৬

সোহাগ
১০২৮

হৃদয়
১০৩০

মাহমুদুর
১০৩১

মোস্তাফিজুর
১০৩২

সাইফুল
১০৩৩

শামীম
১০৩৪

নাদিয়া
১০৩৭

হাদিস
১০৩৮

ইনজামামুল
১০৩৯

জাহিদুল
১০৪০

বি বি এ (অনার্স) পার্ট-২ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

মিতা	সালেহা	আয়েশা	সীমা	হাসনা	সুলতানা	তিশা
৯২৮	৯২৯	৯৩০	৯৩১	৯৩২	৯৩৩	৯৩৪

তৃষ্ণা	ফারহানা	আজমেরী	শাহনাজ	খালেদ	আরাফাত	বোরহান
৯৩৫	৯৩৭	৯৩৮	৯৩৯	৯৪১	৯৪২	৯৪৩

হাসিবুল	নাজমুল	সানভী	রাসেল	আশিকুর	ইফতেখারুল	সানোয়ার
৯৪৪	৯৪৫	৯৪৬	৯৪৮	৯৪৯	৯৫১	৯৫২

জনিয়ন	প্রশান্ত	নুরজাহান	নিশাত	শারমিন	মিয়াদ	ফয়েজ
৯৫৩	৯৫৫	৯৫৭	৯৫৮	৯৬০	৯৬৪	৯৬৫

আসমা	রিফাত	মারিহা	আরিফ	তানিয়া	এনিমা	শামসুল
৯৬৬	৯৭০	৯৭১	৯৭২	৯৭৩	৯৭৪	৯৭৮

দয়াময়	কামরুল	জুয়েল রানা	জুয়েল খান	কামাল	মেহেদী	রাসেল
৯৭৯	৯৮০	৯৮১	৯৮২	৯৮৩	৯৮৫	৯৮৬

রাশেদুজ্জামান
৯৮৭

মিঠুন
৯৮৮

অমিত
৯৯১

আলমগীর
৯৯৫

রাশেদ
৯৯৭

সাইফুল
৯৯৮

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১

রওশন
৯০২

হ্যাপী
৯০৩

লিজা
৯০৪

মাসুমা
৯০৫

ইয়াসমিন
৯০৬

ফারজানা
৯০৭

সাদিয়া
৯০৮

ফাতেমা
৯০৯

মৌমিতা
৯১০

সাকিব
৯১১

তারেক
৯১২

মোস্তাফিজুর
৯১৩

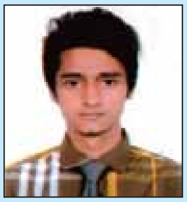
গালিব
৯১৬

শাহ্পরান
৯১৭

মোহাইমিনুল
৯১৮

রাফিউদ্দিন
৯২২

জাহিদ
৯২৫

বি বি এ (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯-২০১০

সুলতানা
৮৬৬

নিপা
৮৬৭

বিপাশা
৮৬৮

মিতু
৮৬৯

জেবা
৮৭০

সুরাইয়া
৮৭১

মলি
৮৭৩

মাফিয়া
৮৭৪

অভিজিত
৮৭৫

বোরহান
৮৭৭

জয়নাল
৮৭৯

ইফতেখার
৮৮০

দিদার
৮৮২

নোবেল
৮৮৩

জসিস
৮৮৪

মস্তাজ
৮৮৫

আরিফ
৮৮৬

মঞ্জুরুল
৮৮৮

হাফিজ
৮৮৯

আনাস
৮৯০

মোস্তাফিজ
৮৯১

মাহমুদুল
৮৯২

সুজন
৮৯৪

জাফর
৮৯৫

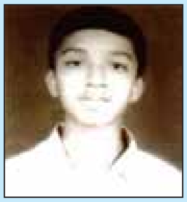
প্রান্ত
৮৯৬

রায়হান
৮৯৭

কনক
৮৯৯

অচিন্ত্য
৯০১

রাজু
৯০১(A)

এম. বি. এস শেষ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

ঝুমুর
২৯০

বেলী
২৯১

রুমানা
২৯২

মঞ্জুয়ারা
২৯৩

ফারহানা
২৯৪

শাওলীন
২৯৫

সুদীপ্ত
২৯৬

রাজিউল
২৯৭

লুৎফুল
২৯৮

জিয়াউল
২৯৯

আসিফ
৩০০

তারেক
৩০১

ইব্রাহীম
৩০২

শাহজাহান
৩০৩

নাজমুল
৩০৪

নাসির
৩০৫

সাইফ
৩০৬

হাসান
৩০৭

তাজুল
৩০৯

সাবা
৩১০

কাইয়ুম
৩১১

মিল্টন
৩১২

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

বি বি এ (অনার্স) পার্ট-১, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

ফাতেমা ১১৮৭	আফিয়া ১১৮৮	সাবরিনা ১১৮৯	ছাবিরা ১১৯০	সোমা ১১৯১	জান্নাতুল ১১৯২	ইভা ১১৯৪

পাপিয়া ১১৯৫	মিতু ১১৯৬	অঙ্কুর ১১৯৭	শ্যামলী ১১৯৯	মারজিয়া ১২০০	শারমিন ১২০২	বন্যা ১২০৫

সুমা ১২০৬	শাওন ১২০৭	হৃদয় ১২০৮	নূর ১২০৯	ফারুক ১২১০	নাঈম ১২১১	শাওন ১২১২

সাজ্জাত ১২১৩	প্রণয় ১২১৮	ইমরান ১২১৯	সাজ্জাদ ১২২০	সাফায়েত ১২২১	অমিত ১২২২	সাঈদ ১২২৩(অ)

নূর মোহাম্মদ ১২২৪	মামুন ১২২৫	আরাফাত ১২২৬	সৈকত ১২২৭	অন্তু ১২২৮	তাশরীকুর ১২২৯	রুমান ১২৩০

রাশেদুল ১২৩১	জাহের ১২৩২	ফাহিম ১২৩৩	তৌহিদুল ১২৩৪	ফারদিন ১২৩৫	সাইমুন ১২৩৬	সায়েল ১২৩৭

নাজমুল	হাসেম	নারায়ন	সীমান্ত	সজীব	মোস্তাইন	শুভ
১২৩৮	১২৩৯	১২৪০	১২৪১	১২৪২	১২৪৩	১২৪৪

নেহাল	তুহিন	রাকিব	ফরহাদ	সাইদ	বিল্লাল	রাজু
১২৪৫	১২৪৬	১২৪৭	১২৪৮	১২৪৯	১২৫০	১২৫১

মুশফিকুর	আবীর	সেজা	ইমাম	রাজিয়া	লোকমান	মোজাহিদ
১২৫২	১২৫৩	১২৫৪	১২৫৬	১২৫৭	১২৬০	১০৮৫

বি বি এ (অনার্স) পার্ট-২ শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

রাজিয়া	ফারিয়া	ইভা	আহরিন	তাহিরা	স্বর্ণা	অনন্যা
১১১০	১১১১	১১১৩	১১১৪	১১১৫	১১১৬	১১১৭

ফারিয়া	ফাইজা	আশা	ইভা	সাদিয়া	হাফিজা	শারমিন
১১১৮	১১১৯	১১২০	১১২১	১১২৩	১১২৪	১১২৫

সুবর্ণা	মাহফুজা	খুশবু	সখিনা	শবনম	রায়হানা	সানজিদা
১১২৭	১১২৮	১১২৯	১১৩০	১১৩১	১১৩২	১১৩৩

আনিছুর ১১৩৪	শরিফুল ১১৩৫	নাজমুল ১১৩৬	রকি ১১৩৭	শামিম ১১৩৯	রাসেল ১১৪০	আরিফ ১১৪২

রণি ১১৪৩	আল-আমিন ১১৪৪	হাসানুজ্জামান ১১৪৭	সালাম ১১৪৮	নূর ১১৪৯	ইসমাইল ১১৫০	ইমরান ১১৫১

বিল্লাল ১১৫২	রায়হান ১১৫৩	শাকিবুর ১১৫৪	রাব্বি ১১৫৫	রিপন ১১৫৬	বুলবুল ১১৫৭	আশরাফুল ১১৫৮

জোবায়ের ১১৫৯	হাসিবুর ১১৬০	লিটু ১১৬২	আরিফ ১১৬৪	সোলেমান ১১৬৫	নুরুল ১১৬৬	আশরাফুল ১১৬৯

মারজান ১১৭০	ফয়সাল ১১৭১	শহিদুল ১১৭২	আরিফুল ১১৭৩	তাহ্‌মিনা ১১৭৪	মিলন ১১৭৫	রাফসান ১১৭৬

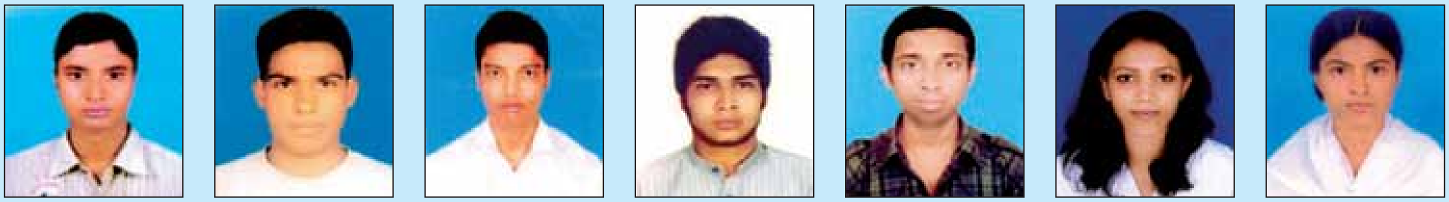

মোজাহিদ ১১৭৭	শাকিল ১১৭৮	দিপু ১১৮০	তানভীর ১১৮১	শরীফ ১১৮২	মারিয়া ১১৮৩	তাহলিমা ১১৮৪

ইমরান
১১৮৬

বি বি এ (অনার্স) পার্ট-২ (পুরাতন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

আমরিনা	তাহমিনা	শিমু	ইসমা	বৃষ্টি	জলি	সালমা
১০২৩	১০২৫	১০২৬	১০২৭	১০২৮	১০৩০	১০৩১

আসমা	ঝুমু	তৃষা	তন্নী	লিজা	সুমাইয়া	সোনিয়া
১০৩২	১০৩৪	১০৩৫	১০৩৬	১০৩৭	১০৩৮	১০৪০

স্বর্ণা	মাহিন	আঁখি	মনিকা	বিজয়া	দিপ্তি	রাশেদুজ্জামান
১০৪১	১০৪২	১০৪৩	১০৪৪	১০৪৬	১০৪৭	১০৪৯

রাজন	রাহুল	সাজ্জাদ	মাহাবুব	কাউসার	মেহেদী	শরিফুল
১০৫০	১০৫১	১০৫২	১০৫৩	১০৫৪	১০৫৫	১০৫৭

হাবিবুর	জসিম	অপু	গৌতম	সাইদুর	হাদি	রাকিব
১০৫৯	১০৬০	১০৬১	১০৬২	১০৬৩	১০৬৪	১০৬৭

তুহিন	রতন	উজ্জল	মারুফ	ইকবাল	কামরুল	রুবেল
১০৬৯	১০৭০	১০৭১	১০৭২	১০৭৩	১০৭৪	১০৭৬

রিয়াদ ১০৭৮	মুশফিকুর ১০৮০	রিয়াদ ১০৮১	বিজয় ১০৮২	সৌরভ ১০৮৩	নবিন ১০৮৬	মামুন ১০৮৭

অনিক ১০৮৮	শাহরিয়ার ১০৯১	শাহ আলম ১০৯২	মাসুম ১০৯৫	ফয়সাল ১০৯৬	এনাম ১০৯৯	মামুন ১১০১

কার্তিক ১১০৩	তানভীর ১১০৫	নূর আলী ১১০৮

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১

রূপা ৯৫৯	ইমা ৯৬১	প্রিয়া ৯৬৩	রিফাত ৯৬৪	জেরিন ৯৬৫	কেয়া ৯৬৬	কানিজ ৯৭২

মাহফুজা ৯৭৩	নিপা ৯৭৬	শিলা ৯৭৭	ফারজানা ৯৭৮	শসি ৯৭৯	আইরিন ৯৮০	জুঁই ৯৮১

আসমা ৯৮২	সবুজ ৯৮৫	সুফল ৯৮৬	শুভ ৯৮৭	রাকিব ৯৮৮	আনি ৯৮৯	সানি ৯৯১

প্রিন্স	ফাহাদ	জাহিদ	মিরাজ	মামুন	অপু	সামি
৯৯২	৯৯৪	৯৯৫	৯৯৬	৯৯৮	৯৯৯	১০০০

রোমেন	টুটুল	রিকো	তুর্জ	প্রসেন	আরমান	জয়
১০০৩	১০০৪	১০০৫	১০০৬	১০০৮	১০০৯	১০১২

সাহিদ	রাজিব	আল-আমিন	ইমন	জামিল	মাসুদ	নাঈম
১০১৩	১০১৪	১০১৫	১০১৬	১০১৯	১০২০	১০২২

বি বি এ (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯-২০১০

নিশাত	আন্নি	জয়া	লিপি	সিমা	সাথি	জুঁই
৮৯৪	৮৯৫	৮৯৬	৮৯৭	৮৯৮	৯০০	৯০৩

সানজিদা	সোনিয়া	রিথিলা	মুনমুন	মিতু	হীরা	রওশন
৯০৪	৯০৬	৯০৭	৯০৮	৯০৯	৯১০	৯১১

আফরোজা	সিহাব	মুবারক	নাজমুল	হাসান	হামীম	এহসান
৯১২	৯১৩	৯১৫	৯১৬	৯২০	৯২১	৯২২

সাকিব
৯২৩

মঞ্জু
৯২৪

শুভ
৯২৬

সবুজ
৯২৮

মুন্না
৯২৯

জুবায়ের
৯৩১

নাঈম
৯৩২

মোস্তফা
৯৩৩

ইব্রাহীম
৯৩৪

মুসা
৯৩৫

সাবাহ
৯৩৬

ওয়াসিম
৯৩৭

ওয়াসেক
৯৩৮

মিজান
৯৪০

ফাহিম
৯৪১

সাজ্জাত
৯৪২

রেদওয়ান
৯৪৩

আদনান
৯৪৪

বাবু
৯৪৫

অপু
৯৪৬

সুমন
৯৪৭

রহমান
৯৪৮

জাহাঙ্গীর
৯৫১

হিটলার
৯৫৩

মুসফেক
৯৫৪

মহিমা
৯৫৭

এম বি এস শেষ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

বীনা
৩৩১

নিগার
৩৩২

স্বপ্না
৩৩৩

আজিজা
৩৩৪

তাহিরা
৩৩৫

হাবিবা
৩৩৬

বন্যা
৩৩৭

মাহমুদা
৩৩৮

শারমিন
৩৪০

খালেদা
৩৪১

সুচি
৩৪২

নাঈম
৩৪৩

মামুনুর
৩৪৪

হাবিবুর
৩৪৫

নাফিজ
৩৪৬

জ্যাকি
৩৪৭

কাঞ্চন
৩৪৮

মোর্শেদ
৩৪৯

জিয়াউর
৩৫০

তৌফিক
৩৫১

পারভেজ
৩৫২

মিজান
৩৫৩

ইমরান
৩৫৪

শারমিন
৩৫৫

মেহেদী
৩৫৬

নাসরিন
৩৫৭

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

বি বি এ (অনার্স) পার্ট-১, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

রাশেদ	হাসিম	নিপা	সুমী	সোহানা	ফারহানা	মনছুর
১০৯৩	১০৯৪	১০৯৫	১০৯৬	১০৯৭	১০৯৯	১১০০

রাইয়ান	রিফাত	মেহেদী	মৌসুমী	নূরসাবা	শামীমা	মিজানুর
১১০১	১১০৩	১১০৪	১১০৫	১১০৬	১১০৭	১১০৮

মাহমুদ	রিপন	প্রনব	তাজরিন	স্মৃতি	ফারহানা	জেরিন
১১১০	১১১১	১১১২	১১১৩	১১১৪	১১১৫	১১১৬

জাহাঙ্গীর	শাহাদাত	মার্জিয়া	তাসমিনা	নিমাই	সাদিয়া	ইমরান
১১১৭	১১১৮	১১১৯	১১২০	১১২১	১১২২	১১২৩

সাজ্জাদ	পলাশ	ফাতিমা	ইব্রাহীম	রিয়াদ	নিজাম	সাইদুর
১১২৪	১১২৭	১১২৮	১১২৯	১১৩০	১১৩১	১১৩২

সানজিদা	বুলবুল	সজিব	কাইয়্যুম	আনোয়ার	ওয়াসিমা	তানিয়া
১১৩৩	১১৩৪	১১৩৫	১১৩৬	১১৩৭	১১৩৮	১১৩৯

ফাতেমা ১১৪০	চৈতী ১১৪১	রিদয় ১১৪২	ইয়াছিন ১১৪৩	রেদওয়ান ১১৪৪	মোমেনা ১১৪৫	সাখাওয়াত ১১৪৬

বি বি এ (অনার্স) পার্ট-২, শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

মীম ১০৩৬	রানা ১০৩৭	আমিনুর ১০৩৯	সাব্বির ১০৪০	আশরাফুল ১০৪১	মিতু ১০৪২	মৌ ১০৪৩

হাবিব ১০৪৭	তনু ১০৪৮	মীম ১০৫০	সাব্বিউল ১০৫১	মুক্তি ১০৫২	ইসহাক ১০৫৩	আসিফ ১০৫৪

সুমন ১০৫৫	টুম্পা ১০৫৬	মৌমিতা ১০৫৭	সুরভী ১০৫৮	বিপাশা ১০৫৯	সাজ্জাদ ১০৬০	স্বর্ণা ১০৬১

মাহবুব ১০৬৪	আবুল ১০৬৫	রাবেয়া ১০৬৬	ইশান ১০৬৭	ফুয়াদ ১০৬৮	শামীমা ১০৬৯	মিঠুন ১০৭০

সোহান ১০৭১	ফাতেমা ১০৭২	তানিজা ১০৭৩	ইফাতা ১০৭৫	মনির ১০৭৬	নুসরাত ১০৭৭	শোভন ১০৭৮

খাইরুল ১০৭৯

শাকিল ১০৮০

সাজেদুর ১০৮১

শরীফ ১০৮২

জিন্নাত ১০৮৩

সুমন ১০৮৪

মাহমুদ ১০৮৫

রেজা ১০৮৬

ইমতিয়াজ ১০৮৭

মামুন ১০৮৯

শান্তা ১০৯১

বি বি এ (অনার্স) পার্ট-২, (পুরাতন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

ফাতেমা ৯৬৬

নাঈম ৯৬৭

শাকিবুল ৯৬৮

নাজনীন ৯৬৯

তাহসিব ৯৭০

পলাশ ৯৭১

হাসান ৯৭২

সিম্মি ৯৭৩

এহছান ৯৭৪

সামান্তা ৯৭৫

তৌফিক ৯৭৬

সোহাগ ৯৭৭

সৈতক ৯৭৮

সিনথিয়া ৯৭৯

শাহীনুর ৯৮০

সোনিয়া ৯৮২

শারমিন ৯৮৩

তানভির ৯৮৪

আবির ৯৮৫

লিলি ৯৮৭

তারিন ৯৮৮

ফারহানা ৯৮৯

তারেক ৯৯১

রাশেদ ৯৯২

সুমাইয়া ৯৯৩

লিমনু ৯৯৪

তানভীর ৯৯৫

জান্নাতুল ৯৯৬

রনি
১০০০

রুকাইয়া
১০০১

ইব্রাহীম
১০০২

আসিফ
১০০৩

আল-আমিন
১০০৪

জাহিদ
১০০৬

মাইনুদ্দিন
১০০৭

তৌহিদ
১০০৯

জহির
১০১০

শাহিন
১০১১

ইসরাত
১০১২

সফিক
১০১৩

ফারহা
১০১৪

তুহুরা
১০১৬

তানজিয়া
১০১৭

সুরাইয়া
১০১৮

সজীব
১০১৯

নাহিম
১০২০

মাহবুবা
১০২১

আরিফ
১০২২

চয়ন
১০২৪

তৃষ্ণা
১০২৫

আতিক
১০২৬

মাওয়া
১০২৭

মাহবুব
১০২৮

তারিফ
১০২৯

নাদিম
১০৩১

স্মৃতি
১০৩২

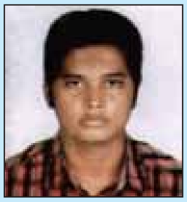
কামরুল
১০৩৪

বি বি এ (অনার্স) পার্ট-৩, শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১

সাবরিনা	সাফী	নাজমুন	তামান্না	রুবী	সিমকী	মাবিহা
৮৯৯	৯০০	৯০১	৯০২	৯০৩	৯০৪	৯০৫

জেরিন	ইতু	মালিহা	লোপা	নির্ঝর	নাসরিন	তাসনীম
৯০৬	৯০৭	৯০৮	৯০৯	৯১০	৯১১	৯১২

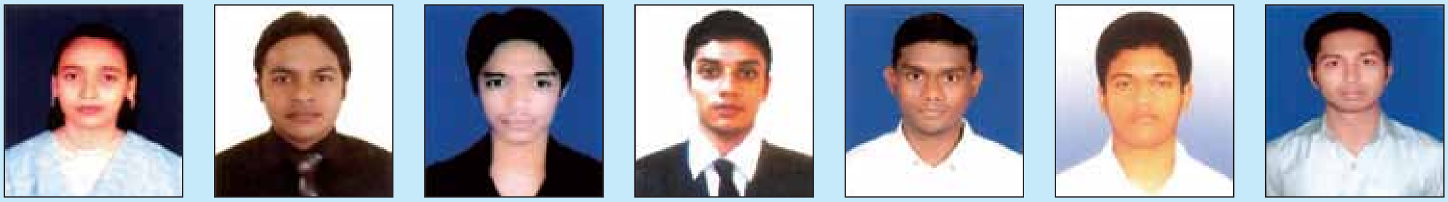

নাজমা	ফারুক	রায়হান	সুব্রত	আনোয়ারুল	হালীসন	রাশেদ
৯১৩	৯১৪	৯১৫	৯১৬	৯১৭	৯১৮	৯১৯

মোরশেদ	সেলিম	সবুজ	জিকু	ফাহিম	জাহিদ	শাকিল
৯২০	৯২২	৯২৪	৯২৬	৯২৭	৯২৮	৯৩০

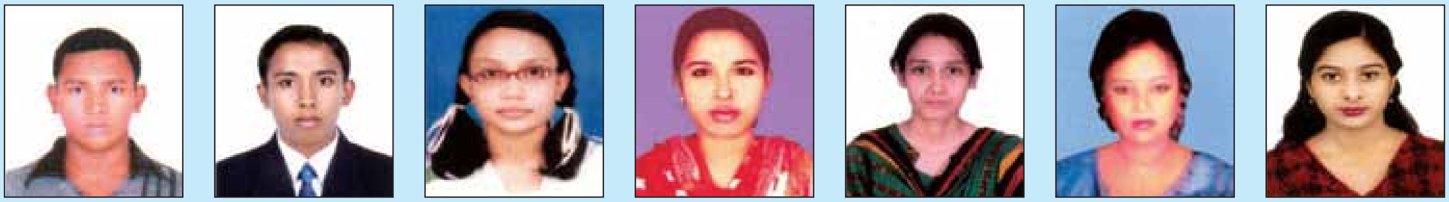

আহসান	মাসুদ	তহমিনা	শারমিন	সম্পা	সুমনা	কথা
৯৩১	৯৩২	৯৩৪	৯৩৮	৯৩৯	৯৪১	৯৪২

হাসনা	রাকীব	মাসুদ	সুমন	এলিভা	সাব্বির	শামীমা
৯৪৩	৯৪৪	৯৪৫	৯৪৬	৯৪৭	৯৪৮	৯৪৯

সাখিয়া
৯৫০

নাবিলা
৯৫১

আরিফ
৯৫২

রাকিব
৯৫৩

তাসলিম
৯৫৫

মিনহাজ
৯৫৬

সাইদ
৯৫৭

জান্নাতুল
৯৫৮

শামিমুর
৯৬০

মাসুদুর
৯৬১

নাহিদ
৯৬২

ফখরুল
৯৬৩

তাহমিনা
৯৬৪

রিফাত
৯৬৫

বি বি এ (অনার্স) পার্ট-৪, শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯-২০১০

সুমাইয়া	আফরোজা	মাহিয়া	রিতা	সাফী	মীম	জুথী
৮৩৪	৮৩৬	৮৩৭	৮৩৮	৮৩৯	৮৪২	৮৪৩

মাওয়া	সামিনা	সাফা	রুম্পা	আয়শা	ফাতেমা	সানজিদা
৮৪৫	৮৪৬	৮৪৭	৮৪৮	৮৪৯	৮৫০	৮৫১

আফরিনা	সুমনা	নাজিফা	বৃষ্টি	দিলরুবা	কানন	রাব্বী
৮৫২	৮৫৩	৮৫৪	৮৫৫	৮৫৬	৮৫৭	৮৫৮

সামিউল	ওলিউল	শিহাব	নাঈম	অভি	সাজ্জাদ	মাহবুব
৮৫৯	৮৬০	৮৬১	৮৬২	৮৬৩	৮৬৪	৮৬৯

আসিফ	নোমান	তানভীর	মিজান	রায়হান	নাইমুল	মুস্তাফিজুর
৮৭০	৮৭১	৮৭২	৮৭৩	৮৭৪	৮৭৫	৮৭৬

আলমগীর	মাহমুদ	তৌহিদ	সাদেক	মাহফুজুর	তানভীর	ফারজানা
৮৭৭	৮৭৮	৮৭৯	৮৮০	৮৮১	৮৮২	৮৮৩

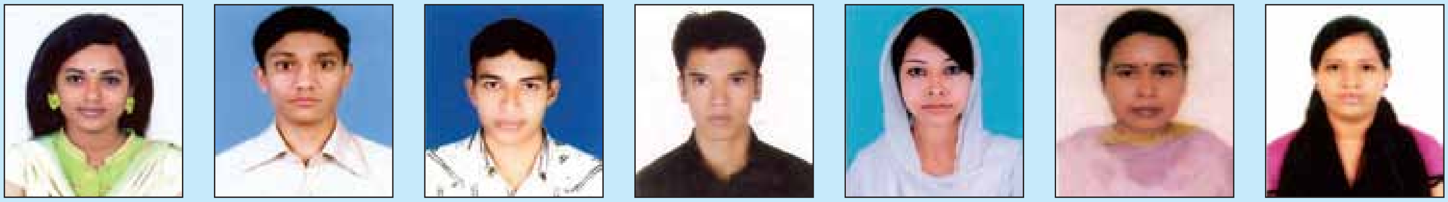

লাবনী ৮৮৪ | মোহাইমিনুল ৮৮৬ | মনোয়ার ৮৮৭ | আরিফ ৮৮৮ | নিশা ৮৮৯ | লিজা ৮৯০ | খালেদা ৮৯২

সাঈদ ৮৯৩ | ইব্রাহীম ৮৯৪ | সুমাইয়া ৮৯৫ | নওরীন ৮৯৬ | হামিদ ৮৯৮ | সুমাইয়া ৮৯৮(অ)

এম বি এস শেষ বর্ষ , শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

তাসলিমা ৪২৩ | তামান্না ৪২৪ | শিরীন ৪২৫ | নাদিয়া ৪২৬ | রাবিয়া ৪২৭ | কেয়া ৪২৮ | ফারহানা ৪২৯

আনোয়ারা ৪৩০ | ফাতেমা ৪৩১ | ইনছানা ৪৩২ | শিপু ৪৩৩ | জোবাইদা ৪৩৪ | মাহেরা ৪৩৫ | রাজিয়া ৪৩৬

জান্নাতুল ৪৩৭ | হাবিবুর ৪৩৮ | শাওলিন ৪৩৯ | শারমিন ৪৪০ | সাঈদ ৪৪১ | হাসনাইন ৪৪২ | নাইমুল ৪৪৩

আশফাকুর ৪৪৪ | সফরউদ্দিন ৪৪৫ | ফুয়াদ ৪৪৬ | মীম ৪৪৭ | মিনহাজুল ৪৪৮ | জহির ৪৪৯ | সায়হাবা ৪৫০

ঈশিতা
৪৫১

ফাহমিদা
৪৫২

সোহেলী
৪৫৩

পলি
৪৫৪

নকিবুল
৪৫৫

বন্যা
৪৫৬

রুমানা
৪৫৭

মুনা
৪৫৮

ইসতিয়াদ
৪৫৯

রনি
৪৬০

আতিকুর
৪৬১

মুনিম
৪৬২

তানহা
৪৬৩

সাবিবা
৪৬৪

এ্যানি
৪৬৫

ফরহাদ
৪৬৬

সমির
৪৬৭

শাফিনুল
৪৬৮

মাসুম
৪৬৯

দাউদনবী
৪৭০

মাহাবুব
৪৭১

জ্যোতিকৃষ্ণ
৪৭২

শাকিল
৪৭৩

রেজাউল
৪৭৪

হিমেল
৪৭৫

সৌরভ
৪৭৬

মার্কেটিং বিভাগ

বি বি এ (অনার্স) ১ম বর্ষ শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

জেনিফার ১০৬৩ | আফরিন ১০৬৪ | আনসানা ১০৬৫ | জান্নাতুল ১০৬৬ | রিমা ১০৬৭ | সোনিয়া ১০৬৮ | জেসমিন ১০৬৯

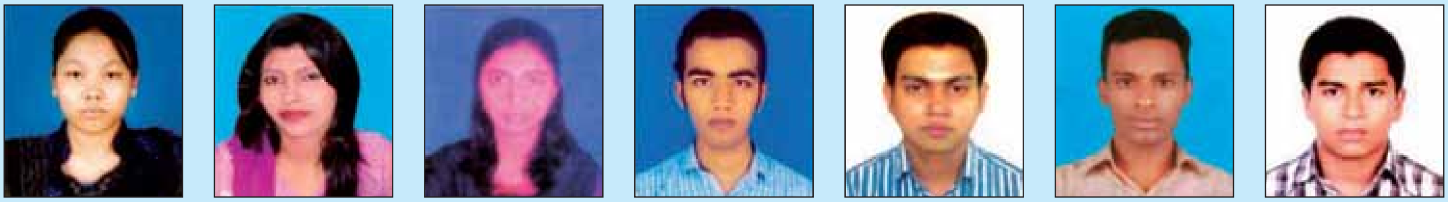

শ্রাবণী ১০৭০ | সানজীদা ১০৭১ | কেয়া ১০৭২ | কামরুন ১০৭৩ | মমিনুল ১০৭৪ | রনি ১০৭৫ | মাহিম ১০৭৬

তানজীম ১০৭৭ | লালচাঁদ ১০৭৮ | শামীম ১০৭৯ | তারিকুন ১০৮০ | তুহিন ১০৮১ | ইমদাদুল ১০৮২ | হাসান ১০৮৩

আব্দুস সবুর ১০৮৪ | নাজমুল ১০৮৫ | অর্ণব ১০৮৬ | মাহাবুব ১০৮৭ | উম্মে কুলসুম ১০৮৮ | সোলায়মান ১০৮৯ | রাশিদুল ১০৯০

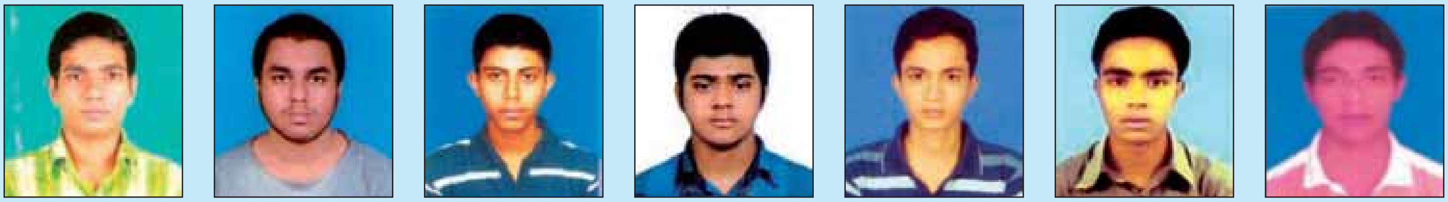

শামসুজ্জোহা ১০৯১ | তানভীর ১০৯২ | রিপন ১০৯৩ | সোহাগ ১০৯৪ | শোভিক ১০৯৫ | ...... ১০৯৬ | মোল্লা ১০৯৭

শারমিন ১০৯৮ | হৃদয় ১০৯৯ | মোজাদ্দেদ ১১০০ | রিয়াজ ১১০১ | আল-আমিন ১১০২ | লুৎফর ১১০৩ | রফিক ১১০৪

জহিরুল
১১০৫

রেদওয়ান
১১০৬

জাহিদ
১১০৭

মুন্নী
১১০৮

টিটু
১১০৯

ইমরান
১১১০

উজ্জ্বল
১১১১

আরিফ
১১১২

রায়হান
১১১৩

রুবেল
১১১৪

রাব্বি
১১১৫

সাজিদ
১১১৬

সাদিকা
১১১৭

ইরা
১১১৮

নাহিয়ানু
১১১৯

আল-আমিন
১১২০

সাথী
১১২১

কবির
১১২২

সোহাগ
১১২৩

মাসুদ
১১২৪

আরিফ
১১২৫

মামুন
১১২৬

অথৈ
১১২৭

সম্রাট
১১২৮

আল-নোমান
১১২৯

বি বি এ (অনার্স) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

সোনিয়া
১০১৮

লিজা
১০১৯

ইফফাত
১০২০

মুশফিকুর
১০২২

নাহিদ
১০২৩

ফয়সাল
১০২৪

শরীফ
১০২৬

ইকবাল
১০২৭

ফরহাদ
১০২৮

প্রসেনজিৎ
১০২৯

শিশির
১০৩০

মেহেদী
১০৩২

সোয়েব
১০৩৩

কাদের
১০৩৪

মিরাজ
১০৩৬

তুষার
১০৩৭

ইমরান
১০৩৮

সজীব
১০৪০

সিদ্দিক
১০৪২

সামিউল
১০৪৩

সজীব
১০৪৫

হাসান
১০৪৯

সুমন
১০৫১

অপূর্ব
১০৫২

সুমন
১০৫৫

আশরাফ
১০৫৮

রাসেল
১০৬০

শাহেদ
১০৬১

ফাহমিদা
১০৬২

বি বি এ (অনার্স) ২য় বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

শারমিন
৯৫২

সুলতানা
৯৫৩

আকলিমা
৯৫৪

সুমাইয়া
৯৫৫

অন্যান্য
৯৫৬

সায়মা
৯৫৭

রাজিয়া
৯৫৮

শান্তা
৯৫৯

রাহিমা
৯৬০

ঊর্মি
৯৬১

নাহিদ
৯৬২

শাহনূর
৯৬৫

রাহী
৯৬৮

মইনুর
৯৭০

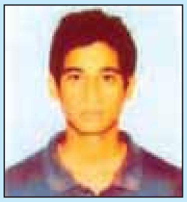
হারুন
৯৭২

আশিকুর
৯৭৩

জাহাঙ্গীর
৯৭৫

রাশেদ
৯৭৬

ফকরুল
৯৭৮

শাকিল
৯৭৯

সামশুর
৯৮০

আউয়াল
৯৮৩

বিশ্বজিৎ
৯৮৫

রিয়াজ
৯৮৬

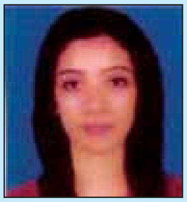
সানজিদা
৯৮৭

ইশরাত
৯৮৮

রেজভী
৯৮৯

আরিফ
৯৯০

সবুজ
৯৯১

রিয়াদ
৯৯২

তুষার
৯৯৪

আলী
৯৯৫

রহমত
৯৯৭

মাহমুদুল
১০০০

জয়
১০০১

সাব্বির
১০০২

মামুন
১০০৩

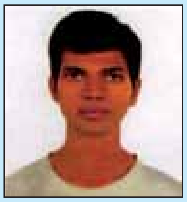
সাব্বির
১০০৬

করিম
১০০৭

ফার্সি
১০০৮

রিফাত
১০০৯

সাদ্দাম
১০১০

তাহছিন
১০১১

তাহের
১০১৭

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ - শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১

সানজিদা
৮৯১

কানিজ
৮৯২

নাসরিন
৮৯৩

ফারিয়াহ
৮৯৫

লুৎফুন্নাহার
৮৯৬

তাসনিম
৮৯৯

শারমনি
৯০০

নূর
৯০১

আহাদ
৯০২

সঞ্জয়
৯০৪

চঞ্চল
৯০৫

জাহিদ
৯০৬

ইয়াছিন
৯১০

বিকাশ
৯১৩

তানভির ৯১৪	মাহমুদা ৯১৫	জান্নাত ৯১৬	নিশি ৯১৭	মাসুদ ৯১৯	আশরাফ ৯২০	আনিস ৯২১

সাখাওয়াত ৯২২	ইমদাদ ৯২৩	শহিদ ৯২৪	আশরাফুল ৯২৫	আখের ৯২৬	হাসান ৯২৭	জাকির ৯২৮

খালিদ ৯৩০	মনির ৯৩১	মারুফ ৯৩২	তাসলিমা ৯৩৫	সোহেল ৯৩৭	জিয়া ৯৩৮	সাগর ৯৪০

হাবিব ৯৪১	পারভেজ ৯৪২	কাশিদ ৯৪৪	শহিদুল ৯৪৫	সায়মা ৯৪৬	মুরাদ ৯৪৭

বি বি এ (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ - শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯-২০১০

সাজিয়া ৮৩২	সামিরা ৮৩৩	তাজমিনা ৮৩৪	সোনিয়া ৮৩৬	নূরজাহান ৮৩৭	ইফাত ৮৩৯	আয়েশা ৮৪১

খালেদ ৮৪২	নাজমুস ৮৪৩	সামিউল ৮৪৫	শামছুল ৮৪৭	অনিক ৮৪৯	নবী নেওয়াজ ৮৫০	রবিউল ৮৫১

এ্যালেন
৮৫৪

সাদমান
৮৫৭

মাসুদ
৮৫৮

শফিক
৮৬১

ইফতেখার
৮৬২

জাহেদ
৮৬৩

সাজু
৮৬৪

তারিফ
৮৬৭

তাহির
৮৬৮

শফিক
৮৬৯

আলমাস
৮৭০

রফিক
৮৭২

মহিউদ্দীন
৮৭৪

রিমন
৮৭৫

তন্ময়
৮৭৮

রফিক
৮৭৯

আরিফ
৮৮০

হাজেরা
৮৮৩

তাফসিন
৮৮৪

জাহিদ
৮৮৬

উলফাত
৮৮৭

জহির
৮৮৯

এম. বি. এস শেষ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

রুমা
২৯৩

জোহান
২৯৪

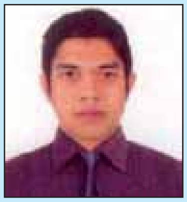
তৌহিদ
২৯৬

বুলবুল
২৯৭

ফারুক
২৯৮

কাইয়ুম
২৯৯

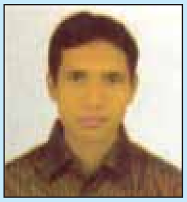
রাসেল
৩০০

রিশাত
৩০১

জেনিফার
৩০২

গালিব
৩০৩

তানভীর
৩০৪

হাবিব
৩০৫

অসিম
৩০৬

শামীম
৩০৭

জহির
৩০৮

রকিব
৩০৯

স্বর্ণা
৩১০

রোকেয়া
৩১১

ফাহমিদা
৩১২

তাফসিনা
৩১৩

নিশি
৩১৪

মিতি
৩১৫

নাজমুল
৩১৬

রাশেদ
৩১৭

শোভা
৩১৮

তৌহিদ
৩১৯

সায়মা
৩২০

বিপাশা
৩২১

ফারুক
৩২২

রূপম
৩২৩

সোহান
৩২৪

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (বিবিএ)

বি বি এ (অনার্স) প্রফেশনাল প্রোগ্রাম ১ম বর্ষ ১ম সেমিস্টার
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

বিনু	বিন্তী	মিনা	মাহা	রুবি	লাকি	চৈতি
২৬০	২৬১	২৬২	২৬৩	২৬৪	২৬৫	২৬৬

শায়লা	তামান্না	রাইসা	স্বর্ণা	অমৃতা	আফসানা চৈতি	দিপ্তি
২৬৭	২৬৮	২৭৯	২৭০	২৭১	২৭২	২৭৪

ছাকিনা	রাত্রি	তানজিনা	মাহফুজা	কান্তা	বিপাশা	জাকিয়া
২৭৫	২৭৬	২৭৭	২৭৮	২৭৯	২৮০	২৮১

শাওন	বাপ্পী	রাকিব	শরিফুল	মঈন	ইফতি	রাতুল
২৮২	২৮৩	২৮৪	২৮৫	২৮৬	২৮৭	২৮৮

রকি	নাসির	বিপুল	ফাহিম	তন্ময়	কাউসার	বর্ষণ
২৮৯	২৯০	২৯১	২৯২	২৯৪	২৯৫	২৯৬

আসিফ	হাসান	জুয়েল	আশরাফুল	মোঃ নিলয়	সুমন	পলাশ
২৯৭	২৯৯	৩০০	৩০১	৩০২	৩০৩	৩০৪

তানভীর
৩০৫

তানজিল
৩০৬

দিগন্ত
৩০৭

জয়
৩০৮

সোহেল
৩০৯

তানজিল
৩১০

আরিফ
৩১১

সাজ্জাদ
৩১৩

রাকিব
৩১৫

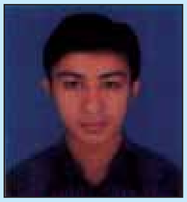
আকাশ
৩১৬

পার্থ
৩১৭

শামীম
৩১৯

সালমান
৩২০

রাশেদুল
৩২১

আরিফ
৩২২

জিসান
৩২৩

আব্দুল্লাহ
৩২৪

সাগর
৩২৫

জনি
৩২৬

রাফাকাত
৩২৭

লোকমান
৩২৮

ইমরান
৩২৯

মুনিয়া
৩৩০

এশা
৩৩১

আফরিন
৩৩২

রাকা
৩৩৩

সুমি
৩৩৪

সিনথিয়া
৩৩৫

রিদিতা
৩৩৬

বাবলী
৩৩৭

ইংরেজি বিভাগ

বি. এ (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

নাজিফা
৪৪৩

রুবাইয়া
৪৪৪

শারমিন
৪৪৫

সুমাইয়া
৪৪৬

মেহনাজ
৪৪৭

ঊর্মি
৪৪৮

স্বর্ণা
৪৪৯

ঐশী
৪৫০

ফৌজিয়া
৪৫১

ইলিয়াস
৪৫২

বি. এ (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

নওরীন
৪৩৭

আফরোজা
৪৩৮

ঐশী
৪৪১

বি. এ (সম্মান) ২য় বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

মাজেদা
৪২৩

মিজানুর
৪২৪

নুজহাত
৪২৬

রাজনুমা মালিক
৪২৮

জান্নাত
৪২৯

সানজিদা
৪৩০

মুক্তা
৪৩২

ঝুটন
৪৩৩

ফারুক
৪৩৪

আফরানা
৪৩৫

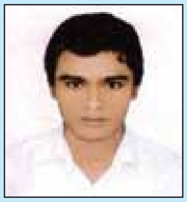
মাহমুদুল
৪৩৬

বি. এ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১

ফারহানা
৪১৪

নওশীন
৪১৫

যোসেফ
৪১৬

বদরুদ্দোজা
৪১৭

আফরিন
৪২১

বি. এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯-২০১০

হুমায়রা
৪০৬

রুবাইয়া
৪০৯

সানজিদা
৪১৩

এম. এ শেষ বর্ষ শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

ইশরাত
২৬

তুনাজ্জিনা
২৭

জালিয়া
২৮

সানজিয়া
২৯

অর্থনীতি বিভাগ

বি. এস.এস (অনার্স) পার্ট-১, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

কাসপিয়া
৩৩৫

শাহনাজ
৩৩৫

মাহফুজ
৩৩৭

নূর আলম
৩৩৮

নিশাত
৩৩৯

দেলোয়ার
৩৪০

বদিউজ্জামান
৩৪১

হাসানুজ্জামান
৩৪৩

মওদুদ
৩৪৫

জাবের
৩৪৬

রেজাউল
৩৪৭

আবু তাহের
৩৪৮

আল মামুন
৩৫০

বি. এস. এস (অনার্স) পার্ট-২, শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

নয়ন
৩১৯

আইরিন
৩২০

ঝুমুর
৩২১

মালিহা
৩২২

ফাতেমা
৩২৩

জাহিদ
৩২৪

মিজান
৩২৫

তাসলিমা
৩২৬

রাসেল
৩২৭

হোসেনে আরা
৩২৮

শাখাওয়াত
৩২৯

শিল্পী
৩৩০

আজাদ
৩৩১

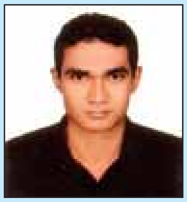
আলমগীর
৩৩২

রনি
৩৩৩

সাজ্জাদ
৩৩৪

বি. এস. এস (অনার্স) পার্ট-২ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

জান্নাতুল
২৯১

সুমন
২৯৩

জোছনা
২৯৪

ফারহানা
২৯৫

জাহিদ
২৯৬

সহিদুল
২৯৭

ফারজানা
২৯৯

সাদিয়া
৩০০

আসিফ
৩০৪

সাজেদুল
৩০৫

ইফতেখার
৩০৬

শিহাব
৩০৭

আশরাফুল
৩১০

আলিফুল
৩১১

অনুপ
৩১২

মাসুম
৩১৩

সাব্বির
৩১৪

নিপা
৩১৫

নজরুল
৩১৬

মহিউদ্দিন
৩১৭

বি. এস. এস (অনার্স) পার্ট-৩, শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১

মিশকাত
২৮৭

তৌফিক
২৮৮

বারেক
২৮৯

প্রান্ত
২৯০

এম. এস. এস শেষ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

তন্বী
৩৩

তানিয়া
৩৪

অ্যালবাম

পরিচালনা পরিষদ

পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক এর সভাপতিত্বে চলছে পরিচালনা পরিষদের মিটিং

ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে নতুন শিক্ষক প্রতিনিধি প্রফেসর মোঃ আবদুল কাইয়ুম কে (ইংরেজি বিভাগ) বরণ করছেন প্রফেসর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার (মার্কেটিং বিভাগ)

নতুন শিক্ষক প্রতিনিধি জনাব আকতার হোসেনকে (সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ) ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন জনাব সাইদুর রহমান মিঞা (সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ)

নতুন শিক্ষক প্রতিনিধি জনাব ফারহানা আরজুমানকে (সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ) ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন জনাব ফারহানা সাত্তার (সহকারী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ)

টিচার্স ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম-২০১৪

টিচার্স ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

টিচার্স ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণরত শিক্ষকদের একাংশ

টিচার্স ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী, বাংলা বিভাগ

টিচার্স ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ূম, ইংরেজি বিভাগ

প্রবন্ধ পাঠ করছেন জনাব মোঃ ইউনুস হাওলাদার সহযোগী অধ্যাপক, সাচিবিক বিদ্যা বিভাগ

বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

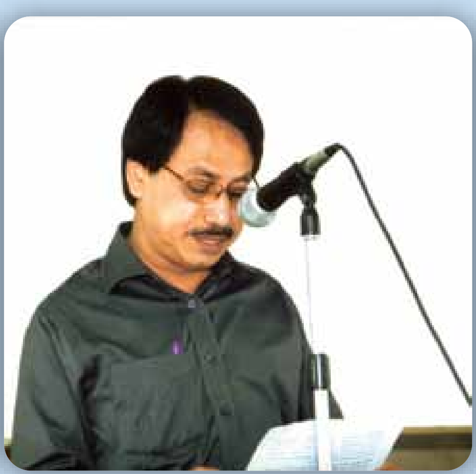

বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব সাদিক মোঃ সেলিম সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব শামসাদ শাহজাহান সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

একাদশ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম-২০১৪

একাদশ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য প্রদান করছেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

বক্তব্য প্রদান করছেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল

বক্তব্য প্রদান করছেন ভর্তি কমিটির আহবায়ক প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শপথ পাঠ করাচ্ছেন প্রফেসর মোঃ আবদুল কাইয়ুম, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বক্তব্য রাখছে একাদশ শ্রেণির একজন ছাত্রী

অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীবৃন্দ

অনার্স পার্ট-১ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ২০১৪

১ম বর্ষ (সম্মান) শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য প্রদান করছেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

বক্তব্য প্রদান করছেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল

শপথ গ্রহণ করাচ্ছেন শিক্ষার্থী উপদেষ্টা প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য প্রদান করছেন ভর্তি কমিটির আহবায়ক জনাব মোঃ আকতার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখছে অনার্স পার্ট-১ এর একজন ছাত্রী

উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের একাংশ

শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৪

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৪ এর উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ, মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল ও আহবায়ক হাসানুর রশীদ, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ক্যারাম বোর্ড খেলার উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

ফেন্সিং এ অংশগ্রহণরত ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ

দাবা খেলার উদ্বোধন করছেন আহবায়ক

ছাত্রীদের ক্যারাম বোর্ড খেলা উদ্বোধন করছেন আহবায়ক জনাব হাসানুর রশীদ

টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা

শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৪

সংগীত প্রতিযোগিতা

নৃত্য প্রতিযোগিতায় একজন শিক্ষার্থী

একক অভিনয় করছে একজন ছাত্র

ফলাফল ঘোষণা করছেন মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

রং তুলির আঁচড়ে চলছে ছবি আঁকা

শিক্ষা সপ্তাহে অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

ইলিশ ভ্রমণ-২০১৪

ইলিশ ও বেলুন উড়িয়ে ভ্রমণের উদ্বোধন করছেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ, উপস্থিত আছেন শিক্ষকবৃন্দ

ইলিশ ভ্রমণে উপস্থিত অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ

খাবার টেবিলে শিক্ষিকাবৃন্দ

মধ্যাহ্ন ভোজে শিক্ষকবৃন্দ

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে

খাদ্য গ্রহণ করছে ছাত্রীরা

ইলিশ ভ্রমণ-২০১৪

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একটি আনন্দঘন মুহূর্ত

ইলিশ ভ্রমণে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা

নাটকের একটি দৃশ্য

উপহার প্রদান করছেন সম্মানিত অতিথি অধ্যক্ষ মহোদয়ের সহধর্মিনী বেগম খুরশীদ জাহান

বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

বক্তব্য প্রদান করছেন আহবায়ক মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৪

বেলুন উড়িয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৪ উদ্বোধন করছেন প্রধান অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ্

মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহকে ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন আহবায়ক জনাব মোঃ হাসানুর রশীদ

মাননীয় সংসদ সদস্য ইলিয়াস মোল্লাকে গার্ড অব ওনার প্রদান করছে বি.এন.সি.সির ক্যাডেটবৃন্দ

ক্রীড়া অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন প্রধান অতিথি জনাব জালাল ইউনুস, কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ

শিক্ষিকাবৃন্দের উইকেট ভাঙা প্রতিযোগিতায় উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দ, বিচারক ও উৎসুক ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

শিক্ষকদের দৌড় প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৪

ছাত্রীদের দীর্ঘ লাফ প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য

ছাত্রদের দীর্ঘ লাফ প্রতিযোগিতা

ছাত্রীদের উচ্চলাফ প্রতিযোগিতার একটি মুহূর্ত

ছাত্রদের দৌড় প্রতিযোগিতা

মাঠে উপস্থিত শিক্ষিকাবৃন্দ

মাঠে উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দ

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৪

ভারসাম্য দৌড়

আকর্ষণীয় বস্তাদৌড়

ছাত্রদের বর্শা নিক্ষেপের একটি মুহূর্ত

তরবারী যুদ্ধ প্রতিযোগিতা

যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা উপভোগ করছেন দর্শকবৃন্দ

ছাত্রীদের দৌড় প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৪

ডিসপ্লের নাচের একটি মুহূর্ত

দর্শকরা উপভোগ করছেন লাঠিনৃত্য

প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিজয় চিহ্ন প্রদর্শন করছে

পুরস্কার প্রদান করছেন সম্মানিত প্রধান অতিথি, সম্মানিত বিশেষ অতিথি

পুরস্কার গ্রহণ করছে একজন ছাত্রী

ক্রীড়া অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন দর্শকবৃন্দ

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান-২০১৪

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

পুরস্কার গ্রহণ করছেন মোঃ ইব্রাহীম খলিল, সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ, পুরস্কার প্রদান করছেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, পাশে আছেন অধ্যক্ষ স্যার, উপাধ্যক্ষ স্যার

পুরস্কার গ্রহণ করছেন শামা আহমেদ, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পুরস্কার প্রদান করছেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, পাশে আছেন উপাধ্যক্ষ স্যার

পুরস্কার গ্রহণ করছেন মোঃ ইয়াছিন (কর্মচারী)

পুরস্কার গ্রহণ করছে একজন বিজয়ী ছাত্রী

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যারের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে একজন বিজয়ী ছাত্র

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান-২০১৪

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার গ্রহণ করছে একজন ছাত্রী, পুরস্কার প্রদান করছেন প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার গ্রহণ করছে একজন ছাত্র

নৃত্য নাট্যের একটি দৃশ্য

সংগীত পরিবেশন করছে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

নৃত্য পরিবেশন করছে ছাত্রীরা

নৃত্য পরিবেশন করছে আদিবা আজম মাটি

বার্ষিক ভোজ

বার্ষিক ভোজে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

বার্ষিক ভোজে উপস্থিত পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান, অধ্যক্ষ ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে আপ্যায়ন করছেন কলেজের শিক্ষিকাবৃন্দ

বার্ষিক ভোজে উপস্থিত পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

বার্ষিক ভোজ উদ্বোধন করছেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ, উপস্থিত আছেন শিক্ষকবৃন্দ

ভোজে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের একাংশ

বার্ষিক ভোজ

ভোজে উপস্থিত ছাত্রীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে

ভোজে উপস্থিত অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য অপেক্ষায় খাবারের সারি

ফলাহার

ফলাহারে উপস্থিত পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ ও শিক্ষকবৃন্দ

ফলাহারে অংশ নিচ্ছেন পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ফলাহারে ফল সংগ্রহ করছেন অধ্যক্ষ, উপধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ

ঢাকা কমার্স কলেজ কল্যাণ সংঘ আয়োজিত ফলাহারে অংশ নিচ্ছেন শিক্ষকবৃন্দ

২১ ফেব্রুয়ারি : শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

২১ ফেব্রুয়ারি পতাকা উত্তোলন করছেন অধ্যক্ষ স্যার

প্রভাতফেরীতে অংশগ্রহণরত ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন প্রধান অতিথি ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও আহ্বায়ক

পরিচালনা পরিষদের পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন প্রফেসর আবু সালেহ, উপাচার্য, বি ইউ বি টি এবং প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, সাবেক উপাধ্যক্ষ

পুষ্পস্তবক অর্পন করছে শিক্ষার্থী উপদেষ্টাবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ

২১ ফেব্রুয়ারি : শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে বাংলা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

মার্কেটিং বিভাগের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

২১ ফেব্রুয়ারি : শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে বিবিএ শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে পরিসংখ্যান, গণিত ও কম্পিউটার বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

শ্রদ্ধা নিবেদন করছে শিক্ষক পরিবারের সদস্যবৃন্দ

২১ ফেব্রুয়ারি : শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে লাইব্রেরি শাখা

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে অফিস শাখা

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে হিসাব শাখা

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে মেডিকেল শাখা

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা

২১ ফেব্রুয়ারি : শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান অতিথি ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক

আবৃত্তি করছে আবৃত্তি ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

নাটক চলছে

উপস্থিত সুধীজন

২৬ মার্চ : স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত চলাকালে উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন

লাখো কণ্ঠে জাতীয় সংগীতে অংশগ্রহণ করায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সনদ

১৫ আগস্ট: জাতীয় শোক দিবস

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

বক্তব্য প্রদান করছেন কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল

বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব সাইদুর রহমান মিঞা, চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ

বক্তব্য রাখছেন জনাব হাসানুর রশীদ, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব সাহজাহান আলী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

১৬ ডিসেম্বর: বিজয় দিবস

বিজয় দিবস উপলক্ষে শহীদ মিনারে মঞ্চস্থ নাটিকার দৃশ্য

বিজয় দিবস ২০১৪ উপলক্ষে রোটার‌্যাক্ট ক্লাব আয়োজিত আলোচনা সভা ও মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোহাজার জামিল

বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষার্থী উপদেষ্টা ও অনুষ্ঠানের আহবায়ক জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ

বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষার্থী উপদেষ্টা প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম

বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষার্থী উপদেষ্টা প্রফেসর মোঃ আবদুল কাইয়ুম

বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষার্থী উপদেষ্টা জনাব মোঃ বদিউল আলম

বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষার্থী উপদেষ্টা জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা

অনুভূতি ব্যক্ত করছে একজন ছাত্রী

নির্মাণ

নব নির্মিত শহীদ মিনার

নতুন কম্পিউটার ল্যাব উদ্বোধন করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মঞ্জুর মোর্শেদ

ভবন-২ এর নতুন লিফট সংযোজন

নতুন জেনারেটর রুম

নির্মাণাধীন ভবন-২ এর বর্ধিত অংশ

নবনির্মিত নতুন সাজে সজ্জিত অডিটোরিয়াম

জাতীয় সাফল্য

বাংলাদেশ বাশাআপ এসোসিয়েশন আয়োজিত আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ঢাকা কমার্স কলেজ টিমের সাথে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ

বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে আয়োজিত বই পড়া পুরস্কার বিতরণ ২০১৪ এ বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ আবু সাইদ, বিশিষ্ট সাহিত্যিক জনাব ইমদাদুল হক মিলন, কলেজের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল ও গ্রন্থাগারিক জনাব মুহাম্মদ আশরাফুল করিম এর সাথে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ

গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস এ অংশগ্রহণকারী মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র রিফাত ও জাতীয় দলের অন্যান্য খেলোয়ারবৃন্দ

বিজয় দিবস ফেন্সিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও পদক বিজয়ী সাদিয়া

জাতীয় ফ্লোরবল চ্যাম্পিয়ন ঢাকা কমার্স কলেজ মহিলা টিম

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত আন্তঃকলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল খেলার মুহূর্ত

অ্যালবাম

জাতীয় সাফল্য

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতায়
ঢাকা কমার্স কলেজ ফুটবল দল

বাংলাদেশ বাশাআপ (মার্শাল আর্ট) এসোসিয়েশন আয়োজিত জাতীয়
প্রতিযোগিতায় উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত

শিক্ষকদের ভ্রমণ

ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক কর্তৃক আয়োজিত নিজস্ব বাগান বাড়িতে শিক্ষক বনভোজনে অংশগ্রহণরত শিক্ষকবৃন্দ

শীতবস্ত্র বিতরণ

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম
খলিল এর নেতৃত্বে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে শীতবস্ত্র বিতরণ

শীতবস্ত্র গ্রহণকারীদের একাংশ

বিভাগীয় কার্যক্রম

বাংলা বিভাগ

টিচার্স ওরিয়েন্টেশন-এ বাংলা বিভাগের অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের পক্ষে সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন বিভাগের চেয়ারম্যান

বিভাগীয় শিক্ষকমণ্ডলী

ইংরেজি বিভাগ

ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'এ্যালামনি এ্যাসোসিয়েশন' কর্তৃক আয়োজিত ইফতার মাহফিলে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সাথে বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ

শিক্ষা সফরে গাজীপুরের সাফারি পার্কে উপস্থিত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ

শিক্ষা সফরে উপস্থিত অতিথিদের সাথে বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ

শিক্ষাসফরে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকবৃন্দ

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ড্রিম হলিডে পার্কে বিভাগীয় বার্ষিক বনভোজনে বক্তব্য রাখছেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব এস.এম. আলী আজম

বিভাগীয় বার্ষিক বনভোজনে বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

বিভাগীয় শিক্ষকদের সাথে শিক্ষা সফরে ছাত্র-ছাত্রীরা

৪র্থ বর্ষের সমাপনী অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে চেয়ারম্যান ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ

মাস্টার্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ

১ম বর্ষের নবীনবরণ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করছেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

মহান ভাষা দিবসে (২০১৪) ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকাগণের শহীদ মিনারে ফুলেল শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

ইইঅ (অনার্স) ৩য় বর্ষের ক্লাস সমাপনি অনুষ্ঠান

শিক্ষা সফর অনার্স ৪র্থ বর্ষ, রাঙ্গামাটি

শিক্ষা সফর অনার্স ৪র্থ বর্ষ, বান্দরবান

শিক্ষা সফর অনার্স ২য় বর্ষ, কক্সবাজার

শিক্ষা সফর অনার্স ২য় বর্ষ, সেন্টমার্টিন

অ্যালবাম

মার্কেটিং বিভাগ

অনার্স পার্ট-২ (পুরাতন) এর ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠানে কেক কাটছেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব শনজিত সাহা ও শিক্ষকবৃন্দ

ক্যান্সার আক্রান্ত তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী রেজভীর মায়ের হাতে বিভাগের উদ্যোগে সংগৃহীত আর্থিক সহায়তা প্রদান

সেন্ট মার্টিনে চতুর্থ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে স্বপরিবারে বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব শনজিত শাহা এবং শিক্ষক জনাব আরিফুর রহমান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক - গাজীপুরে শিক্ষা সফরে মার্কেটিং ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বিভাগীয় শিক্ষক জনাব দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন, জনাব মোঃ মঞ্জুরুল আলম ও জনাব ফারহানা আক্তার সাদিয়া

ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠানে মার্কেটিং ৩য় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে শিক্ষকবৃন্দ

হ্যাপী ডিলস রেস্টুরেন্ট এ ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠানে মার্কেটিং ৪র্থ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ

মার্কেটিং বিভাগ

কুমিল্লার বার্ড-এ শিক্ষাসফরে বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব শনজিত সাহা ও সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলামসহ অংশগ্রহণকারী মার্কেটিং ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ

মাস্টার্স শেষ পর্বের সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সাথে বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ

পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ

ড. মিরাজ আলী আকন্দ - কে চেয়ারম্যানের পদ থেকে বিদায় সম্বর্ধনা প্রদান

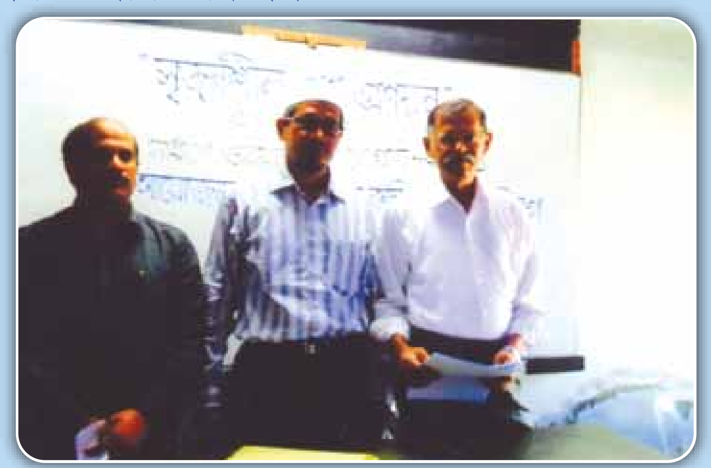

সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মোঃ আব্দুর রহমানকে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করায় সম্বর্ধনা

অর্থনীতি বিভাগ

সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য শবনব নাহিদ স্বাতীকে ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

অনার্স - পার্ট - ৪ এর বিদায় অনুষ্ঠান

অনার্স - পার্ট - ২ এর শিক্ষা সফর (কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন)

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে অফিস পরিদর্শনে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ছাত্রীদের অফিস পরিদর্শন

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ

বিবিএ প্রোগ্রাম

অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট থেকে বিবিএ প্রোগ্রামের পরিচালক পদের নিয়োগপত্র গ্রহণ করছেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ

বিবিএ প্রফেশনাল কোর্স ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক আবেদন ফরম বিতরণ উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

বিবিএ প্রোগ্রামের পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করায় ব্যবস্থাপনা বিভাগের পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

বিবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের প্রেজেন্টেশন প্রোগ্রামের একাংশ

বিবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের প্রেজেন্টেশন প্রোগ্রাম উপভোগ করছেন মার্কেটিং বিভাগের প্রফেসর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার ও প্রোগ্রাম পরিচালক

বৃত্তি প্রদানের এক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বিবিএ প্রোগ্রামের পরিচালকের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান জনাব হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরন

ক্লাব কার্যক্রম

রোটার‌্যাক্ট ক্লাব

রোটারী অভিষেক অনুষ্ঠানে ক্লাব সদস্যবৃন্দ

রোটার‌্যাক্ট জোনাল ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বিজয়ী ঢাকা কমার্স কলেজ রোটার‌্যাক্ট সদস্যবৃন্দ

জোনাল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে ঢাকা কমার্স কলেজ রোটার‌্যাক্টবৃন্দ

রোটার‌্যাক্ট জাতীয় কুইজ প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

রোটার‌্যাক্ট জাতীয় কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সনদ প্রদান করছেন প্রোগ্রাম চিফ অ্যাডভাইজার আলী আজম

রোটারী ইনস্টলেশন প্রোগ্রামে রোটার‌্যাক্টবৃন্দ

নৃত্য ক্লাব

কলেজ-এর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছে ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

নৃত্য ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

সংগীত ক্লাব

সংগীত ক্লাবের নিয়মিত চর্চার একটি মুহূর্ত

ক্লাবের সংগীত চর্চায় শিক্ষকমণ্ডলী

ক্লাবের সংগীত চর্চা উপভোগ করছেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলী

সংগীত ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব

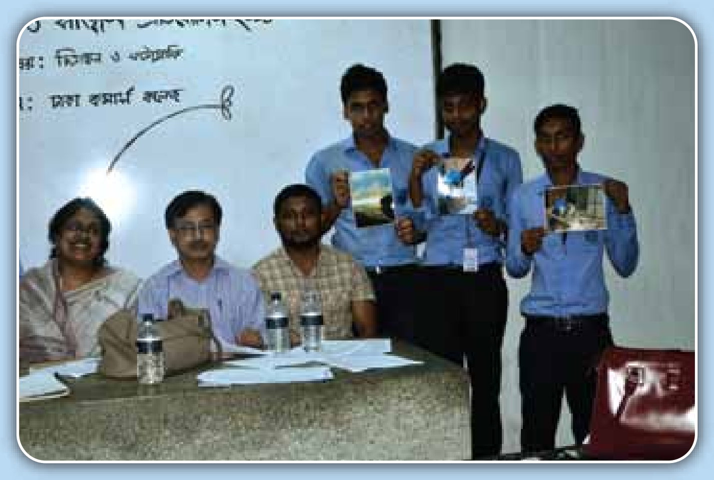

ফটোগ্রাফী প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীবৃন্দ

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীবৃন্দ

নাট্য ক্লাব

মডারেটরের সাথে সদস্যবৃন্দ

মাসিক আসর অনুষ্ঠানে নাটক

ক্লাবের নাটকের মহড়ার একটি দৃশ্য

বিতর্ক ক্লাব

ঢাকা কমার্স কলেজ বিতর্ক ক্লাবের বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সাথে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ নাঈম মোজাম্মেল

কণিকা

ইংরেজি বিভাগ অ্যালামনাই আয়োজিত ব্লাড গ্রুপিং প্রোগ্রাম

বারডেমে শিক্ষককে রক্তদান করছে কলেজ ছাত্রী

ইউনাইটেড হাসপাতালে শিক্ষককে রক্তদান করছে একজন ছাত্র

ব্লাড গ্রুপিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

রক্তদান ও গ্রুপিং প্রোগ্রামে কণিকাসদস্যবৃন্দ

রক্তদান কর্মসূচি উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ

বি এন সি সি

ফেন্সিং খেলার সমাপনি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও ভাইস এডমিরাল এম, ফরিদ হাবিব এর সাথে ঢাকা কমার্স কলেজের বি এন সি সি ক্যাডেটবৃন্দ

শিক্ষা সফরে সেন্টমার্টিন সমুদ্র সৈকতে সকাল বেলার উপস্থিতি গণনার দৃশ্য

চট্টগ্রামে নেভাল একাডেমী ভ্রমণ শেষে পতেঙ্গা সমুদ্র বিচে ক্যাডেটবৃন্দ

বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে ক্যাডেটদের সাথে শৃঙ্খলা ও বি এন সি সি কমিটির আহবায়ক ওয়ালী উল্লাহ স্যার

ক্যাপসুল ক্যাম্পে প্রশিক্ষণরত কলেজের মহিলা ক্যাডেটবৃন্দ

ক্যাম্পে ক্যাডেটদের ক্ষুদ্র অস্ত্র প্রশিক্ষণরত ঢাকা কমার্স কলেজের ক্যাডেটবৃন্দ

প্রকাশনা

"প্রগতি-২০১৩" মোড়ক উন্মোচন করছেন পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান
প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও প্রকাশনা কমিটির আহবায়ক

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি

মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

এস. এম. আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

শনজিত সাহা
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

শামা আহমাদ
সহযোগী অধ্যাপক

শবনম নাহিদ স্বাতী
সহযোগী অধ্যাপক (সমাজবিজ্ঞান)

মোঃ মনসুর আলম
সহকারী অধ্যাপক

আহমেদ আহসান হাবিব
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ সাহজাহান আলী
সহকারী অধ্যাপক

খায়রুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক

এস. এম. মেহেদী হাসান এম.ফিল
সহকারী অধ্যাপক

রেজাউল আহমেদ
সহকারী অধ্যাপক

অনুপম দেবনাথ
সহকারী অধ্যাপক (পরি.)

মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
প্রভাষক

রেহানা আখতার রিংকু
প্রভাষক

মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
লাইব্রেরিয়ান

সম্পাদক

জেনিফার ইয়াসমিন
মার্কেটিং বিভাগ, রোল : ১০৬৩

সম্পাদনা সহকারী

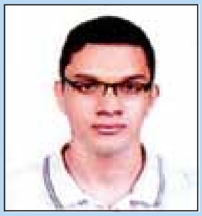

সানভী রশীদ
রোল, গ: ৯৪৬

আনিসা ইফরিদ আঁখি
রোল, একাদশ : ৩০১৯৯

স্বর্ণা আক্তার সাদিয়া
রোল, একাদশ : ৩০৩৮৭

শরিফ মিয়া
রোল, একাদশ : ৩০৯৫১

মোঃ গোলাম রাব্বানী রাফতী
রোল, দ্বাদশ : ২৯২৪১